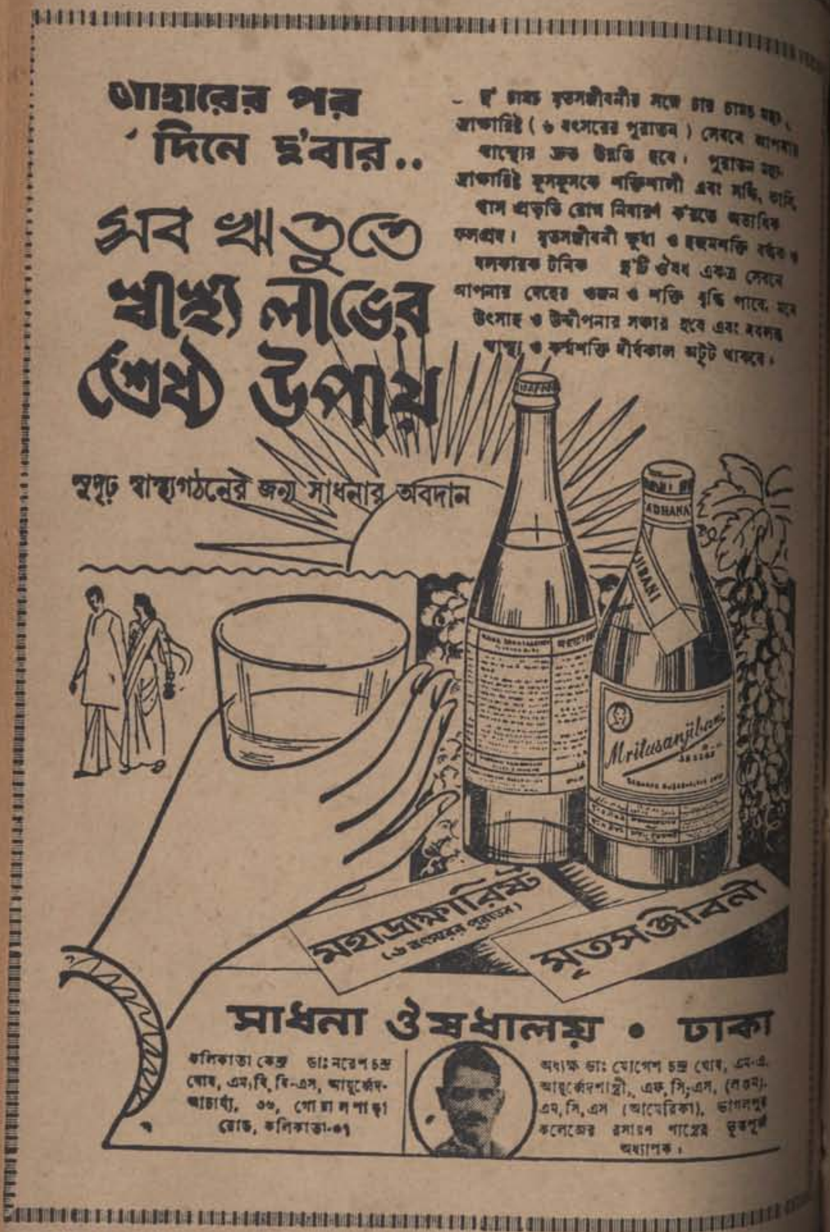


রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা

পরিচয়

বৈশাখ । ১৩৬৮





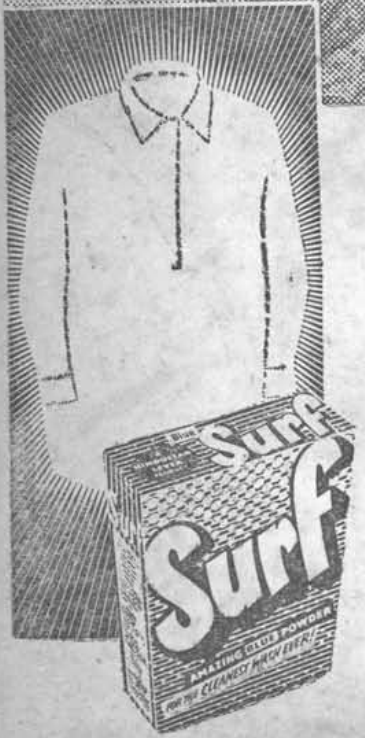
"........ এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি' দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়।"

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ১৩৬৮

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আধুনিক পরিবারে অভিনব সার্ফ





"আমিও ভেবেছিলাম এমন দিন আসুক..."

সমাজসেবিকা বোম্বের শ্রীমতী নোয়েন অমলিক বলেন

'আর তা এসেওছে। সার্ফের কথাই ধরুন! আমি দেখেছি গৃহিনীরা এই আধুনিক কাপড় কাচার পাউডারটিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। সে ওতো এক অভিনব পরিবর্ত্তন।'
'কারণ হলো সার্ফে কেচে, অনায়াসে শাড়ী, ব্লাউজ, সার্ট, প্যান্ট, ফ্রক, জামা, তোয়ালে, ঝাড়ন, ওয়াড়, চাদর—এক কথায় বাড়ীর সব কাপড় চোপড়ই ধব্‌ধবে আর ঝলমলে ফর্সা হয়!" তাই আজ আধুনিক গৃহিনীরা সবাই একমত—সার্ফে কাপড় জামা সবচেয়ে ফর্সা করে কাচা যায়। আপনিও কাপড়জামা বাড়ীতে সার্ফে কাচুন।

সার্ফে কাপড়জামা
সবচেয়ে ফরসা করে কাচে

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

SU. 17-X29 BG





পাল্‌কি চলে

কোথাও যাযাবর বেদুইন দস্যুদল দিগন্তে বিলীন বিশাল মরু-প্রান্তরের বুকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে···শ্যামল অরণ্যে শিকারের অন্বেষণে বিচরণ করছে হিংস্র শ্বাপদ···কাজল-কালো অথৈ জলে ভেসে চলেছে 'ময়ূরপঙ্খি নাও'—আবার কোথাও রয়েছে ঊর্মিমুখর বিস্তীর্ণ নীলাম্বু···সুদূরের হাতছানি যখন কিশোর রবীন্দ্রনাথকে ব্যাকুল করে তুল্‌ত তখন তিনি ঠাকুমা'র আমলের একটা পুরনো পাল্‌কির ভিতরে চুপি চুপি ঢুকে পর্দা টেনে দিয়ে বসে পড়তেন। তারপর চোখ দু'টি বুজে কল্পনা করতেন পাল্‌কিটা যেন যাদুমন্ত্রে ভরা একটা উড়ন্ত গালিচা, তাঁকে নিয়ে শূন্যপথে ভেসে চলেছে মায়ায় ঘেরা অচেনা অজানা কোন রাজ্যে। দেশ-দেশান্তরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতেন তিনি। উত্তরকালে কবিগুরু সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন। 'জগতের আনন্দ-যজ্ঞে' নানা বৈচিত্র্য ও অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি দু'টি নয়ন মেলে অপরূপকে দেখেছেন—কৈশোরে একটা পাল্‌কির মধ্যে বসে দেখা 'স্বপ্ন' সত্য হয়ে উঠেছে।

ডানলপ
কর্তৃক প্রচারিত

DC-558 BEN

'পথিক কবি' পর্যায়ের অন্যতম



রবীন্দ্র-শত-বর্ষ

সুলেখা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

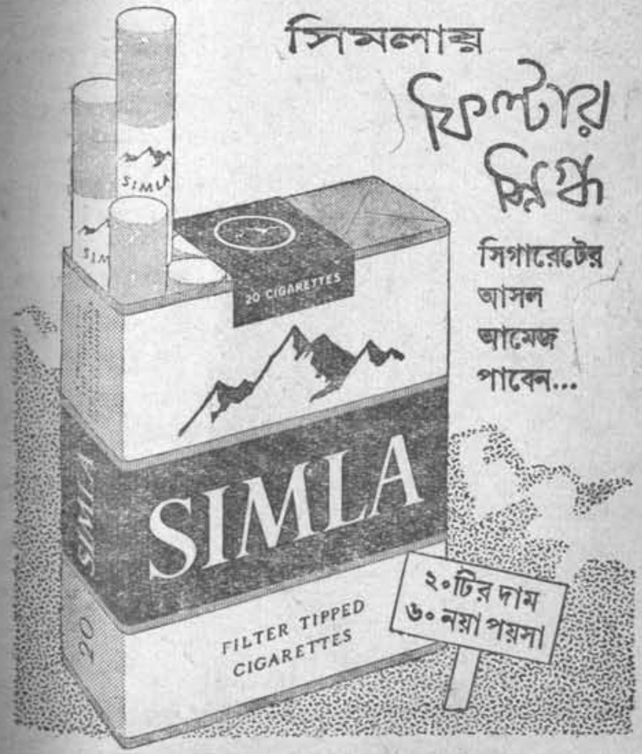
বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ

৩০০, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

S-1/61-62

ফিল্টার টিপ সিমলা সিগারেটে তামাকের স্বাদ পুরোপুরি পাবেন



সিমলায় ফিল্টার স্নিগ্ধ

সিগারেটের আসল আমেজ পাবেন...

ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানির তৈরী

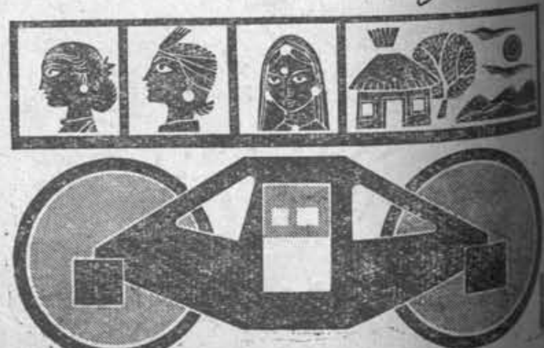
SC-7 BEN


দিনে দিনে
নতুন রেক্সোনার পরশে
ত্বকে নবীন লাবণ্য আসে
যতবারই মাখুন রেক্সোনার অবাক পরশ যেন প্রতিবারই আপনার ত্বকে নবীনতা এনে দেয়। ফেনিল রেক্সোনায় ক্যাডল আছে—বিশেষ ধরনের এই সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক তেল ত্বকের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যায় আর ত্বককে কোমল ও মসৃণ করে তোলে, চেহারায় আপনার লাবণ্য আনে।
মিষ্টি গন্ধ ভরা রেক্সোনা প্রতিদিন স্নানের পক্ষে আদর্শ সাবান। একবার মাখলে আপনি এর গন্ধ অনেকক্ষণ ধরে পাবেন।
Rexona
GOOD FOR YOUR SKIN
নতুন রেক্সোনার নতুন মোড়ক, নতুন আকার আর নবীন-মধুর রঙ আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।
নতুন রেক্সোনা-ত্বকের সেরা যত্নের সহায়ক
ভারতে রেক্সোনা প্রোপাইটরী অষ্ট্রেলিয়া লিমিটেডের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরী
RP. 179-52 BG


"হবে হবে প্রভাত হবে
আঁধার যাবে কেটে,
তোমার বাণী সোনার ধারা
পড়বে আকাশ ফেটে।"
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সেন-র‍্যালে ইন্ডাস্ট্রিজ অফ ইণ্ডিয়া লিঃ, কলিকাতা, কর্তৃক প্রচারিত
SRC-78 BEN

এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি —
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

চলেছে যে নাম নাহি জানে।
কেউ বলে যন্ত্র সে, ভার-কিছু নয়।
মনোহীন বলে তারে, কেউ অন্ধকে হিতে
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।
বলে সে অনিশ্চিত, তবু জানে অতি
নিশ্চিত তার গতি।
নামহীন যে অচেনা বারবার পার হয়ে যায়,
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়
তারি দিকে যায় নিঃশ্বাস —
সন্দেহ-আন্দোলিত মুহূর্তে কাঁপে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে
নিমেষ বিরাম নাই আকাশের তলে।
- রবীন্দ্রনাথ



পূর্ব রেলওয়ে

সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ

পরশুরাম বিরচিত
পরশুরামের কবিতা
দাম—২'০০

চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প
দাম—৩'০০

আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প
দাম—৩'০০

জওহরলাল নেহরুর
পত্রগুচ্ছ
দাম—১০'০০

অন্নদাশঙ্কর রায়ের
অপ্রমাদ
দাম—৩'০০

জাপানে : পথে প্রবাসে
দাম—৬'৫০ - দাম—৪'০০

সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত
পৌরাণিক অভিধান
দাম—৭'০০

বুদ্ধদেব বসুর
একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু
দাম—৩'০০

কালিদাসের মেঘদূত
দাম—৬'০০

আধুনিক বাংলা কবিতা
দাম—৬'০০

প্রবোধ সান্যালের উপন্যাস
মনে রেখ
দাম—৬'৫০

প্রতিভা বসুর উপন্যাস
মধ্যরাতের তারা
দাম—৩'২৫

কণিকা ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্রসংগীতের ভূমিকা
দাম—২'০০

প্রাণতোষ ঘটকের উপন্যাস
রাজায় রাজায়
দাম—৯'০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ
দাম—৫'০০

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
মহাচীনের ইতিকথা
দাম—৭'০০

দীপক চৌধুরীর উপন্যাস
ঝড় এলো
দাম—৫'০০

শুভ গুহ ঠাকুরতার
রবীন্দ্র সংগীতের ধারা
দাম—৬'০০

অজিত দত্ত প্রণীত
জানালা (কাব্যগ্রন্থ)
দাম—২'০০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২


স্বচ্ছন্দে
সাইকেল চড়তে হলে
CYCLES
দেখতে সুন্দর
মজবুত
দামেও সুবিধা
মডেল
সুপার ডিল্যুক্স
রোডষ্টার
সামিট
ও ছোটদের জন্য
ইণ্ডিয়া সাইকেল
ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড
কলিকাতা
IC-1/60B


আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।
সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
Mritasanjibani
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
(৬ বৎসরের পুরাতন)
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম,বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ. আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন). এম,সি,এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হবে
মূল্য ॥ এক টাকা

হায় ছায়াবৃতা

প্যাট্রিস লুমুম্বার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত
প্রগতিশীল কবিতার সংকলন

কবিতা লিখেছেন

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। অরুণাচল বসু। আশিস সান্যাল। কমল মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণ ধর। গোপাল ভট্টাচার্য। চিত্ত ঘোষ। জগন্নাথ চক্রবর্তী। তরুণ সান্যাল। তুষার চট্টোপাধ্যায়। ধনঞ্জয় দাশ। পবিত্র মুখোপাধ্যায়। পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য। প্রমোদ মুখোপাধ্যায়। বিমলচন্দ্র ঘোষ। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মণীন্দ্র রায়। মোহিত চট্টোপাধ্যায়। রাম বসু। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শক্তিব্রত ঘোষ। শ্যামসুন্দর দে। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। সিদ্ধেশ্বর সেন। সৈয়দ আবুল হুদা ও অন্যান্য।

পলিন লুমুম্বাকে লেখা শেষ পত্রের অনুবাদ ॥ সুভাষ মুখোপাধ্যায়
আফ্রিকা প্রসঙ্গে রচিত ঐতিহাসিক কবিতার অনুবাদ ॥ সরোজ দত্ত
পূর্ব-পাকিস্তানের কবিদের নির্বাচিত কবিতাবলী
প্রচ্ছদ ॥ সুবোধ দাশগুপ্ত
সম্পাদনা ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

পরিবেশক
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২

পরিচয়

তিরিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে
শ্রাবণ মাসে
বর্ধিত আকারে সমালোচনা সংখ্যা
প্রকাশিত হচ্ছে

দি কুমিল্লা অপটীক হাউস



প্রোঃ—ডাঃ এন্ চক্রবর্ত্তী
২৫৬-এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ও বহুবাজার জংশন

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বেঙ্গলের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

॥ প্রকাশিত হল ॥
সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত

শত বর্ষের শত গল্প (২য় খণ্ড) ১২·৫০

তারাশঙ্কর থেকে গৌরকিশোর ঘোষ পর্যন্ত সার্থকনামাদের গল্প-সংগ্রহ

●

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মণীন্দ্রলাল বসু পর্যন্ত ৫৫জন লেখকের
৫৫টি গল্প সমেত প্রথম খণ্ড (১৫·০০) পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে।
এই দুটি খণ্ডে সমস্ত লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ শ্রেষ্ঠ বইগুলি সংযোজিত হয়েছে

সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ ৬·০০

একই আধারে বিধৃত বাংলার দুই যুগন্ধর কবির বিচার-প্রোজ্জ্বল প্রতিকৃতি
॥ জগদীশ ভট্টাচার্য ॥

রবিতীর্থে ৪·০০
রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা-গ্রন্থ
॥ বিনায়ক সান্যাল ॥

রবীন্দ্রনাথ ৪·৫০
মার্কসীয় দৃষ্টি-বিচারে রবীন্দ্ররূপ
॥ গুণময় মান্না ॥

● উল্লেখযোগ্য বই ●

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মহাশ্বেতা (৩য় মুঃ) ৫·৫০
সমরেশ বসুর
বাঘিনী (২য় মুঃ) ৭·০০
দেবেশ দাশের
পশ্চিমের জানালা ৫·০০

মনোজ বসুর
মানুষ গড়ার কারিগর (২য় মুঃ) ৫·৫০
জরাসন্ধের
ন্যায়দণ্ড (৩য় মুঃ) ৬·৫০
বিজন ভট্টাচার্যের
রাণী পালঙ্ক ৩·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের
দেবতাত্মা হিমালয়
১ম খণ্ড (১০ম মুঃ) ৯·০০ ॥ ২য় খণ্ড (৫ম মুঃ) ১০·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
রূপ হোল অভিশাপ ৫·০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-বারো

● উপহার দেবার মত বই ●

অজিতকুমার রায় চৌধুরীর
নূতন উপন্যাস
অকাল প্রেম
তিন রঙা প্রচ্ছদ। দাম : তিন টাকা

কার্তিক ভট্টাচার্যের
বিস্ময়কর উপন্যাস
তুই সমতল
বিরাট পটভূমিকায়, অসংখ্য চরিত্রের ভিড়ে শহর কলকাতার সমাজ-জীবনের অনুদ্‌ঘাটিত অপূর্ব ইতিকথা।
তিন রঙা প্রচ্ছদ ॥ দাম : ছ' টাকা।

শক্তিপদ রাজগুরুর

স্বপ্নময়ী	২'৫০
শেষ নাগ	৫'৫০

খ্যাতিমান সাহিত্যিক
গোপাল হালদারের
বন চাঁড়ালের কড়চা
বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে সরস আলোচনা।
দাম : তিন টাকা

জনপ্রিয় সাহিত্যিক
সুনীল ঘোষের

স্বর্ণমৃগয়া	৬'৫০
জলতরঙ্গ	৭'৫০
ব্যাকুল বসন্ত	৪'৫০
অন্তর্দৃষ্টি	৬'০০

॥ সর্বত্র প্রশংসিত চারখানি উপন্যাস।

নীলকণ্ঠের

জীবনরঙ্গ	৪'৫০
অপাঠ্য	৩'০০

ন্যাশনাল পাবলিশার্স : ২০৬, কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিঃ ৬

"দর্শনের ইতিবৃত্ত"
লেখক
মনোরঞ্জন রায়ের



বাংলা ভাষায় এই ধরনের বই এই প্রথম। ইতিহাস পুরাণ-কথা থেকে জন্মগ্রহণ করে কীভাবে দর্শনের প্রাঙ্গণ পার হয়ে মার্কসের যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে সবিস্তারে দেখানো হয়েছে। ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস থেকে শুরু করে স্পেঙ্গলার, টোয়েনবি, কলিংউড প্রভৃতি ঐতিহাসিক মতামত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম ভারতীয় বর্ণভেদ প্রথার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তার ফলে ভারতীয় অতীত সমাজ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মহলে যে প্রচুর ভ্রান্তি আছে তা বহু পরিমাণে দূর হবে। দাম চার টাকা মাত্র।

॥ ডবল ডিমাই প্রায় দুশো পৃষ্ঠার বই ● লাইনো টাইপে ঝরঝরে ছাপা।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা-১২

রাজ্যেশ্বর মিত্রের
স ঙ্গী ত - স মী ক্ষা
• সাত টাকা •
গ্রন্থখানিতে শার্ঙ্গদেব প্রণীত 'সঙ্গীত রত্নাকর'-এ বর্ণিত স্বরাধ্যায় থেকে প্রবন্ধাধ্যায় পর্যন্ত বিষয়-বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত সমীক্ষণের জন্য গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ।

বাংলার গীতকার	... ৩'৫০
বাংলার সঙ্গীত (মধ্যযুগ)	... ২'০০

ইন্দ্রজিতের
মা ন স - সু ন্দ রী
• চার টাকা •
'একটি সুন্দরী রমণীর অঙ্গ মানুষ যে আদর এবং আবেগ দিয়ে স্পর্শ করে, কবি এবং শিল্পী ঠিক সেই আবেগ দিয়ে তাঁর মানস-মূর্তিকে গড়ে তোলেন।......আমি এদের ভালবাসি, এরাই আমার মানস-সুন্দরী।'

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের
টি বি স ম্ব ন্ধে
• চার টাকা •

মণীন্দ্র দত্তের
গান্ধীজীর অগ্নিপরীক্ষা
• দু টাকা চার আনা •

অন্যান্য প্রবন্ধ-সাহিত্য

ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্তের

ত্রয়ী	৬'০০

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

নিমন্ত্রণ	২'৭৫

তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তীর

বিপ্লবী বাংলা	৪'৫০

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর
অহিংস সমাজবাদের পথে
• পাঁচ টাকা •
গান্ধীজীর সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলীর নির্বাচিত সংকলন। আপনার গ্রন্থাগারের জন্য অবশ্যই সংগ্রহ করিবেন।

শিবনারায়ণ রায়ের
প্র বা সে র জা র্না ল
• পাঁচ টাকা •
পশ্চিম ভ্রমণের নিছক চোখে দেখার বিবরণ নয়। লেখকের অনন্যসাধারণ যুক্তিবাদী মনের আয়নায় যুদ্ধোত্তর ইউরোপের মানসিক মান-চিত্রও নিখুঁতভাবে এই বইয়েতে অঙ্কীকৃত হয়েছে। নানাদিক দিয়ে সমকালীন ইউ-রোপকে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ এর আগে কোন বইতে পাওয়া যায় নি।

সাহিত্য চিন্তা (২য় সং)	... যন্ত্রস্থ
রবীন্দ্রনাথ	... "

অম্লান দত্তের
গ ণ ত ন্ত্র - প্র স ঙ্গে
• দু টাকা •
প্রখ্যাত অধ্যাপক অম্লান দত্তের কয়েকটি চিন্তাশীল প্রবন্ধের সংকলন। দেশের তথা বর্তমান পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উপর আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। বিদগ্ধ চিন্তাশীল অধ্যাপকের এই গ্রন্থ আপনাদের ভালো লাগবে নিশ্চয়ই।

বিমলচন্দ্র সিংহের
সা হি ত্য ও সং স্কৃ তি
• চার টাকা •
সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা বড় বিচিত্র। জীবনতরঙ্গের এই বিচিত্র লীলার অনুধ্যান শুধু যে কৌতূহলদ্দীপক তাই নয়, তা আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় কেননা যা ঘটেছে এবং যা ঘটছে সে সম্বন্ধে স্পষ্টজ্ঞান না থাকলে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন হবে না। আপনার পাঠাগারের পক্ষে গ্রন্থখানি অবশ্য সংগৃহীতব্য।

যোগেন্দ্রনাথ সরকারের
ব্র হ্ম প্র বা সে শ র ৎ চ ন্দ্র
• আড়াই টাকা •

সতীন সেনের
জে ল ডা য়ে রী
• তিন টাকা •

বিমল ঘোষের
কামাল পরদেশী
• সাড়ে চার টাকা •

মিত্রালয় ॥ ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিঃ-১২ : ফোন ৩৪-২৫৬৩

শতবার্ষিকীতে ন্যাশনালের শ্রদ্ধার্ঘ্য

গোপাল হালদার সম্পাদিত



শতবার্ষিকী প্রবন্ধ-সংকলন

সংকলনে লিখেছেন ঃ

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... সার্বভৌম কবি
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ... রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প ও প্রতীক
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত ... রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ... রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প
বিষ্ণু দে ... চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ... রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি
হিরণকুমার সান্যাল ... রবীন্দ্রনাট্যপ্রসঙ্গ
গোপাল হালদার ... রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা
সুশোভন সরকার ... রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নব-জাগরণ
চিন্মোহন সেহানবিশ ... রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা

যামিনী রায়ের আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি

দাম ঃ পাঁচ টাকা

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২ ॥ ১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর ৪

BOOKS FROM SOVIET UNION

Politics and Philosophy

Marx & Engels

Selected Correspondence	1·87
First War of Indian Independence	1·12

Karl Marx

Capital : Vol. I	2·94
Capital : Vol. II	2·25
Capital : Vol. III	3·00

Karl Marx

Poverty of Philosophy	0·94

Frederick Engels

Anti-Duhring	1·31
Dialectics of Nature	1·25

V. I. Lenin

Against Revisionism	2·00
Collected Works Vol. 1-3 each	1·37

J. V. Stalin

Problems of Leninism	1·12
Marxism and the Problems ol Linguistics	0·12

G. Plekhanov

Unaddressed Letters—Art and Social Life	1·25
The Development of the Monist View of History	1·31
Selected Works Vol. I	3·19

NATIONAL BOOK AGENCY PRIVATE LIMITED
12 Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12
172 Dharamtola Street, Calcutta-13
Nachan Road, Benachity, Durgapur-4

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিন্নপত্রাবলী

ছিন্নপত্র গ্রন্থের পূর্ণতর সংস্করণ। ১০৭টি নূতন চিঠিও আছে।
বোর্ড বাঁধাই ১০৲ ; মোটা কাগজে ছাপা কাপড়ে বাঁধাই ১২॥০

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

পূর্ব প্রকাশিত দুইটি খণ্ড বর্তমান সংস্করণে একত্রে গ্রথিত। ডায়ারির প্রাথমিক খসড়াটি আদ্যন্ত সংকলিত ; পূর্বে কখনো গ্রন্থভুক্ত হয় নাই।
কাগজের মলাট ৫৲ ; বোর্ড বাঁধাই ৬॥০

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

স্বচ্ছন্দ চলিত বাংলায় লেখা কবির প্রথম ইংলণ্ড ভ্রমণ ও প্রবাস যাপনের মনোহর বিবরণ। কাগজের মলাট ৪॥০ ; বোর্ড বাঁধাই ৬৲

শেষ সপ্তক

শেষ সপ্তকে মুদ্রিত দশটি গদ্যকবিতার ছন্দোবদ্ধ রূপ বা রূপান্তর এই সংস্করণে সংকলিত।
সচিত্র কাগজের মলাট ৪॥০ ; বোর্ড বাঁধাই ৫॥০

বীথিকা

শতবার্ষিক সংস্করণে সমকালীন দশটি নূতন কবিতা সংকলিত। বিশেষ শোভন সংস্করণে বিভিন্ন কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তুর দ্যোতক কয়েকখানি রঙিন ও একরঙা ছবি গ্রথিত। বাঁধাই ৬॥০

কালান্তর

নূতন সংস্করণে সাতটি প্রবন্ধ প্রথম গ্রন্থভুক্ত। কাগজের মলাট ৪॥০

বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা

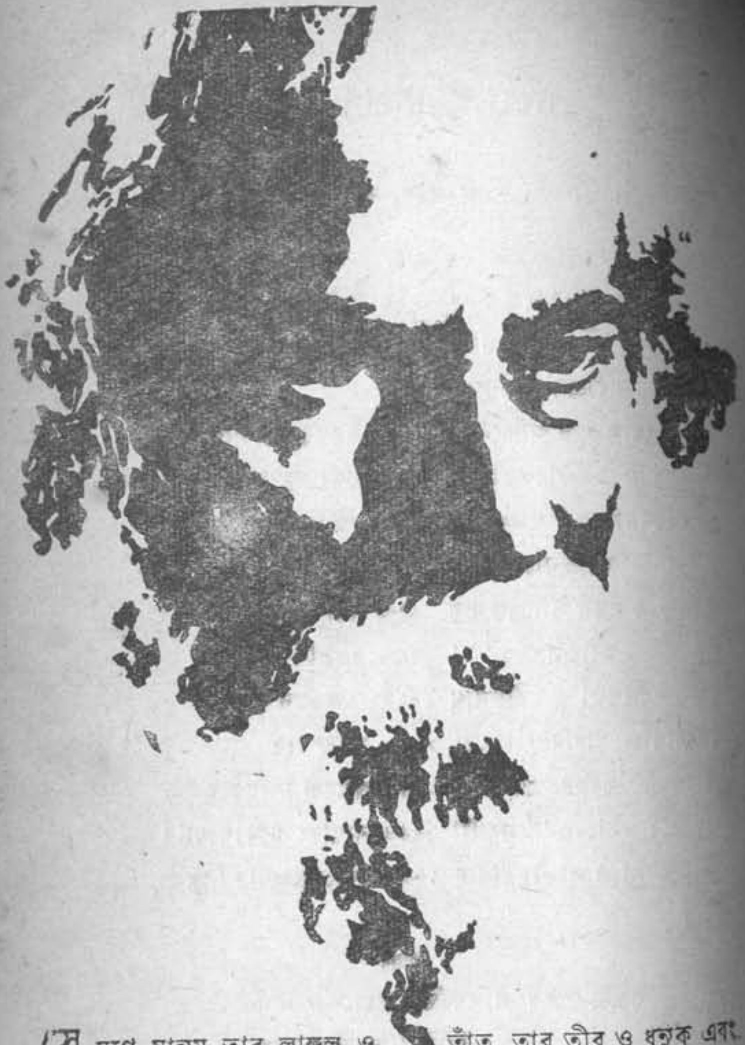
প্রচ্ছদ

রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি । রোদেনস্টাইন
লিপি । সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।



সে যুগে মানুষ তার লাঙ্গল ও তাঁত, তার তীর ও ধনুক এবং রথের ব্যবহার করত তার জীবনের বিকাশের উদ্দেশ্যে; ঠিক তেমনি আজকের দিনেও আধুনিক যন্ত্রপাতিকে মানুষের কল্যাণের জন্যই নিয়োজিত করতে হবে।

কবিগুরুর 'নগর ও গ্রাম' ইংরেজী প্রবন্ধের অংশবিশেষের বাংলা অনুবাদ।
বিশ্বভারতী বুলেটিনের ১৯৪৭ সালের ১০ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মার্টিন বার্ন লিঃ, দি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোং লিঃ,
বার্ন অ্যাণ্ড কোং লিঃ, দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোং লিঃ এবং
দি হুগলি ডকিং অ্যাণ্ড এন্‌জিনীয়ারিং কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত

পরিচয়

৩০ বর্ষ; ১০ম সংখ্যা
বৈশাখ, ১৮৮৩; ১৩৬৮

প্রগতি লেখকদের প্রতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এশিয়াতে এক সময় এক যুগ এসেছিল, যাকে সভ্যযুগ বলা যেতে পারে, তখন এখান থেকে সভ্যতার মূল উৎসগুলি উৎসারিত হয়েছিল, নানা দিকে, নানা দেশে। প্রাচীন এশিয়ার যে আলোকের উৎস, যে সভ্যতার দীপালী অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার নানা আলোক জ্বালিয়েছিল চীন, ভারত, আরব, পারস্য, তাদের ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আচরণে ও জ্ঞানে। সেই আলোক থেকে শিখা গ্রহণ করে সভ্যতার প্রকাশ হয় প্রাশ্চাত্য দেশে, বিশেষ করে ধর্ম্মের ব্যাপারে। এক সময়ে এশিয়াতে যে শিখা প্রজ্জলিত ছিল, তার নির্ব্বাপনের দিন এল, ক্রমে ঘনীভূত হয়ে—এল প্রদোষের অন্ধকার। তখন ভিতরের লজ্জা গোপন আর অন্তরের গৌরব রক্ষার জন্য আমরা বার বার নাম জপ করেছিলুম ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জ্জুনের, আর তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলুম, বীর হাম্বির, রাণা প্রতাপ, এমন কি বাংলা দেশের প্রতাপাদিত্য পর্যন্ত। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বুঝতে পারি যে অতীতের গৌরব ও বর্ত্তমানের তুচ্ছতা নিয়ে আমাদের মনের ভিতর প্রবল বেদনা নিহিত ছিল। এই অতীতের দোহাই-দেওয়া নিষ্ফলতা আঁকড়ে থাকতে গিয়ে আমরা পদে পদে অপমানিত হয়েছি। এই সভ্যতার মূলে যে স্বাতন্ত্র্য ছিল এবং যে-সংস্কৃতি গ্রামে গ্রামে প্রচারিত ও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, সে সমস্তকে—পশ্চিমের বন্যা এসে ডুবিয়ে একাকার করে দিয়েছে।

ক্রমে বিদেশী ইস্কুল-মাষ্টারের হাতে আমাদের শিক্ষা যতই পাকা হয়েছে ততই ধারণা হতে লাগল যে, অক্ষমতা আমাদের মজ্জাগত, মজ্জায় অন্তর্নিহিত ; অন্ধসংস্কার ও মূঢ়তার বোঝা বয়ে পাশ্চাত্যের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে থাকবে চিরদিন। তখন আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য ধরে নিলাম যে, বিদেশী শাসনকর্তাদের দ্বারা চালিত হওয়ার বাইরে আমাদের চলৎশক্তি নেই। এদের অনুগ্রহ গণ্ডুষের জন্যে যুগান্তকাল পর্যন্ত অঞ্জলি পেতে থাকাই আমাদের ভাগ্যে নির্দ্দিষ্ট। আপন অধিকার আপন শক্তিতে জিতে নিতে হবে এমন দুঃসাহসকে তখনকার কংগ্রেসী বীরেরাও মনে স্থান দেন নি। তাঁরা আবেদনের ঝুলি নিয়ে রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিলেন ; মুষ্টিভিক্ষার সকরুণ আবদার নিয়ে বার বার দ্বাররক্ষীদের হাতে তাদের লাঞ্ছনাও ঘটলো। তখন আমরা ভেবেছিলুম যে, স্বল্পতে সন্তুষ্ট থাকাটাই যেন আমাদের সুদীর্ঘতমকালের একমাত্র গতি। ওরা কেড়ে নেবে, আর আমরা বিনা নালিশেই দেব, আর সেই দানেরই সামান্য কিছু উচ্ছিষ্ট থেকে পেট ভরাবার প্রত্যাশার চেয়ে উপরে উঠতে মন সেদিন সাহস পায় নি। নতমস্তকে মেনে নিয়েছি, পাশ্চাত্য চড়ে আছে দুর্গম উচ্চে আর প্রাচ্য গড়াচ্ছে সর্ব্বজনের পদতলদলিত ধুলিশয্যায়। থেকে থেকে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে শিবনেত্র হয়ে বলেছি আমরা আধ্যাত্মিক, আর যারা আমাদের কান মলে তারা বস্তুতান্ত্রিক। হই না কেন রোগে জীর্ণ, উপবাসে ক্ষীণ, অশিক্ষায় নিমগ্ন, ছোট-বড়ো সকল প্রকার দুর্গ্রহের কাছে নিঃসহায়, তবু ওদের মতো ম্লেচ্ছ নই। আমরা ফোঁটা কাটি, মালা জপি, স্নানের যোগ এলে চার দিক থেকে হাজার হাজার লোকের আঁখি লেগে যায় স্বর্গলাভের লোভে ; আর ওদের যত লোভ আর যত লাভ সবই এই মর্ত্যলোকের সীমানায়—ধিক্! পিঠে মার এসে পড়ে বাস্তবের দেশে আর চুন হলুদ, লাগাতে যাই অবাস্তব লোকে।

এমন সময় একটা যুগান্তর দেখা দিল যেন বিণা ভূমিকায়। এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে নবপ্রভাতের অভ্যুদয় হোলো। অনেকদিন অন্ধকারে থেকে আমরা কখোনো ভাবতেই পারি নি যে, দিনরথের আবর্ত্তন কোনোদিন আবার প্রাচ্যদিগন্তে পৌছতে পারে। আমরা একদিন অবাক বিস্ময়ে দেখলাম যে, দূরতম প্রাচ্যে ক্ষুদ্রতম জাপান তার প্রবল প্রতিপক্ষকে সহজেই পরাস্ত করে সভ্যসমাজের উচ্চ আসনে চড়ে বসলো। প্রচণ্ড

প্রাচ্য সভ্যতার ভাণ্ডারে যে শক্তি ও যে বিদ্যা পুঞ্জিত ছিল জাপান তা অধিকার করলো অতি অল্প সময়ের মধ্যে। দীর্ঘ ইতিহাসের বন্ধুর পর্যায়ে ক্রমশ পুষ্ট, ক্রমশ ব্যাপ্ত ; বহু চেষ্টায় নানা সংগ্রামে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমের অমোঘ বিজয়ী বীর্যকে আপন স্বাধীনতার সিংহদ্বার দিয়ে অর্ধশতাব্দীর মধ্যে আবাহন করে আনলে। এ যে এত সহজে লভ্য এ কথা আমরা ভাবতে পারি নি। সবিস্ময়ে আশ্বস্ত হয়ে বুঝতে পারলেম, ব্যাপারটা দুরূহ নয়। যে যন্ত্রবিদ্যার জোরে মানুষ আত্মপোষণ ও আত্মরক্ষা করতে পারে সম্পূর্ণভাবে, সেটা আয়ত্ত করতে দীর্ঘকালের তপস্যা লাগে না। এমন কি Conscription-এর সাহায্যে কুচকাওয়াজ করিয়ে বছর কয়েকের মধ্যে ভারতীয় জনসাধারণকে সৈনিক ব্যবসায়ে অভ্যস্ত করা নিশ্চয়ই সম্ভবপর। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে যাকে বলে শ্রেয় তার পথ অন্তরের পথ, সেটা সহজ নয়। তার জন্যে প্রস্তুত হতে সময় লাগে। লড়াই করতে হয় নিজেরই সঙ্গে। মহাত্মাজির নির্দ্দেশ হল শ্রেয়-নীতির জোরেই স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হবে, বাহুবলের জোরে নয়। তাঁর কথা যারা মেনে নিয়েছে তারা আত্মার শক্তির কামনা করছে। এই পথের সাধনা বিলম্বে সিদ্ধ হয়।

এই অন্তরের রাস্তা ছাড়া একটা বাহিরের বড় রাস্তা আছে। স্বতন্ত্র তার লক্ষ। সেটা অন্নের পথ, আরোগ্যের পথ, দৈন্যলাঘবের পথ। বিজ্ঞানের সাধনা এই পথে ; সে জয়ী করে জীবনসংগ্রামে। সে পথে মানুষের শয়তানের বাধা নেই। এমন কি সে দলে টেনে নেয় বিজ্ঞানকে ; কিন্তু সেজন্যে বিজ্ঞানকে দোষ দেওয়া অন্যায় ; কেন না বিজ্ঞানের স্বাভাবিক যোগ বুদ্ধির সঙ্গে, শ্রেয়নীতির সঙ্গে নয়। এখানে দোষ দিতে হয় সেই সকল ধর্ম্মমতকে যে সকল মত মানুষকে অপমানিত করে, পীড়িত করে, তার বুদ্ধিকে অন্ধ করে, পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে, তার বিচারবর্জিত আচারকে চলার পথে বোঝা করে তোলে।

শতাব্দীর অধিককাল হোলো আমরা শক্তিশালী পাশ্চাত্য জাতির শৃঙ্খলে বাঁধা আছি। কিন্তু যন্ত্রশক্তির এই চরম বিকাশের দিনেও এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা উপবাসী ; আমরা রোগজীর্ণ, দারিদ্র্যে আমরা সর্বতোভাবে পঙ্গু। যে-বিদ্যা অপমান ও দুর্গতি থেকে মানুষকে রক্ষা করে তার আমরা স্পর্শ পাই নি বললেই হয়। এই শিক্ষা জাপানের হয়েছে, আমাদের

হয় নি ; যদিও বুদ্ধিতে আমরা জাপানীদের চেয়ে কম নই। চোখের সামনেই দেখেছি জাপান এমন প্রবল হয়ে উঠলো যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপবাসীর কাছে য়ুরোপের গর্বান্ধ জাতিদের অহংকার পদে পদে খর্ব হলো। পাশ্চাত্যের বিদ্যা আয়ত্ত করে শতাব্দীর অনতিকালের মধ্যে জাপান যখন এই গৌরব লাভ করলে, তখন আমাদের মনের দ্বারে একটা প্রবল আঘাত লাগলো ; জাগরণের জন্যে আহ্বান এলো আমাদের অন্তরে। এশিয়ার পাশ্চাত্যতম ভূ-খণ্ডে দেখলুম তুর্কী—যাকে য়ুরোপ Sick man of Europe বলে অবজ্ঞা করতো, সে কী রকম প্রবল শক্তিতেই অপমানের বাঁধন ছিন্ন করে ফেললো। য়ুরোপের প্রতিকূল মনোবৃত্তির সামনে সে আপনার জয়ধ্বজা তুলে ধরলে। এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই আত্মগৌরব লাভের দৃষ্টান্ত দেখে আমাদের দুর্গতিগ্রস্থ ইতিহাসের আওতার আবছায়ার ভিতরে একটা আশ্বাসের আলো প্রবেশ করলো। মনে হচ্ছে অসাধ্যও সাধ্য হয়। স্বাধীনতার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত নয়—যা চাই, তা পাবো। মূল্য দিতে হবে, সে মূল্য দেবার লোক উঠবে।

এই যে এশিয়ার আকাশের উপরে তুর্কীর বিজয়পতাকা উড়ছে, সেই পতাকাকে যিনি সকলরকম ঝড়-ঝাপটের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন—সেই দূরদর্শী-বীর, সেই রাষ্ট্রনেতার পরলোকগত আত্মাকে প্রগতিবাদী আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি যে কেবল তুর্কীকে শক্তি দিয়েছেন তা তো নয়, সেই শক্তিরথের চক্রঘর্ঘর ভারতবর্ষের ভূমিকেও কাঁপিয়ে তুলছে। একটা বাণী এসেছে তাঁর কাছ থেকে, তিনি বুঝিয়েছেন যে সংকল্পের দৃঢ়তার কাছে, বিরাট অধ্যবসায় ও অক্ষুণ্ণ আশার কাছে, দুরূহ বাধাও চিরস্থায়ী হতে পারে না। এই কামাল পাশা একদিন নির্ভয়ে দুর্গম পথে যাত্রা করেছিলেন। সেদিন তাঁর সামনে পরাভবের সমূহ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সংকল্পকে তিনি কখনও বিচলিত হতে দেন নি। য়ুরোপের উদ্ধত নখরধারী ভীষণ সিংহকে তার গুহার মুখেই তিনি ঠেকিয়েছেন। এশিয়াকে এই তোমরা তাঁর দান—এই উৎসাহ।

তাঁর জীবনী সম্বন্ধে সব কিছু জানা নেই, বলবার সময়ও নেই। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, তুর্কীকে তিনি যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা নয়, তিনি তুর্কীকে তার আত্মনিহিত বিপন্নতা থেকে মুক্ত করেছেন। মুসলমান ধর্ম্মের প্রচণ্ড আবেষ্টনের

মাঝখানে দাঁড়িয়ে, ধর্ম্মের অন্ধতাকে প্রবলভাবে তিনি অস্বীকার করেছেন। যে অন্ধতা ধর্মেরই সবচেয়ে বড় শত্রু, তাকে পরাভূত করে তিনি কী করে অক্ষত ছিলেন, আমরা আশ্চর্য্য হয়ে তাই ভাবি। তিনি যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, সে বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্লভ। বুদ্ধির গৌরবে অন্ধতাকে দমন করা তাঁর সবচেয়ে বড় মহত্ত্ব ; বড়ো দৃষ্টান্ত।

আমরা অন্য সম্প্রদায়ের কথা বলতে চাই নে, বলা নিরাপদ নয়। নিজেদের দিকে যখন তাকাই তখন মন নৈরাশ্যে অভিভূত হয়। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে যা বলবার তা বলেছেন স্বয়ং মুসলমান-বীর কামাল পাশা, বলেছেন পারস্যের রেজা শা পহ্লবী।

তুর্কীকে স্বাধীন করেছেন বলে নয়, মূঢ়তা থেকে মুক্তির মন্ত্র দিয়েছেন বলেই কামালের অভাবে আজ সমগ্র এশিয়ার শোক ; যে-হতভাগ্য জাতি তাঁর মন্ত্র গ্রহণ করে নি, তার অবস্থা শোচনীয়। তিনি তুর্কীকে যে প্রাণশক্তি দিয়ে গেছেন, তার অবসান হয়তো হবে না, কিন্তু আমরা—হতভাগ্যের দল—এই এশিয়ায় কার দিকে তাকাবো। জাপানের দিকে মুখ তোলবার দিন আর আমাদের নেই। এখন এইমাত্র প্রত্যাশায় আমরা সান্ত্বনা পাই যে প্রাণে আঘাত পেয়েই চীনের প্রাণশক্তি দ্বিগুণ বলিষ্ঠ হয়ে জাপানকে পরাস্ত করবে। যদি সে পরাজিত হয় তবু সে পরাভূত হবে না। এত বড় জাত যদি জাগতে পারে, তবে সেই জাগরণের শক্তি ভারতকে প্রভাবান্বিত করবে। তাতে পরোক্ষভাবে ভারতেরই লাভ।

তোমরা প্রগতিপথের তরুণ যাত্রী, আজ তোমাদের সম্মেলনের দিনে, সমস্ত এশিয়ার সম্মুখে যিনি প্রগতির পথ উদ্ঘাটিত করেছেন, যাঁর যশোগৌরবের ইতিহাসে সমস্ত এশিয়া মহাদেশের বিজয় সূচনা করছে সেই মহাবীর কামালের উদ্দেশে ভারতের নবযুগের অভিবাদন আমরা জ্ঞাপন করি।

১৯৩৮ সনের ২৪শে ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ একটি লিখিত ভাষণ প্রেরণ করেন। ১৯৩৮ সনের ২৫শে ডিসেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় (৯ই পৌষ, রবিবার, ১৩৪৫) সম্মেলনের উদ্বোধন ... রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি এইভাবে ছাপা হয় :

এশিয়ার নব প্রভাতের অভ্যুদয়
কামাল আতাতুর্কের শক্তিরথের চক্রঘর্ঘরে
ভারতবর্ষের ভূমি কম্পিত।

মহাবীরের উদ্দেশে ভারতের নবযুগের অভিবাদন
প্রগতিলেখক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের বাণী।

২৪শে ডিসেম্বর নিখিলভারত প্রগতিলেখক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন ভবানীপুর আশুতোষ স্মৃতিভবনে আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত একটি অভিভাষন পাঠান্তে সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হয়। কবি তাঁহার অভিভাষনে কামাল পাশার জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—

এর পরের অংশটুকু অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের লিখিত ভাষণটি প্রবন্ধাকারে ওপরে ছাপা হয়... বলাবাহুল্য শিরোনামা আমাদেরই দেওয়া। এমনকি মুদ্রণ প্রমাদও সংশোধন করা হয়... 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-এর পুরনো ফাইল থেকে রচনাটি উদ্ধার করেছেন চিন্মোহন সেহানবীশ।

পরিচয় সম্পাদক

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

গোপাল হালদার

"ধন্য এই কলিযুগ সর্বযুগসার", যাঁরা বলেছিলেন তাঁদের সঙ্গে একমত হয়েও বলতে পারি—বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতবর্ষে জন্মাবার মতো সৌভাগ্য বুঝি আর নেই। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বা তার দ্বিতীয় পাদে যাঁরা জন্মেছেন ভাগ্যবান তাঁরাও। কিন্তু কী জানেন তাঁরা সৌভাগ্যের—যাঁরা ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ এই জীবন্ত কালের ভারতবর্ষের জীবন-ভাগ হন নি; বহু শতাব্দীর তাপ ও তমিস্রার মধ্যে থেকে দেখেন নি এই প্রাচীন মহাজাতির নব-জীবনের তপস্যা, মানুষের মহাজীবনের পৃথিবী-জোড়া স্পন্দন; আর বেদনা-বিরোধের সমুদ্র-মন্থনের হলাহলে যাঁদের কণ্ঠ হয় নি ক্ষণে ক্ষণে নীল, হৃদয় হয় নি মথিত, আত্মা জাগে নি মানবাত্মার অমৃত-আস্বাদনে মানবিক মহিমায়।

আমি সেই নবজাত শতাব্দীর নবজাতক। "আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি"—এই যদি সত্য হয় ১৮৬১-এর কবির পক্ষে, সত্য তা—আরোও সত্য—বিংশ শতকের নবজাত রবীন্দ্র-জীবনালোকে স্নাত বাঙালী সন্তানের পক্ষে। জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি আমিও—আমরা কেউ, আমার সমসাময়িকেরা—দিনের পর দিন যাঁরা পান করেছি অঞ্জলি ভরে সেই সৌরলোকের প্রসাদ, পেয়েছি সেই অসমাপ্ত রেনেসাঁসের অসামান্য উত্তরাধিকার, আর সেই সঙ্গে মেনে নিয়েছি বিশ্ব-মানবের অভিযানে—কণ্টক-দীর্ণ চরণে, রক্ত-স্রাবী হৃদয়ে—শতাব্দীব পথ-প্রস্তুতির অনস্বীকার্য ভার, অনিবার্য অধিকার।

এক

"অসম্পূর্ণ" সেই বাংলার রেনেসাঁস এ কথা বলেছেন বিজ্ঞজনেরা, মেনেছি আমিও অপরিতৃপ্ত বিচারে। কিন্তু আমরা তার কী বুঝেছি যদি না মানি বুদ্ধি দিয়ে আর অন্তর দিয়ে—তবু "অসামান্য" সেই রেনেসাঁস? যদি না অনুভব করি রেনেসাঁসের সেই বুদ্ধির-মুক্তি কলোনির কেরানি-জীবনের ভাব-ভূমি

ছাড়িয়ে জাতীয় মুক্তির বুদ্ধিকে ধূম্রান্তরালবর্তী কোন্ যজ্ঞাগ্নিশিখায় জ্বালিয়ে তুলবার আয়োজন? যন্ত্রতাড়িত আর মন্ত্রশাসিত সেই পরাধীন জীবনের খণ্ডিত আয়োজনের মধ্যেও যে নব-জাগরণের চাঞ্চল্য রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শতবর্ষের বাঙলাকে শিহরিত উচ্চকিত উদ্‌বোধিত করেছিল আমাদের ইতিহাসে তার আর তুলনা কোথায়? কী ছিল তার পূর্বে আর কী হল তার পরে, বঙ্কিমের প্রতিভাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে বাঙলা সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বিচার-বুদ্ধির নির্দেশ দিয়েছেন, সেই বিচার-পদ্ধতির আশ্রয় নিলে আর সন্দেহ থাকে না—অসামান্য এই নব-জাগরণ। তা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অনুকল্প নয়—ভারতের বা ইউরোপের কোনো ইতিহাসের পুনরাবর্তন নয়। একই কালে তা উপনিষদের ও পুরাণের পুনঃপরীক্ষা, হিন্দুসংস্কৃতি ও বৌদ্ধসংস্কৃতির পুনরাবিষ্কার, প্রচীন ও মধ্যযুগের নবসমীক্ষা, অশোক এবং আকবরের নবজন্ম। আর তার সঙ্গেসঙ্গেই তা ইউরোপীয় রেনেসাঁসেরও প্রভাবে পুষ্ট; সেই সূত্রেই গ্রীস-রোম ও জুডিয়ার ভাবধারায়ও প্রচ্ছন্ন-স্পৃষ্ট। কিন্তু শুধু রেনেসাঁসই বা কেন? সেই রেনেসাঁসেরই মতো পাশ্চাত্ত্য রিফর্মেশন ও ফরাসী রেভোল্যুশন-এরও ফলশ্রুতি বহন করেই কি ইংরাজ-শাসন "ইতিহাসের অচেতন যন্ত্ররূপে" আমাদের সম্মুখে এনে ধরে নি বুর্জোয়া সভ্যতার বিশ্ববীক্ষাকে—আবহমান মানবেতিহাসের তপঃফল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মূল্যমান? একই কালে সে-পিপাসায় ও জ্ঞান-পিপাসায় আমরা কি উন্মাদ হইনি—একই সঙ্গে ব্যাস ও বাল্মীকি, হোমার ও ভার্জিল, কালিদাস ও ভবভূতি, দান্তে ও চশার, শেক্‌স্‌-পীয়র ও মিলটন, গ্যয়টে ও বায়রন যখন সপ্তসিন্ধুর স্রোতধারায় আমাদের অভিষেক সম্পাদন করলেন? সেদিনের দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ যেমন শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্-এর ধ্যানে আত্ম-সম্বুদ্ধ হয়েছেন, রামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্র ভগবদ্‌ভক্তির ধারায় আত্ম-সমর্পণ করেছেন, মানুষের বিশ্বরূপ দর্শনও তেমনই ঘটেছিল ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গলের; জীবনের মূল্যবোধ সেদিন সুদৃঢ় করেছিল অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা ও বিদ্যাসাগরের অজেয় পৌরুষ। বঙ্কিমের পুরুষ-প্রতিভা আর বিবেকানন্দের বীর-মন্ত্র তথাপি পরাহত জাতির সেই পারভৃতিক জীবনচর্যারই প্রতিবাদে অধ্যাত্মবাদী ভাবসম্পদে জাতীয় আত্ম-মর্যাদার ভিত্তি খুঁজেছে—রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ এই বাঙালী জাগরণ মধ্যবিত্ত জীবনের খণ্ডিত চেতনায় ক্রমাগত

…ছিল। রবীন্দ্রনাথও সেই পিতৃ-উত্তরাধিকার ও ঔপনিষদীয় ঐতিহ্যকে …পন মানবীয় সাধনার মধ্যে মিশিয়ে দিতে গিয়ে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিতে পারেন নি, এ কথাও মিথ্যা নয়—অন্ততঃ আমার চক্ষে। কিন্তু এ কথা তথাপি সত্য—আমাদের জাগরণ বহু বিলম্বিত বলেই হয়তো সত্য—মানব-সভ্যতার …বাধুনিক সম্পদের সঙ্গে এমন পরিচয় আমাদের ইতিহাসে ইতিপূর্বে অজ্ঞাত ছিল, যে কোনো জাতির ইতিহাসে অসামান্য গণ্য হত এই সৌভাগ্য। আর …ত্ত্ব অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আমাদের জীবনে তা ব্যর্থ হয় নি, জ্ঞানে কর্মে ভাবে …য় নি সেই বাঙালী রেনেসাঁস নিষ্ফল। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, হিন্দু কলেজের (ইং ১৮১৮) থেকে স্বদেশীযুগের প্রকাশ (ইং ১৯০৫-০৮)—এই …কালের মধ্যে, কলোনির এই অপরিসর মধ্যবিত্ত-জীবনের মধ্যে, যেমন শক্তিমান বহুসংখ্যক মনীষার স্ফুরণ ঘটেছে এমন স্ফুরণ যে কোনো জাতির ইতিহাসে গৌরবের, আমাদের ইতিহাসে অতুলনীয়।

সে জাগরণের প্রধান দান আমাদের সাহিত্য-সাধনা ও স্বাধীনতার সাধনা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আসলে তা একই সাধনার দুই পিঠ—নবজাগ্রত জাতির তা আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা। এমন সাহিত্যিক কে ছিলেন যিনি এই আহ্বান প্রতিধ্বনিত করেন নি—"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়?" এমন স্বাধীনতাকামী কে ছিলেন যিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে দেখেন নি জাতীয় প্রাণের নতুন স্বাক্ষর? রেনেসাঁসের এই দুই ধারার উত্তরাধিকারই উনবিংশ শতক তুলে দিয়ে গিয়েছিল বিংশ শতকের হাতে—ভারতবর্ষের হয়ে বাঙলা দেশ তা গ্রহণ করে। আর সেই রেনেসাঁসের শীর্ষমণি হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতকের প্রভাতে তখন প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে দীপ্তিমান। জীবন্তকালের জটিল স্বাক্ষরও রবীন্দ্রনাথের চক্ষেই দিনের পর দিন তারপর পাঠ করবার সৌভাগ্য হয়েছে এই শতাব্দীর, বিংশ শতকের ভারতবাসীর। অর্থ তার বুঝুক বা না বুঝুক, তাঁর কণ্ঠে বাঙালী প্রথম শুনেছে প্রাণের বন্দনা:

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রিদিন্ ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে ;...

সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নতন"।

শতাব্দীর সূর্য রক্ত মেঘ মাঝে অস্ত গেল। "স্বার্থে স্বার্থে বেঁধেছে সংঘাত"। কবিকণ্ঠেই বিংশ শতকের ভারতবর্ষ জানাল আপন প্রার্থনা :

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি ;
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত"।

দুই

এই স্বর্গে ভারতের যেদিন জাগরণ—সেদিন নির্দয় আঘাত এসেছিল গর্বান্ধ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে, "ইতিহাসের অচেতন যন্ত্র" চালিত হয়ে আপনার অন্ধ নিয়তির নিয়মে। স্বদেশী যুগের প্রাণবন্যা অবশ্য শুধু সাময়িক আঘাত-জাতও নয়, আকস্মিক উত্তেজনাও নয়। সেই কর্মধারার কামনায় দশ বৎসর ধরে জাতির অন্তস্তল হতে প্রকাশিত হয়েছিল এই অনুভূতিতে "এবার ফিরাও মোরে।"—তা শুধু 'চিত্রা'র কবির আত্মবোধ নয়, জাতির প্রার্থনা। বিংশ শতাব্দীর নবজাতকেরা যখন দু-চোখ মেলে পৃথিবী দেখল তখন জাগরণের জোয়ার বাঙলা দেশে। রাখিবন্ধনের সংকল্প দিয়ে তাদের শৈশব, বাঙলার মাটি বাঙলার জলের জন্য প্রার্থনায় তাদের চৈতন্য মুঞ্জরীত। অজস্র-গানে-গানে আলোড়িত এই বোধ—"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে"॥

"সার্থক জনম আমার"—জাতির প্রাণ কেন্দ্র কলকাতা ; তার বাইরে পূর্ব বাঙলায় জন্মালেই হয়তো কথাটার সম্পূর্ণ অর্থ তখন অনুভব করা যেত—যেখানে বিচ্ছেদের বেদনাকে ফুলারের মূঢ়তায় প্রতি মুহূর্তে রক্তস্রাবী করে, যেখানে "বন্দেমাতরম্" হয়ে ওঠে নিষিদ্ধ বন্দনা, রেগুলেশন লাঠি মাথায় নিয়ে যা উচ্চারণ করতে থাকে বিদ্রোহী কিশোর ;—আর যেখানে সেই সঙ্গেই গৃহ-বিচ্ছেদের চক্রান্তও সার্থক হয়ে ওঠে হিন্দুর নির্বোধ ঔদ্ধত্যে ও মুসলমানের বিভ্রান্ত প্রতিকূলতায়। "সার্থক জনম আমার"—কিন্তু সেদিক থেকেই ব্যর্থতার নিয়তিও রচিত হতে থাকে, তার গতিরোধ করাই বা কার সাধ্য ? বিভিন্নের সেই ঐক্যসাধন তাই বলে কি নিতান্ত মিথ্যা ?

আশ্চর্য নয় যে, আমার শঙ্কিত ও স্পর্ধিত বাল্যস্মৃতিতে সঞ্জীবিত হয়ে আছে এক বৈশাখ-মধ্যাহ্নের সেই চমৎকৃত আলোচনা যাতে ন্যায়-অন্যায় ইষ্ট-অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করে বাঙালীর অপমান মোচনের আনন্দই প্রকাশিত হয়েছিল—"ধরা পড়া থেকে আপনার হাতে আপনাকে বলি দিতে পারল আঠারো বছরের বাঙালী ছেলে!" বাঙলা দেশের মনের জ্বালা সত্যই তারপরে অগ্নিমূর্তি ধরে প্রকাশ পেতে চেয়েছে, শাসকের দণ্ড বা নেতৃ-সমাজের সদুপদেশ তাকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। তার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল ছিল স্বাধীনতার উদ্দীপনা ও বিভ্রান্ত স্বাদেশিকতা, জাতীয় কলঙ্ক-ক্ষালনের সেই স্পর্ধিত প্রতিজ্ঞা। 'পথ ও পাথেয়', 'সদুপায়', 'সমস্যা' কোথায় পড়ে ছিল কোন্ পত্র ও পত্রিকার পাতায়। 'রাজাপ্রজা'র সে বিচার আমাদের বালক জীবনে জানবারও কথা নয়।

বঙ্কিমের করস্পর্শে যখন প্রথম কৈশোরের স্বপ্ন-শতদল মুকুলিত হয়ে উঠছে—পৃথিবীর চারিদিকে যখন বিস্ময় আর বিস্ময়, সেই মুহূর্তেই ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম গঞ্জনাও আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হল—"মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন"। এমন গঞ্জনা আর কী আছে, মনুষ্যত্বের এমন ধিক্কার? আর এমন স্বপ্নই বা আর কী আছে—"মা যা হইবেন"—জীবন-মরণের এমন সাধনা? পূর্ব বাঙলার কিশোরের কাছে অন্তত সেদিন অন্য কিছু এত সত্য ছিল না। আর, ঠিক সেই মুহূর্তেই তার কৈশোরের দুয়ারে এসে পৌছয় বিবেকানন্দেরও বীরবাণী—"অভীঃ! অভীঃ।" 'গীতা'র উপদিষ্ট পথ আমাদের সম্মুখে তখন উন্মোচিত হয়ে গেল, কর্মযোগের নিষ্কাম সাধনার এমন আদর্শ আর নেই—ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধ।

'সঞ্জীবনী সভা'র চল্লিশ বৎসর পরেও ক্ষ্যাপামির তপ্ত হাওয়া দেশের উপর দিয়ে কেন এরূপে বয়ে চলল তার কারণ দেশের ইতিহাসে ও খণ্ডিত চেষ্টায় যে সন্ধান করবার এখন করুক। আমরা জানতাম—দেশ একটা সত্য; স্বাধীনতা একটা মহৎ মূল্য; আমাদের যুগযুগান্তরের ইতিহাস আমাদের কালের জন্য রেখে গিয়েছে এই সাধনা।

মুক্ত তরবারি ও মড়ার খুলিতে মোমবাতি জ্বালার অনুষ্ঠান এ জন্য হয়তো করা চলত, কিন্তু তা করা হয় নি। রক্ত দিয়ে সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরও হয়তো কেউ করতে পারে—করার মতোই সেই প্রতিজ্ঞা। কিন্তু এই অগ্নিমন্ত্রে-দীক্ষায় প্রয়োজন হয় নি কোনো 'দীক্ষা'র—গুরুর কাছেও না, কালীর কাছেও না। আপনার কাছেই ছিল আপনার এই সত্য স্বীকৃতি—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"। আপনার থেকেই এই আহ্বান পেয়েছিলাম বিবেকানন্দের অভয়-মন্ত্রে, আর পথ দেখেছিলাম 'গীতা'র কর্মযোগে।

তিন

জীর্ণ কালে আমি গ্রন্থগ্রহণ করি নি, জীর্ণ পরিবেশেও না। পূর্ব বাঙলার খড়োঘরের জীবনযাত্রায় যে ছেলেবেলা অনাড়ম্বরে কেটেছে উপকরণ-ভিত্তিক সভ্য-সমাজের তাতে লজ্জিত বোধ করবারই কথা। কিন্তু মেদ বেশি না থাকুক, তাতে মজ্জার অভাব ছিল না। আমাদের গৃহের চারিপাশে তখনো অবাধ ছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের শুভ্র উদারতা ও কৌতুক সরস জিজ্ঞাসা; তার সঙ্গে এসে দেখা দিচ্ছিল বিংশ শতকের কর্মোদ্যমে সুস্থ বিশ্বাস। রুশ-জাপান যুদ্ধের সেনাপতি-মণ্ডলের চিত্রপট ছিল বৈঠকখানার সেই বাঁশের বেড়ায় লম্বমান। খড়োঘরের থামকে আশ্রয় করে তখনো ছিল মহারাণীর প্রতিলিপি, আর তারই সঙ্গে সেদিনের শাদা-কালোয় বড় বড় চিত্র—রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও রমেশচন্দ্র মিত্র। প্রকাণ্ড পট থেকে পরিচয় ঘটত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে ফিরোজ শাহ্‌ মেহ্‌তা পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি-দলের সকলের সঙ্গে। জানতাম কেন গোখ্‌লের আলেখ্য থাকলেও তিলকের আলেখ্য থেকে সে উকিলের বৈঠকখানা ঘর বঞ্চিত। কেন সুরেন্দ্রনাথের পৃথক চিত্রও ঘরে রাখতে নেই। কেন 'লাল-বাল-পাল' অনুচ্চ-উচ্চার্য তিন নাম। আর কেন অরবিন্দ-

বারীন্দ্রের নাম শুধু উচ্চার্য গোপন-কক্ষে। হিন্দু গৃহের ঐতিহ্য সত্ত্বেও বাড়িতে ছিল না পটস্থ কোনো দেবদেবীর প্রসন্ন বা ভয়াল দৃষ্টি আমাদের দিকে—এই মহৎকীর্তি মানুষেরই চোখের তলায় সে গৃহে আমাদের ছেলেবেলা কেটেছে—মানুষকে মহৎ বলে জানাই ছিল স্বাভাবিক।

সেরূপই স্বচ্ছন্দ অধিকার পেয়েছিলাম কল্পনার জগতে। শৈশবে কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ছিল। মধুসূদন বঙ্কিমের পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যের তীর্থ দেখলাম বাল্যেই। সম্মুখে চাবি-দেওয়া সে আলমিরায় আমাদের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ হল না। জীবনের এই নবজন্মের পথই তাতে আবিষ্কৃত হল। স্বাভাবিক জিজ্ঞাসায় সে পথ এগিয়ে নিয়ে গেল এই কিশোরকে যেমন 'গীতা' ও বিবেকানন্দের বক্তৃতা-সংগ্রহের দিকে, অন্য দিকে সেই প্রথম কৈশোরের স্বপ্নভরা আধবোঝা আধ-না-বোঝা দুঃসাহস তেমনই ক্রমে তাকে একদা উত্তীর্ণ করে দিলে শেক্‌স্‌পীয়রের রূপ-জগতে, পোপের অনূদিত ইলিয়াড-ওডেসির বীর-শিবিরে, ইংরেজি সাহিত্যের অসামান্য ঐশ্বর্যলোকে। তারও পূর্বে ছিল পরম বিস্ময় বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ—সেদিনের তুলনা নেই, সে স্বপ্নের শেষ নেই, আত্মার সেই অভিযানের দিগন্ত চিরপ্রসর্যমান। কারণ, পূর্বেই সেই পথের প্রারম্ভেই সৌরকরাঙ্গুলি এসে চোখে মুখে বিদ্যুচ্ছটা ফুটিয়ে দিয়েছিল—কচিৎ শ্রুত কোনো গানের সুরে—"আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি"; কচিৎ পঠিত কোনো বৌদ্ধ কথার শুভ্র সম্পদে—"নৃপতি বিম্বিসার / নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা / পদনখকণা তার"—বাঙালী জীবনের কোনো অপূর্ব সহজ কথায়—"গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে / মৈত্রমহাশয় যাবে সাগর-সঙ্গমে / তীর্থস্নান লাগি"—কোনো কচিৎ শ্রুত ছন্দের অপূর্ব মন্ত্রে:

> "নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
> ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে"।

আর শেষে পরম বিস্ময়ে এল কৈশোরের চমৎকৃত হৃদয়ের উদ্বেলতার বহু প্রতিধ্বনিত এই শপথে:

> "আমি ঢালিব করুণাধারা,
> আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
> আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
> আকুল পাগল-পারা"।

প্রতি মানুষের জীবনেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ একদিন না একদিন হয়—কেউ জানে, কেউ জানে না। কালের নিয়মে যে মহাজীবনের গান আমরা বিংশ শতাব্দীর নবজাতকেরা জন্মসূত্রে লাভ করেছিলাম আমার প্রথম কৈশোরের দিকেই তা বঙ্কিম বিবেকানন্দের প্রভাবে জাতীয় জীবন-সঙ্গীতরূপে যেমন প্রথমে রূপায়িত হয়েছিল, তেমনি জীবনের জয়গানে পরিণত হবার বেদনাও তার মধ্যে প্রায় সেই সময়েই সঞ্চারিত করেছিল এই রবি-করস্পর্শ। এ সত্য জানি না বলাও অসাধ্য—'প্রবাসীর' পাতা থেকে তা ঝরে পড়ত আমাদের গৃহে যখন প্রতি মাসে তাতে 'গোরা'র মহৎ-কাহিনী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। পিতা ও অগ্রজদের আলোচনা সূত্রেও তা এসে আমাদের চোখে-মুখে ঠেকত। তখন পর্যন্ত 'চোখের বালি'র বিতর্ক শেষ হয় নি, 'সোনার তরী' নিয়ে কল্পনার অন্ত নেই। 'চিত্রাঙ্গদা' নিয়েও মিথ্যার ধূলিতে হাওয়া দূষিত, অবশ্য আমাদের গৃহে সেই মালিন্যের মিথ্যা ছায়া জমতে পায় নি। কিন্তু রবীন্দ্রালোককে জানি বলাও অসাধ্য—বহিঃপ্রাঙ্গণে যখন দেখতাম 'রাখি-বন্ধন'-এর পুরোধার বিদায় একটা সংশয়-দিগ্ধ ক্ষোভের বিষয়। বিশেষত পাঠ্য পুস্তকের বাইরে কাব্য ও নাট্যের জগৎ আমার নিকট নিষিদ্ধ না হলেও অপরিচিত, আর কথার জগতের সেই যাদুকর সম্পূর্ণ তখনো অজ্ঞাত। "নিছক হেঁয়ালি" প্রভৃতি সব্যঙ্গ জনরবকে যাচাই করবার মতো বয়স ও সুযোগ আমার নিজের পক্ষে সুপ্রশস্ত ছিল না। তবু একদিন নব-প্রকাশিত 'চয়নিকা' এসে পড়ল বাড়িতে—প্রায় আমারই গোপন আয়ত্তের সীমানায়। আর অমনি সেই পরম বিস্ময়ের মুখামুখি দাঁড়ালাম :

"আজিকে প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর"

বুঝলাম এই তো নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

"কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
দূর হতে শুনি যেন মহাজীবনের গান"।

বারে বারে তবু নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি—আমি কি বুঝেছি এই "হেঁয়ালি"র অর্থ, জেনেছি যা রহস্য তার মর্ম, পেয়েছি যা সংশয়-আচ্ছাদিত তার আন্তর সত্য? আজ জানি, বুঝি না-বুঝি সেই কৈশোর-প্রভাতে রবির কর আমার প্রাণের 'পরে স্পর্শ রেখেছিল। কল্পনা ও অনুভূতির

অভাব ছিল না; কিন্তু হয়তো কৃতিত্ব আমার কালের, আমার পরিবেশ-পরিবারেরও। কারণ, সংকীর্ণ সংসারে আমার জন্ম নয়—সেই হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে ছিল প্রসন্ন উদারতা। "ব্রাহ্ম" রবীন্দ্রনাথ সেখানে ত্যাজ্য নন। যার গুণেই হোক্, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই সেদিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ আমার জীবনে আরম্ভ হল, আর হল বলেই পরে একদিন দুঃসাহসে যাত্রা করলাম বিদেশী ভাষার দেউড়ি পার হয়ে শেক্স্‌পীয়রের জগতে—ইংরেজি কাব্যের সহস্রধারার দিকে।

অবশ্য 'প্রবাসী'-র পাতায় পরিচিত হয়েছিলাম পঞ্চাশৎ বৎসরে সমুত্তীর্ণ কবি-প্রতিভার সঙ্গে। 'চয়নিকা'র পরেই চমৎকৃত আনন্দে শুনলাম নোবেল প্রাইজের সম্মান-লাভের কথা। বাবাকে দেখেছি তখন আইনের বই ফেলে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র সঙ্গে বাঙলা 'গীতাঞ্জলি' 'খেয়া' 'নৈবেদ্য'র প্রতিটি কবিতা মিলিয়ে পাঠের সশ্রদ্ধ পরিশ্রমে নিরত। আর চুরি-করা বাঙলা 'গীতাঞ্জলি'-র থেকে আমিও নিজেই আবিষ্কার করেছি আর মুখস্ত করে নিয়েছি :

"হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগরে ধীরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে,"… ।

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদর সবার সমান"… ।

"ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোনে কেন আছিস ওরে"… ।

"বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়"… ।

"আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে"… ।

"জীবনে যত পূজা হল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা"… ।

"সীমার মাঝে, অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর"।

আর সঙ্গে সঙ্গে 'প্রবাসী'-র পৃষ্ঠা থেকে আমি পরিচিত হয়ে নিয়েছি 'জীবনস্মৃতি'-র সঙ্গে, অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ'-এর সঙ্গে; পেয়েছি আমার স্বনির্ভর যাত্রার সাগ্রহ অধিকার।

তার পরে 'হিতবাদী সংস্করণ' রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থাবলী থেকে যখন পড়লাম একে-একে 'গল্পগুচ্ছ'-এর এক-একটি গল্প তখন সেই দৈব ঘটনাই ঘটল যা 'চয়নিকা' পাঠে প্রথম ঘটেছিল, যাকে ইংরেজি ভাষায় বলে "মিরাকল"। সত্যই আমি সীমার মধ্যে অসীমের সুর শুনলাম। 'জীবনস্মৃতি' ও অজিতকুমারের 'রবীন্দ্রনাথ' পাঠেও আমি এই আশ্চর্য জগতের জন্য প্রস্তুত হই নি। 'চয়নিকা' থেকে শুনেছিলাম জীবন-সত্যের মহাসঙ্গীত, "মহাজীবনের গান"—'গল্পগুচ্ছ'-এ দেখলাম তারই আর এক রূপ মানব-সত্যের মহোৎসব। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের পরে এবার সেই স্রোতধারার লোকালয়ে প্রবেশ। অথচ তখনো আমি নবীন কিশোর, প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে; 'বলাকা'-র বাণী তখন সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় দেখা দিচ্ছে, আমার আকাশ-মুখী চক্ষু তার জন্য অপেক্ষমাণ, আমি তার জন্য প্রস্তুত—কিন্তু সম্পূর্ণ প্রস্তুতি সহজসাধ্য নয়।

চার

প্রত্যেকেরই কৈশোর থেকে যৌবনের পথ আত্ম-পরিচয়ের পথ। তখন থেকে আপন পরিচয় আপনাকেই আবিষ্কার করতে হয়—কালের নির্দেশ ও প্রকৃতির প্রবর্তনাকে অভিজ্ঞতায় মিলিয়ে। আকৈশোর কালের যে বাণী আমাদের ডাক দিয়েছে তা "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—বিবেকানন্দের কণ্ঠ থেকেই তা এসেছে আমাদের প্রাণে। সে আত্ম-উদ্বোধনের ডাক। আকৈশোর যে কবি-আহ্বান প্রথম আমাদের কানে এসেছিল—তা "এবার ফিরাও মোরে"—বিংশ শতকের উদ্দেশ্যেই তার ডাক—"ওরে, তুই ওঠ আজি।"—সেই আত্ম-নিবেদনেরই আহ্বান:

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা,...

স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যরে করিয়া ধ্রুবতারা"।

কিন্তু 'চয়নিকা'য় গ্রথিত 'চিত্রা' ও 'ক্ষণিকা'র কবিতা থেকেই অনুভব করি শুধু আত্ম-সাধনা নয়, এ আত্ম-প্রকাশেরও আহ্বান। শুধু হিন্দু স্বাজাত্যের বাণী নয়, মহাজাতিক সাধনারও আহ্বান এবং জীবনানন্দের জয়ধ্বনি, মানব মহারসের অভিষেকোৎসব। "মা গৃধ", কিন্তু এই ধরণীর মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার জীবনের সুধারসে পান না করে কোথায় আমার মুক্তি, কোথায় আমার শিব, কোথায় আমার সত্য?

অথচ আমাদের গীতা-বিবেকানন্দ-গড়া মন প্রধানত হিন্দু স্বাজাত্যে প্রবুদ্ধ এবং আনন্দকে স্বচ্ছন্দ হৃদয়ে গ্রহণ করতেও দ্বিধান্বিত ছিল। সৌন্দর্যকে সে শঙ্কিতচিত্তে অস্বীকার করত। জীবনকে শুধু জাতীয় শুভ-সাধনার মহৎ যজ্ঞ বলেই সে নিজের কৈশোর অঙ্গীকার করেছিল। সঙ্গীতে সেখানে অস্বস্তি, কাব্যে সেখানে কুণ্ঠা, শিল্পে সেখানে অস্বচ্ছন্দতা। মর্ত্য মানুষের মর্ত্য-মমতায়, ভুলে ভ্রান্তিতে তার কঠিন উপেক্ষা। জীবনের নবরসের মধ্যে শুধু বীর আর রৌদ্র রসেই তার প্রাণ-সীমা নির্ধারিত। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত বাকী সব রসই "নিরেস" রূপে গণ্য। কারণ নিবৃত্তির প্রাচীর-বাঁধা এক সঙ্কীর্ণ পথেই যেতে হবে রুদ্রের সিংহাসন-তলে, "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। এ কথা আজ মনে হবে এক অবিশ্বাস্য কূপমণ্ডুকতা। নিশ্চয়ই শতাব্দীর মধ্যভাগের কিশোরদের অপেক্ষা আমরা বিংশ শতকের প্রথম দশকের নব জাতকেরা কম জানতাম চিত্র-তারকাদের তথ্য ও টেস্ট-ক্রিকেটের রেকর্ড-পঞ্জিকা। কিন্তু সম্ভবত বেশি জানতাম দেশ একটা সত্য, "ক্যাশক্রপে" পুরুষার্থ নেই। সেদিন আমাদের পক্ষে হাসি ছিল শাসকের শাসনে নির্বাসিত, নিজেদের বিদ্রোহের সাধনায় নিমীলিত। অথচ হাসি ছিল আমার মাতৃভাষা, কল্পনা আমার সহোদরা। সৌন্দর্যে আমার সহজাত আসক্তি, জীবনে আমার জন্মগত উল্লাস—"শুধু অকারণ পুলকে"—ক্ষণে ক্ষণে আনন্দ শিহরণে আমি অনুভব করতাম:

"শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে"।

কৈশোরের আত্ম-সংস্কারের সাধনা একই কালে দুই বিভিন্নমুখী আকর্ষণে বিমূঢ় হয়ে পড়ত। আত্ম-সংযম না আত্ম-প্রকাশ, স্বাধীনতা না সম্পূর্ণতা, তপস্যা না আনন্দ, একান্ততা না সমগ্রতা—এমনি করে প্রাণের দ্বন্দ্ব-বিরোধে আমিই আমাকে খুঁজে ফিরেছি। গীতা-বিবেকানন্দের প্রেরণায় চালিত মন সহজে সংযমের সঙ্গে প্রকাশকে, স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পূর্ণতাকে স্বীকার করতে চায় নি। কর্তব্যের সঙ্গে কল্পনাকে, "বীর্যের সঙ্গে কৌতুককে", শ্রেয়-সংকল্পের সঙ্গে মর্ত্য ও মানুষের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তিকে স্বাভাবিক সত্যের মতো গ্রহণ করতে না পারার মধ্যে পৌরুষ নেই, আছে শূন্যতা।

শূন্যতার দিকে মুখ রেখে জীবনে সমুত্তীর্ণ হওয়া এক সাধনপ্রণালী, আর পূর্ণতার দিকে মুখ করে জীবনে অবতরণ আর-এক সাধনপ্রণালী। আজ আমার কাছে স্পষ্ট একটা মোটামুটি গতানুগতিক ভারতের বা জীবন-বিমুখ ভারতের প্রধান পথ; আর একটা আধুনিক মানবতার বা জীবন-ধর্মী মানবতার প্রধান পথ। আর আজ আমার সন্দেহ নেই কোন্ পথ আমার পথ। কিন্তু সেখানেও রবীন্দ্রনাথই সেই মুক্তিদাতা জীবনের পথে "জনসমুদ্রের তীরে"।

কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গেই এ চেতনা আমার মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন—"মঙ্গল ঘট হয় নি যে ভরা সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে"। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' 'ছোট ও বড়' প্রভৃতি দুই পথের সঙ্গমক্ষেত্র থেকে আমার হাত ধরে নিলে। 'বলাকা'-র গতিময়তা আমাকে 'সবুজ পত্র'-র দিন থেকে পথ দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে চলল। 'ঘরে-বাইরে', 'চতুরঙ্গ'-র সঙ্গে সঙ্গে এল 'ন্যাশনালিজমের' নিকটে। আমার জিজ্ঞাসা নিঃসন্দেহে মেনে নিল তার সাক্ষ্য। বিংশ শতাব্দীর বৃহৎ সত্যের জন্য আমি প্রস্তুত হলাম। স্বদেশের স্বাধীনতার মতোই আমরা সার্বজাতিক স্বাধীনতাকে যুগের সাধনা বলে অনুভব করি। প্রথম যুদ্ধান্তের যজ্ঞধূম থেকে তখন মানুষ নবজন্ম গ্রহণ করছে জারতন্ত্রের দেশে—গোড়া থেকে দিচ্ছে টান। চাপা থাকবে তা আমাদের কাছে, আর কবির কাছে? ইতিহাসের স্বপ্ন যে সত্য হয়ে উঠেছে এ বার্তা আর চাপা থাকবে কত দিন?

আমরা যখন ভারতের প্রান্তে প্রান্তে অস্থির বেতালা নিয়মে দেশবাসীকে প্রীতির মধ্য দিয়ে সেবার মধ্য দিয়ে আপন করবার সাধনায় বারেবারে নিরাশ হচ্ছি, তখন আমরাই কি জানতাম আমাদের কর্ম যজ্ঞের মধ্যেও 'স্বদেশী-সমাজ'-এর স্বপ্নও মিথ্যা হয় নি? অন্যদিকে আমাদের সেই এক-চক্ষু যাত্রার

ফলে আমরাই কি বুঝেছি যাকে প্রীতি ও সেবার মধ্য দিয়ে আপন করি নি তার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ এবার বঙ্গবিভাগ নয়, ভারতবিভাগেই পরিণত হবে? গান্ধীজীই কি বুঝেছিলেন—চরকা আর "হিন্দ্ স্বরাজে"র কাল-প্রতিকূলতা ধূলিসাৎ করে সত্যের আহ্বান ভারতবর্ষকেও আধুনিক জীবন ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত করবে? না, কবিই জানতেন যন্ত্র-যুগের ও শ্রম-শিল্পের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা অগ্রাহ্য করেই মানুষের ইতিহাস এই ভারতবর্ষেও হবে জয়ী—মানুষে বিশ্বাস হারানো যাঁর বিবেচনায় পাপ, তাঁর পক্ষেও বুদ্ধির দৌর্বল্য! রবীন্দ্রনাথই কি জানতেন, না আমরাই জানতাম—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ আমাদেরও পৌঁছে দেবে তরঙ্গ মন্দ্রিত জন-সমুদ্রের তীরে—মহাপঙ্কক কেন, ইতিহাস ছাড়া যেখানে আর পঞ্চকের আর মহাগুরু নেই।

এমন কথা বলবার কারণ নেই—আমি রবীন্দ্রনাথকে যথার্থ করে লাভ করেছি। একথা বলবার মতো সাহসও আমার নেই। কারণ, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ আমার ব্যক্তিগত সীমার বাহিরেই প্রায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সস্নেহ পরিচয়ে আমার কৈশোর-যৌবন ধন্য হয় নি। আমার প্রধান বাধা ছিল নিজের বিসদৃশ সংকোচ। গৌণ কারণও ছিল। নালন্দার দ্বারপণ্ডিতেরা বিদ্যার পরীক্ষা না নিয়ে কাউকে সে মহাবিহারে গ্রহণ করতেন না। শান্তিনিকেতনের দৌবারিকদের নিকট পরীক্ষা দিতে হয় রূপের কুলের এবং বিদ্যার, এমন জনশ্রুতি দেশে প্রচলিত ছিল। পরীক্ষা করার কথা নয়, কারণ ওরূপ প্রস্তুতির আমার একান্ত অভাব। "দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে রাজেন্দ্র সঙ্গমে", গিয়েছি দু-একবার। তা স্মৃতির অমূল্য সঞ্চয়। আমার কাছে তাই রবীন্দ্রনাথ 'গুরুদেব' নন, কবিগুরু, চিন্তাগুরু। অর্থাৎ গুরু তিনি প্রধানত এজন্য যে বিংশ শতকের এই ভারত-কিশোরের জাতীয় স্বাধীনতার সংকল্পকে তিনি জীবনের সামগ্রিক সাধনায় রূপায়িত করবার প্রেরণা দিয়েছেন, আমরা তাঁর কাছে পেয়েছি প্রাণমন্ত্রের দীক্ষা। ভারতীয় ঐতিহ্য মোহকে তিনি মানব-ইতিহাসের মুক্তি-অভিযানে মিলিয়ে নিতে সাহস দিয়েছেন—আমরা তাঁর কাছে পেয়েছি জ্ঞানযোগের দীক্ষা। বিংশ শতকে জন্মে আমরা জানলাম "আলোকেরই মতো মানুষের চৈতন্য মহা-বিকিরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে"—আমরা তাঁর কাছে পেয়েছি এই আলোক-যাত্রার দীক্ষা।

এমন কথা তাই বলব না—রবীন্দ্রনাথের কাছেই পেয়েছি আমরা সকল দীক্ষা। কারণ লোকে বলে, আমাদের বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা—কথাটা হয়তো সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ তারও অনেক আগে ওখানে পৌঁছেছিল এই কাঁচাদের প্রাণে আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচাবার মন্ত্র—'বলাকা'র ডানার হাওয়া। তাইতো এখন বলতে পারি—ইতিহাসের গতিতে জীবমানব আজ বিশ্বমানবীয় চেতনায় সমুন্নত হয়ে চলেছে—যে বিশ্বমানব মানুষের শুভবুদ্ধি আশ্রয় করে আজ নরাণাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। এমন কথা তথাপি বলব কি করে—বিশ্বের চৈতন্যময় যে সত্তাকে কবি বিশ্বমানব-রূপে জেনে নিঃসংশয় হতে চেয়েছেন, আমিও তাঁকে স্বীকার করি? করি না। কিন্তু তাঁর "মানব-ধর্ম", তাঁর "মানবিক ভূমা", তাঁর "মানব-সত্য" আমার মানব-বুদ্ধি, মানব-হৃদয়, মানব-কল্পনাকে লঙ্ঘন করে যায় না—তাকে স্বীকার করেই অতিক্রম করতে চায়। "সমস্ত মানব সংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে, অভাব আছে, অপমান আছে, ততক্ষণ কোনো একটি মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে না—" এই তো আজকের মতো যথেষ্ট—এই তো আজ ইতিহাসেরও কথা।

এ কথা জানি, ইতিহাসকে আমি যেরূপে অনুভব করেছি সেরূপ অনুভব করতে 'রাশিয়ার চিঠি'র রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত স্বস্তি পেতেন কিনা সন্দেহ। তাঁর একথাও সত্য তাঁর কবিতা হয়তো সর্বত্রগামী হয় নি; কিন্তু তাই বলে আমি তো জানি তাঁর কবিতার জীবনগামিতা, তাঁর সৃষ্টিশক্তির নিয়তগামিতা। শহর ও পল্লীর বৈপরীত্য যে সভ্যতার শেষ নিয়তি নয়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে তা অপসারণের প্রচেষ্টা আছে, একথা তিনি বুঝেছিলেন। ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতি যে ব্যক্তিগত মুনাফাবাদের সভ্যতায় নেই, সমাজতন্ত্রী শিল্পায়নেই বড়ো হতে পারে ব্যক্তিত্বের মুক্তি সার্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ, এ সম্ভাবনাও তো জ্ঞানবৃদ্ধ কবি দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর পল্লী-মমতা ও তপোবন-প্রস্তাবনার অনেকটাই যে একটা অতীত-মুখী আদর্শ কল্পনা, এ সত্য তিনি স্বীকার করতেন কি না জানি না। নারী-আদর্শ কল্পনায় তিনি ভারতীয় নারীকে শ্রী ও সৌন্দর্যে অভিষিক্ত করেছেন। কিন্তু সে পুরুষের সহকর্মিণী নয়; সহধর্মিণী, গেহিনী, কল্যাণী বা মোহিনী। আপন মানবীয় অধিকারেই জ্ঞান কর্ম ভাবের অভিযাত্রিণী যে নারী, রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' 'ল্যাবরেটরি'তে তাঁকে কি দেখেছি। অথচ ইতিহাস নিশ্চয়ই এই উত্তরাধিকার দানেই নারীকে সম্পূর্ণ করবে।

কালান্তরের মুখে জন্মগ্রহণ করে আমরা যাঁরা পৃথিবীর রূপান্তরের সাক্ষী—ধন্য হয়েছি এই শতাব্দীতে এ দেশে জন্মে—নব সৌরলোকে মানুষের নবজাতকের সম্ভাবনাও কল্পনা করি, তাঁরা তবু আজ শতবর্ষ পূর্বে ভূমিষ্ঠ এই পৃথিবীর নবজাতককে আমাদের গুরুর প্রণাম নিবেদন করতে পারি—কালান্তরের পথে তিনিই করেছেন প্রাণ-নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, তিনিই মহাজীবনের বাণীদূত, তিনিই মহামানবতার মন্ত্রদ্রষ্টা। কালেরই নিয়মে আপনাকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার মহৎ শিক্ষাও তিনি দিয়েছেন নিজ জীবনে। কালেরই নিয়মে তাঁরও কত ধ্যানধারণা মত-অভিমত একদিন অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, একদিনের সত্য আর-দিনের মিথ্যা হয়ে পড়ে থাকবে পথের ধূলিতে, এ সত্যও তিনিই ঘোষণা করেছেন। গতিই নীতি, পথই শাশ্বত, প্রোসেসই সত্য—পথ চলা সেই তো তোমার পাওয়া—এই পরম মন্ত্রও তো সেই পান্থের পরম মন্ত্র, তাঁর শ্রেষ্ঠ দীক্ষা। দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্য দিয়ে সুষমা থেকে মহাসুষমায়, পূর্ণতা থেকে পূর্ণতরতায়—চরৈবেতি চরৈবেতি।

বাংলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বিশেষ প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের মত নাট্যকারের। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, নট ও প্রয়োগ-কর্তা। যৌবনের প্রারম্ভ হতে…তিনি নট ও প্রয়োগকর্তার রূপে তাঁর গুণমুগ্ধদের সম্মুখে অনেকবার আবির্ভূত হয়েছেন। এমন কি বার্ধক্যে পদার্পণ করবার পরও তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রয়োগ নৈপুণ্যের বিবিধ কলাকৌশল দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। আমাদের দেশে নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, দর্শক বিচারকের মত আসনে বসে থাকবেন এবং অভিনেতা মঞ্চের কাঠগড়ায় আবদ্ধ আসামীর মত অভিনয় করবে—এই ব্যবস্থার মধ্যে একটা ঘোরতর অসামঞ্জস্য আছে। দর্শক এবং অভিনেতার মধ্যে যে বেড়া সেকালের যাত্রায়, গ্রীক ট্র্যাজেডির অভিনয়ে এমন কি সেক্সপীয়ারের থিয়েটারে ছিল না, যে বেড়া তুলে দেবার জন্য বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দুইজন প্রয়োগাচার্য (মায়ার হোল ও রাইনহার্ট) চেষ্টা করে আংশিকভাবে কৃতকার্য হয়েছেন, সেই বেড়া তুলে দেবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথও নিজস্ব দল নিয়ে দু' একবার করেছেন।

রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ
শিশিরকুমার ভাদুড়ি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রযোজক ও অভিনেতা

হিরণকুমার সান্যাল

একদা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথকে এক ব্যক্তিগত চিঠিতে তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ জানান যে ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের নাটক ছাড়া আর কোনো নাটক অভিনয় করা হয় না। আর এটা নাকি রবীন্দ্রনাথের স্বাভিমান ও অহংকারেরই নিদর্শন। একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় রঙ্গমঞ্চ থেকে অনেক দূরে ছিলেন, আর সমসাময়িক নাট্যকারদের সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এই দূরত্বের জন্য রবীন্দ্রনাথের শুধু নাটক নয় তাঁর অভিনয় ও প্রযোজনা পদ্ধতি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তবু মনে রাখতে হবে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নাটক অভিনয়ের শুরু হয় অন্যদের রচনা নিয়ে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সংবাদ-প্রভাকর' থেকে মজার মজার কবিতা জোড়াতাড়া দিয়ে এক 'অদ্ভুত নাট্য' খাড়া করেছিলেন, ইংরাজীতে যাকে বলে 'এক্‌স্ট্রাভ্যাগেন্‌জা' তারই অনুকরণে। গুণেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় মহা উৎসাহে তার মহলা চলত। বালক রবীন্দ্রনাথের কানে তারই একটি গানের দু-চার লাইন ভেসে এসেছিল ও-বাড়ি থেকে এ-বাড়িতে :

"ওকথা আর ব'লো না আর ব'লো না
বলছো বধূ কিসের ঝোঁকে"…ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে ভুল করে এই 'অদ্ভুত নাট্য' আরোপ করেছেন তাঁর বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের নামে। কিন্তু আসলে এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই রচনা বা সংগ্রহ।

কিন্তু রীতিমত পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয় হত জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। নাটুকে রামনারায়ণ (রামনারায়ণ তর্করত্ন) 'নব নাটক' রচনা করেছিলেন

ঠাকুরবাড়িতে অভিনয়ের জন্য। আর এই রচনার জন্য তাঁকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে তো সে কালের একজন প্রধান নাট্যকার ছিলেন—শুধু মৌলিক রচনায় নয় অনুবাদেও। শোনা যায় গিরীশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাবের পর তিনি নাটক লেখা ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, আর দরকার নেই, সত্যিকারের নাট্যকার এসে গিয়েছেন। তখনও রবীন্দ্রযুগের শুরু হয় নি।

এর পর ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাটকের উদ্‌বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরবাড়ি কেন্দ্র হয়ে উঠল একটি স্বকীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ নাট্যসমাজের।

ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল অভিনয়ের দিকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন যে একবার কিশোর রবীন্দ্রনাথ এক পার্শি-ভদ্রলোক সেজে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ শুরু করেন ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে। আলাপ যখন বেশ জমে উঠেছে তখন তারকনাথ পালিত হঠাৎ ঘরে ঢুকে "এ কে ? রবি নাকি ?" বলে রবীন্দ্রনাথের পিঠে মারলেন প্রচণ্ড এক চাপড় আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছদ্ম দাড়ি গোঁফ গেল খসে। অক্ষয়বাবু তো হতবাক।

খুব ছোট বয়েস থেকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা নাটকে প্রধান ভূমিকায় মঞ্চে অবতীর্ণ হতেন। এ-প্রসঙ্গে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর একটি উক্তি উল্লেখ করা চলে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী ছিলেন বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের গোটা ইতিহাসে সবচেয়ে বর্ণাঢ্য ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি বলতেন, "অভিনয়ের সময়ে কবি তাঁর হাতদুটি যে-ভাবে নাড়াচাড়া করেন তা দেখে আমার সবচেয়ে অবাক লাগে। এমন কি অভিজ্ঞ পেশাদার অভিনেতাকেও সবচেয়ে বিব্রত হতে হয় হাতদুটিকে নিয়ে। এই হাতদুটিকে নিয়ে যে কী করা যায় তা আমরা ভেবেই পাইনে। আর তাই মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় মঞ্চে ঢোকার আগে হাতদুটোকে অন্য কোথাও রেখে আসি। কিন্তু কবির হাতনাড়ার কায়দা ছিল এমন যে শুধু তাতেই দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখতেন।"

রবীন্দ্রনাথের গলার স্বর ছিল জোরালো ও ইংরেজীতে যাকে বলে টেনর। তখনো পর্যন্ত মাইকের ব্যবহার চালু হয় নি। সেই জোরালো গলায় যখন তিনি কথা বলতেন বা গান গাইতেন তখন তা প্রেক্ষাগৃহের শেষ

প্রান্ত থেকেও স্পষ্ট শোনা যেত। গলার স্বরকে তিনি এমনভাবে প্রক্ষিপ্ত করতে পারতেন ও এমনভাবে ওঠাতে-নামাতে পারতেন যা একমাত্র সেরা অভিনেতার পক্ষেই সম্ভব।

প্রায়ই তিনি করতেন কি, ধারে কাছে যাকে পেতেন তাকেই তাঁর নতুন গদ্য বা পদ্য রচনা শোনাতে বসতেন। শিল্পের মূল কথাই হচ্ছে প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্যি। রচনা শুধু ছাপা হলে পরেই তিনি খুশি হতেন না। গদ্যে বা পদ্যে যখনই নতুন কিছু লিখেছেন তখনই শ্রোতা খুঁজে বেড়িয়েছেন। একথার মধ্যে একটুও অত্যুক্তি নেই। এ ধরনের কোনো উপলক্ষে অন্তত একবারের জন্যেও তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরা সেই অভিজ্ঞতাকে কখনো ভুলতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

এবার তাহলে ছবিটি কল্পনা করা চলে। রবীন্দ্রনাথ মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন। অতুলনীয় এক পুরুষ তাঁর ব্যক্তিত্বের বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে দিয়েছেন চারদিকে। এই তিনি গান গাইছেন! এই তিনি কোনো কৌতুক করছেন! এই তিনি কোনো তীক্ষ্ণ মন্তব্য করছেন! আর সে কী আশ্চর্য ভাষা! গদ্যে বা পদ্যে বাংলা মঞ্চে এমনটি আর কখনো শোনা যায় নি। এই দৃশ্য যদি কল্পনা করা চলে তাহলে হয়তো উপলব্ধি হবে যে অভিনেতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ শ্রোতাদের কী প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিতেন।

এ তো গেল রবীন্দ্রনাথের অভিনয়-পারদর্শিতার দিক। অন্য দিকও আছে। নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে তাঁর ছিল উচ্চ কল্পনাশক্তি, প্রখর সচেতনতা ও অসাধারণ স্বকীয়তা। ঠাকুর পরিবারটি এমনিতে ছিল মস্ত ও নানা দিক থেকে বিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট না হলেও এই পরিবারে প্রতিভার অভাব কোনো সময়েই ঘটে নি। কাজেই তাঁর নাটকের ও নৃত্যনাট্যের বিভিন্ন ভূমিকায় কথা বলবার জন্যে ও গান গাইবার জন্যে লোকের অভাব কখনো ঘটত না। কিন্তু গুণী ব্যক্তিদের দিয়েও যদি বিশেষ কোনো কাজ করাতে হয় তাহলেও সাধনার প্রয়োজন আছে। মানুষ গড়ে তোলার এই ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের ছিল এবং এদিক থেকেও নাট্য-প্রযোজক হিসেবে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটি অনুষ্ঠানের আগে দীর্ঘদিন ধরে চুলচেরা মহলা হত এবং মহলার সময়ে

রবীন্দ্রনাথ নিজেকেও যেমন রেহাই দিতেন না, অপরকেও নয়। উত্তর-জীবনে শান্তিনিকেতনে নাটক বা নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করতে হলে তাঁকে বাধ্য হয়ে এমন সমস্ত মানুষের ওপরে নির্ভর করতে হত যাদের তিনি হাতের কাছে পেতেন। কিন্তু এ-ব্যাপারে এমন কি বৃদ্ধ বয়েসেও তাঁর উৎসাহ ছিল অপরিসীম। যারা কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবে নি যে তাদের কোনো অভিনয় ক্ষমতা আছে তাদের তিনি এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যে তাদের কৃতিত্ব দেখে অবাক হতে হয়েছে। এদিক থেকে তাঁকে তুলনা করা চলে নেপোলিয়নের সঙ্গে যিনি গর্ব করে বলতেন যে তাঁর বাঘা জেনারেলদের তিনি গড়েছিলেন কাদামাটি দিয়ে।

মঞ্চসজ্জাতেও রবীন্দ্রনাথ প্রায় গোড়া থেকেই তাঁর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন পর্বে এই ধারা হয়তো বদলেছে কিন্তু তার ফলে তা হয়ে উঠেছে আরো বিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের মঞ্চসজ্জার মূল কথাটি হচ্ছে সরলতা ও বাহুল্য-বর্জন। 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন: "আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রভাবে দৃশ্যপট একটা উপদ্রব রূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত।...নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে। চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত। অনধিকার প্রবেশ ক'রে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালা-গানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে-নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ বাস্তব-সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাব-সত্যকেও বাধা দেয়।"

এই আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে এসে আলোকসম্পাতকে আজ আমরা পরিণত করেছি অভিসম্পাতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মঞ্চসজ্জার সরলতার মানে

এই নয় যে তা সব কিছুকে বর্জন করেছে। বরং এই সরলতা গড়ে উঠেছে প্রকৃতির সুকুমার অনুভূতি থেকে। এ-প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে রবীন্দ্র-নাটকের বিষয়বস্তুতে ভাবের সংঘাতের দিকেই জোর দেওয়া হয়, ঘটনা-বিন্যাসের দিকে নয়। আগেই বলেছি যে ঠাকুর পরিবারে গুণী অভিনেতা অভিনেত্রীর অভাব কখনো ঘটেনি। এই ভিত্তির ওপরেই নাট্য-প্রযোজক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কীর্তি দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া ঠাকুর পরিবারে ছিলেন একাধিক প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী। বর্তমান ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ দুজনেই স্মরণীয়। রবীন্দ্র-মঞ্চসজ্জা বলতে যা বোঝায় তাকে রূপায়িত করে তোলার ব্যাপারে এঁদের দুজনের দান উল্লেখযোগ্য। ১৯১৭ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে ডাকঘর নাটকের অভিনয় হয়েছিল এবং সেই অভিনয়ের জন্য মঞ্চসজ্জা তৈরি করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ঘটনাটি তিনি লিখে রেখে গিয়েছেন। শুধু রচনা গুণেই এই লেখাটিকে একটি ক্লাসিক বলা যেতে পারে।

শান্তিনিকেতনে নাটক বা নৃত্যনাট্য অভিনয়ের সময়ে নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর ও কবির পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী মঞ্চসজ্জা ও সাজপোশাকের ব্যবস্থা করতেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে রবীন্দ্রনাথ প্রযোজিত নাটকে নটনটীর সাজপোশাক হত বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। বাহুল্য-বর্জিত মঞ্চসজ্জার পটভূমিতে সেই সাজপোশাকের বর্ণসমারোহ নাটককে করত প্রাণবন্ত, গতিশীল।

এরপর রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য প্রযোজনা সম্বন্ধে দু-একটি কথা না বললে এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নৃত্যনাট্য রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়েসের সৃষ্টি। নৃত্যকলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষজ্ঞ বলা যায় না। তাঁর নৃত্যনাট্যে নৃত্য একেবারেই প্রাসঙ্গিক ও নাটক উপলক্ষ মাত্র। তাহলে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য কী জিনিস? আমি বলব এগুলি আসলে সংগীত-প্রবাহ—এর ভিত্তি সংগীত, এর প্রাণ সংগীত ও এর উদ্দেশ্য সংগীতকে ফুটিয়ে তোলা আর এই উদ্দেশ্যে নৃত্যের ব্যবহার। কিন্তু এই ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা। অর্থাৎ নানা জাতীয় নৃত্যকে তিনি করে নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ আপন। নতুন নতুন রীতির নাচের লোক যেমন তিনি পেয়েছিলেন, তাদের অভ্যস্ত রীতির মধ্য দিয়েই তিনি তাদের গড়ে তুলেছিলেন

নিজের মনের মতন করে। এই মন অসাধারণ মন ছিল বলেই বার বার তিনি নতুন করে স্বষ্টি করেছেন একই নৃত্যনাট্যকে। কিন্তু আর একবার বলব এর উপাদান আর প্রাণ হল নৃত্যও নয়, নাটকও নয়, গান। রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখের কথা মনে পড়ছে। শান্তিনিকেতনে 'শ্যামা' অভিনয়ের পরদিন সকালে তাঁর কাছে গিয়েছি। জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন লাগল ?" বললাম, "সুন্দর"। শুনে বললেন, "যাই বলো, আমার গানই থাকবে —আর কিছু না"।

বিশ্বভারতী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (The Visvabharati University) ভারতের ৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম। কেন্দ্রীয় সরকারের খাস তত্ত্বাবধানে আছে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়—আলীগড় মুসলীম য়ুনিভার্সিটি, বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী য়ুনিভার্সিটি ও বিশ্বভারতী। প্রথম দুইটি সাম্প্রদায়িক নাম ও স্থান লাঞ্ছিত, তৃতীয়টির কেবল স্থানিক নাম-পরিচয়। 'বিশ্বভারতী' নাম না স্থানিক, না সাম্প্রদায়িক, অর্থাৎ এই নামের দ্বারা ইহার কোনো ধর্মীয় বা স্থান-মাহাত্ম্য কীর্তিত হয় না। তবে ইহারও যে স্থান-মাহাত্ম্য নাই, তাহাও বলা যায় না, কারণ শান্তিনিকেতন বিদ্যায়তনের অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস ইহার পটভূমে বিদ্যমান।

বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকৃতি লাভ করে ১৯৫১ সালের ১৪ই মে। ভারত স্বাধীন হইবার চারি বৎসর ও রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের দশ বৎসর পরে ভারত সরকার বিশ্বভারতী য়ুনিভার্সিটি অ্যাক্ট (1951 Act. XXIX) পাশ করেন।

১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অসুস্থ কবিকে শেষবারের মতো দেখিবার জন্য গান্ধীজি ও কস্তুরাবাঈ শান্তিনিকেতনে আসেন। গান্ধীজির আশ্রম পরিত্যাগকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হস্তে একখানি পত্র খামের মধ্যে ভরিয়া দিয়াছিলেন। গান্ধীজি পত্রখানি পড়িয়া রবীন্দ্রনাথকে উত্তরে জানান যে, বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব বিষয়ে তিনি তাঁহার যথাসাধ্য করিবেন।

রবীন্দ্রনাথ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ আধিপত্যর অবসান সুনিশ্চিত এবং বর্তমানে কংগ্রেসই ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ন্তার আসন লাভ করিবে।

বিশ্বভারতীর আর্থিক দায় ও দায়িত্ব কবি গত ৪০ বৎসর স্বয়ং বহন করিয়া আসিয়াছেন। ১৯৩৫-এর ব্রিটিশের ভারতীয় সংবিধান অনুসারে বিকেন্দ্রিত

প্রদেশশাসনে প্রভূত দায়িত্ব ও শক্তি অর্পিত হয়। অখণ্ড বাংলাদেশে মুসলীম লীগের আধিপত্য হইল। বিশ্বভারতী তাহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। একবার বঙ্গীয় সরকার বিশ্বভারতীর জন্য পঁচিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করেন। কিন্তু সে-টাকা আর বাহির করা যায় না। মনে আছে আমাকে দূতরূপে লীগের সদস্যদের সহিত মোলাকাত করিয়া ঐ অর্থ আদায়ের জন্য পাঠানো হয়। একদিন সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত বর্ধমান ও কলিকাতার লীগের কত গ্রহ-উপগ্রহের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ যে ঘুরিতে হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে আজও লজ্জাবোধ হয়। কিন্তু ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে দেশের ও বিদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতির মধ্যে দারুণ বিপর্যয় দেখা দিল।

১৯৩৯ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কী দুঃস্বপ্নময় জীবন অতিবাহিত হয়, তাহার স্মৃতি আজ ম্লান হইয়া গিয়াছে। ইহার পর আসিল বঙ্গচ্ছেদ—পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদারগণের উচ্ছেদ হইল। রবীন্দ্রনাথের জমিদারী সবই ছিল উত্তরবঙ্গে—তাহাও লোপ পাইল। যুদ্ধ-ধনিকদের সাংস্কৃতিক পটভূমি তখনো উজ্জ্বল হয় নাই। ভারত স্বাধীন হইবার পর ভারতের দেশীয় রাজারাও লুপ্ত হইলেন। মোটকথা রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে বিশ্বভারতী স্থাপিত হইবার পর বিশ বৎসর বাহির হইতে অর্থ সাহায্যের যে উৎসগুলি ছিল, তাহা একে একে বন্ধ হইয়া আসিল।

কবির তিরোধানের পর দশটি বৎসর বিশ্বভারতীর মূলধন ভাঙিয়া বাজেটের ঘাটতি পূরণ করা হইতেছিল; কিন্তু সে ধনভাণ্ডার তো অক্ষয় নহে। বিশ্বভারতীকে রক্ষা করিতে হইলে গবর্মেণ্টের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। বিশ্বভারতীর হিতাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে একদল ইহার সমীচীনতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন, কঃ পন্থা। গবর্মেণ্ট তো এখন দেশবাসীর প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত; এখন আর পূর্বের পরিবেশ নাই। রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়াই গান্ধীজির হস্তে পূর্বোল্লিখিত পত্রখানি অর্পণ করিয়াছিলেন।

১৯৪৭ সালে আগস্ট মাসে ভারত বিভক্তরূপে স্বাধীনতা লাভ করিলে আবুল কলাম আজাদ শিক্ষামন্ত্রী পদপ্রাপ্ত হইলে গান্ধীজি তাঁহার হস্তে কবির পত্রখানি দিয়া বিশ্বভারতীকে পোষণ করিবার জন্য তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে গান্ধীজির মৃত্যু ঘটে—তিনি

বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়ীকরণ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। অতঃপর ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হইলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের প্রথম প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন; এবং কেন্দ্রীয় বিধান সভা গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সদস্যগণ বিশ্বভারতীকে স্থায়িত্ব দান করিতে অবহিত হইলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব পেশ ও পাসের মধ্যে যে কত প্রকার বাধা অতিক্রম, কত প্রকার সমস্যার সমাধান করিতে হয়, সে ইতিহাস আজ লোকে বিস্মৃত হইয়াছে। কত কমিটি বসিল, কত লোক শান্তিনিকেতনে আসিল, শান্তিনিকেতন হইতে কত লোককে গিয়া মন্ত্রীদের দরবারে ধরনা দিতে হইল! পার্লামেণ্টের অসংখ্য নিয়ম-কানুনের বাধা—এই সব অতিক্রম করিবার জন্য সহায়তা করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র বসু। অবশ্য প্রধান মন্ত্রী জবহরলাল সহানুভূতিশীল বলিয়া কাজ অনেক সহজ হইয়া যায়।

মন্ত্রীপরিষদ বা ক্যাবিনেটে বিলের খসড়া আলোচনাকালে বলা হইল যে, ভারতীয় সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ মতের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে কোনো বিশেষ ধর্মমতের শাস্ত্রীয় মন্ত্রকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অনুমোদন করা অবিধেয়। এই যুক্তিতে বিশ্বভারতীর মূলমন্ত্র "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" শব্দগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধান মধ্য হইতে পরিত্যক্ত হইল। এই লইয়া দেশমধ্যে এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে তীব্র সমালোচনা হয়। পরে আবুল কলাম আজাদ যখন শান্তিনিকেতনে আসেন, তখন তিনি ভাষণ প্রসঙ্গে "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" মন্ত্রবাক্য পরিত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন; তবে তিনি এই কথাও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, সংবিধানে যে-পরিবর্তনই হউক, শান্তিনিকেতনের এই মন্ত্র শাশ্বত সত্য—ইহার পরিবর্তন হইতে পারে না।

বিশ্বভারতী পার্লামেণ্টীয় আইন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পাইল বটে, কিন্তু শান্তিনিকেতনের অতীত ইতিহাসের সহিত নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের মিলন কি ভাবে ঘটিতে পারে, সে সম্বন্ধে কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আয়োজন হইল না। শান্তিনিকেতনে ইতিপূর্বে দুইটি প্রতিষ্ঠান ছিল—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন—যাহার জন্য তিনি ট্রাস্টডীড স্বাক্ষর করেন ১৮৮৮ অব্দে, এবং যাহাকে কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান হইতেছে বিশ্বভারতী সোসাইটি—যাহা ১৯২১ সালের শেষে স্থাপিত হয়। ইহার জন্য

রবীন্দ্রনাথ একটি ট্রাস্টডীড্ করেন। সুতরাং মহর্ষির শান্তিনিকেতন
ট্রাস্টডীড (১৮৮৮) ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী ট্রাস্টডীড (নিষ্পন্ন ১৯২৩)-এর
উপর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আইনসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫১) স্থাপিত
হইল; অথচ এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়
কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল না। সেইজন্য 'বিশ্ববিদ্যালয়' নামাঙ্কিত হওয়া
মাত্র আদর্শের সংঘাত (clash of ideals) অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা দি
বিশ্বভারতী সোসাইটিকে উজ্জীবিত করিবার জন্য কথাবার্তা চলে মাঝে মাঝে
কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত কর্মধারার বাহিরেও রবীন্দ্রনাথের বিবিধ
কর্মসূচীর স্ফুরণ ও বিস্তারের জন্য এই সোসাইটির প্রয়োজন আছে—এমন ক
একজন সদস্য মনে করেন—আচার্য জবহরলাল নেহরুরও এই মত
জবহরলাল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী সোসাইটির সভাপতি ও
আচার্য। অপর দিকে মহর্ষির শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের শর্তাবলী বর্তমান
পরিবেশে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা, সে সম্বন্ধেও আলোচনার আরম্ভ
শেষ কিছুই হয় নাই।

সাধারণত বলা হয় এবং কাগজপত্রে লেখা হয় যে, বিশ্বভারতী ১৯২১ সালে
২৩ ডিসেম্বর (১৩২৮, ৮ পৌষ) স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহার তিন বৎসর পূ
১৯১৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর (১৩২৫, ৮ পৌষ) শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ প্রান্ত
নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপিত হয়। সেখানে
উপর বিশ্বভারতীর গৃহাদি নির্মিত হয় নাই: প্রথমে সেখানে টেনিস কো
ও পরে স্কুলের ছাত্রাবাস নির্মিত হয়।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের ১৮ বৎসর পরে বিদ্যায়ত
এই পরিকল্পনা কেন গৃহীত হইল।

রবীন্দ্রনাথের সদাচলমান মনে বিচিত্র প্রশ্নের সংঘাত চিরদিনই চলিয়াছি
তিনি ১৯১২-১৩ সালে য়ুরোমেরিকা ও ১৯১৬ সালে জাপান-আমেরিকা
কালে ঐ সকল দেশের শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা দেখিয়া আসিয়াছিলেন। অবচেত
মনে সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জমিতেছিল। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সংকীর্ণ গ
হইতে মুক্তি দিয়া তাহাকে বৃহত্তর পটভূমির মধ্যে দেখিবার ইচ্ছা হ
জাগে। বাহিরের ঘটনাও সহায়তা করিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ পর্বে শান্তিনিকেতনে অনেকগুলি গুজরাটি ছাত্র আ

কবির মনে হইতেছে এত বৎসর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে প্রধানত বাঙালী ছাত্ররাই প্রধান ছিল—কিন্তু বাংলাদেশের বাহিরে যে ভারত রহিয়াছে তাহার যোগ্য সমাদর করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কবির ইচ্ছা ভারতের বিভিন্ন জাতির ছাত্ররা পৃথক পৃথক উপনিবেশে আপনাদের সংস্কৃতি ও বিশ্বাস মতো জীবনযাপন করিয়া পরস্পরকে ভালোভাবে জানিবে। (They would thus get a training from their childhood to respect each other in spite of outward differences. Bolpur institution should not be sectarian or provincial.) এই উদ্ধৃতিটি রবীন্দ্রনাথের ডায়ারি হইতে গৃহীত—(৮ অক্টোবর, ১৯১৮)।

এইটি হইতেছে কবির মনের একটি দিক। অপরটি হইতেছে বিধুশেখর ভট্টাচার্যের উচ্চতর জ্ঞানালোচনার পরিবেশ রচনার আগ্রহ।

ইহার বাহিরেও কারণ ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। ১৯১৭ সালে শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট অন্তরীণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আদৈয়ে 'ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটি' স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে উহার চান্সেলর পদে বরণ করেন। শ্রীমতী বেসাণ্টের ইচ্ছা ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারিক (commercial) বিদ্যায়তন বোম্বাইয়ে স্থাপন। কলিকাতার যাদবপুরে ইন্জিনীয়ারিং কলেজকে ইহার অন্তর্গতকরণ ও আদৈয়ে কৃষি-বিদ্যালয় পত্তন। এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনার মধ্যে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পদ চর্চার স্থান নাই দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে শান্তিনিকেতনে উহার কেন্দ্র রচিবার কল্পনা আসিয়া থাকিবে।

এই সকল বিচিত্র ভাবনার মধ্যে বিশ্বভারতীর জন্ম হইল ১৯১৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর প্রথম মহাযুদ্ধ বিরতি ঘোষণার দেড় মাস পরে। অতঃপর ১৯১৯ সালের ৩ জুলাই গ্রীষ্মাবকাশের পর বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগের পঠন-পাঠন আরম্ভ হইল। রবীন্দ্রনাথ তখন মনে করিতেন আশ্রমবাসী ও আশ্রমবাসিনী স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে উহা সীমিত থাকিবে। অত্যন্ত দীনভাবে ইহার আরম্ভ হইল। যেমন আঠারো বৎসর পূর্বে পাঁচটি ছাত্র লইয়া ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূত্রপাত হয়। সেবার কবিপুত্র বালক রথীন্দ্রনাথ ছাত্ররূপে আসেন—আঠারো বৎসর পরে যুবক রথীন্দ্রনাথ পিতার কর্মভার লইয়া আসিলেন। বিশ্বভারতীর ভিত্তিস্থাপনের তিন বৎসর পরে ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর (১৩২৮, ৮ পৌষ) কবি শান্তিনিকেতনে সভা আহ্বান করিয়া

তাঁহার দ্বারা বিশ বৎসর পালিত প্রতিষ্ঠানকে পাবলিকের হস্তে সমর্পণ প্রস্তাব করিলেন। এই পাবলিক বলিতে বুঝাইল সোসাইটির সদস্যগণ—যাঁহারা এককালীন আড়াই শত টাকা দিয়া জীবন-সদস্য হইলেন ও যাঁহারা বার্ষিক বারো টাকা দিয়া সাধারণ সদস্য হইলেন। এই পরিষদ নির্বাচিত 'সংসদ'-এর উপর পরিচালনার ভার ন্যস্ত হইল। ১৯২২ সালের ১৬ মে বিশ্বভারতী সোসাইটিরূপে রেজিস্টার্ড হইল এবং ১৯২৩ সালের ২৬ জুলাই বিশ্বভারতীর জন্য ট্রাষ্টি নিয়োগ ও কবির দানপত্র রচিত হয়। কবি তাঁহার বাংলা গ্রন্থের (১৯২২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত) স্বত্ব, শান্তিনিকেতনের তাঁহার নিজস্ব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান করিলেন। অবশ্য মহর্ষির শান্তিনিকেতনের ট্রাস্ট সম্পত্তি ইহার অন্তর্গত হইল না—হইতে পারেও না; তবে শান্তিনিকেতনে ট্রাস্টের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের তদারকী কার্যভার আইনত না হইলেও কার্যত বিশ্বভারতীর উপর গিয়া বর্তায়।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা-দিবসে যে সভা হয় তাহাতে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যে ভাষণ দান করেন তাহাতে তিনি বলেন :

> "আজ এখানে বিশ্বভারতীর অভ্যুদয়ের দিন। বিশ্বভারতীর কোষানুযায়িক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে 'ভারতী' এতদিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন, আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আর-একটি ধ্বনিগত অর্থও আছে—বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত করে, ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থাপিত করব। সেইভাবেই বিশ্বভারতী নামের সার্থকতা আছে।"

বিশ্বভারতীর জন্য যে মেমোরেনডাম পত্র রচিত হইল, তাহা পড়িয়া একটি প্রশ্ন মনে জাগে—এই ভাবনা কি আকস্মিক? ইহার পটভূমে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ, জীবনাদর্শ, ধর্মাদর্শ আমরা কি দেখিতে পাইতেছি না?

১৯০১ সালের ৭ পৌষ মহর্ষির দীক্ষা দিনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল। উহা মহর্ষি পরিকল্পিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের নব রূপায়ণ। আমরা নিম্নে মহর্ষির শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ডীড হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—ইহা পাঠ করিলেও পাঠক দেখিবেন কী ধারায় এই বিদ্যালয়ের উদ্ভব হইয়া

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের বারো বৎসর পূর্বে (২০ মার্চ, ১৮৮৮) মহর্ষি যে ট্রাস্ট সম্পাদন করেন, তাহাতে আছে :

> "এই ট্রাস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্মের উন্নতির জন্য ট্রাষ্টিগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথি সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ ও স্থাবর ও অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন, এবং ঐ আশ্রমধর্মের উন্নতি বিধায়ক সকলপ্রকার কর্ম করিতে পারিবেন।"

এই ট্রাস্ট ডীডের কথা স্মরণ করিয়া ১৮৯৬-৯৭ সালে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' স্থাপন কল্পে যে গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেখানেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও সে-গৃহ এখনকার বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অন্তর্গত। একটি পুরাতন ফোটোগ্রাফে এই গৃহের একতল রূপ ও তাহার শিখরে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' খোদিত দেখা যায়। বলেন্দ্রনাথ ব্রহ্মধর্মের শিক্ষার জন্য এই ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন; তাঁহার অকাল-মৃত্যুর তিন বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' স্থাপন করেন। মহর্ষির ট্রাস্ট ডীডের শর্ত ও আদর্শের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভারতীর মেঃ অব অ্যাসোসিয়েশনে বলা হইয়াছে যে ইহা :—"Founded at the request and with the help of his revered father Maharshi Devendranath Tagore in connection with the Santiniketan Asrama Trust founded by the latter and with the sanction of the Trustees of the said trust."

রামমোহন রায় 'ব্রহ্মসভা' স্থাপন করিয়া সদাচারী অমূর্তবাদী ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের এই সভাগৃহে আসিয়া উপাসনা করিবার জন্য মুক্তদ্বার রাখিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে এভাবে সকল ধর্ম-জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে ঈশ্বর-বিশ্বাসী সমগ্রকেই আহ্বান কেহ জানান নাই।

অতঃপর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরের নিকট প্রান্তরে শান্তিনিকেতন গৃহ নির্মাণ করিয়া যে আশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন, তাহাতে রামমোহনের আদর্শ তো ছিলই, তদুপরি তিনি শান্তিনিকেতনের বার্ষিক মেলায় সর্বশ্রেণীর সাধারণ মানুষদের মিলিত হইবার ব্যবস্থা দান করিলেন এবং দেশের অন্তরের মধ্যে যে লোকধর্ম প্রচলিত আছে তাহাদের প্রতিনিধি আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ, সুফী ফকিরদের আসিবার পথ উন্মুক্ত রাখিলেন।

রামমোহন রায়ের 'ব্রহ্মসভা' স্থাপনের নব্বই বৎসর পরে (১৯২১) রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আদর্শ লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার বিদ্যাশ্রমের যে আধ্যাত্মিক পরিবেশের কথা অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন তাহা মহর্ষি কৃত ট্রাস্ট ডীডের মর্মকথা, তাহা রাজা রামমোহন কৃত ব্রহ্মমন্দির স্থাপন কালের উদ্বর্ত পত্রের সুরে বাঁধা।

রামমোহনের স্বদেশপ্রীতি ও বিশ্বপ্রীতি, আপন ধর্ম ভক্তিভরে অন্তরে বহন ও অপরের ধর্ম শ্রদ্ধার সহিত শিরে ধারণ—এই শিক্ষাই রবীন্দ্রনাথের জীবনে রূপায়িত হয় ভাবে ও কর্মে—বিশ্বভারতী মূর্তিতে। অথচ ইহা একটি বিবর্তনের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে রূপ গ্রহণ করে। বিশ্বভারতী তিলোত্তমা নহে, উর্বশীও নহে—ইহা বিশ্বের উত্তমের তিল সংযোগে তাল সৃষ্টি নহে, উহা পরিপূর্ণ বিকশিত-যৌবনা উর্বশীর আকস্মিক আবির্ভাবও নহে। বিশ্বভারতী তিলে তিলে গড়িয়া উঠিয়াছে—সে গঠনকার্য তাহার এখনো শেষ হয় নাই।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশ্বভাবনা ও ভারতভাবনা ওতঃপ্রোত। জীবনের নানা অবস্থায় কখনো একটি কখনো অপরটি প্রবল হয়। কিন্তু নীড় ও আকাশের ন্যায় দুইটির প্রয়োজন জীবন ভরিয়া অনুভবও করেন, সাধনাও করেন।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন কালে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য হিন্দুজাতীয়তা, বর্ণাশ্রম প্রভৃতির গুণগানে মুখর ছিল। কিন্তু তাহারই মধ্যে তাঁহার মন বিদ্যাশ্রমের নীড় ছাড়াইয়া আকাশবিহারী হইতেছে। "মাঝে মাঝে কল্পনা করি··· আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন,···তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়।···যেমন শাস্ত্রে কাশীকে বলে পৃথিবীর বাহিরে, তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান থাকিবে, যাহা রাজ্য ও সমাজের সকলপ্রকার বন্ধন পীড়নের বাহিরে। এখানে আমরা খণ্ড কালের অতীত, আমরা সুদূর ভূতকাল হইতে সুদূর ভবিষ্যৎ কাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করি; সনাতন যাজ্ঞবল্ক্য এবং অনাগত যুগান্তর আমাদের সমসাময়িক।"

স্বদেশী আন্দোলনের নানা ঘটনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মন ক্রমেই বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের মুখে যে

রাখীবন্ধন-অনুষ্ঠান একটি রাজনৈতিক ঘটনার অভিঘাতে সমাজে চালু হইয়াছিল, এখন রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত করিবার কথা ভাবিতেছেন। ১৩১০ অব্দে এক পত্রে লিখিতেছেন:

"এই অনুষ্ঠানকে বাংলাদেশের একটা সাময়িক ঘটনার সঙ্গে আবদ্ধ রাখলে চলবে না।

"এই ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে সমস্ত ভারতের মিলনের সুপ্রভাতরূপে পরিণত করতে হবে। তাহলেই এই দিনটি ভারতের বড়োদিন হবে। তাহলেই এই বড়োদিনে বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদের মিলন হবে।" কবির এই উক্তির মধ্যে ভাবী বিশ্বভারতীর ভাবনা। ইহার মধ্যে যেমন আছে ভারতভাবনা, তেমনই আছে বিশ্বভাবনা।

এতকাল ধর্মবিষয়ে আদি ব্রাহ্মসমাজীয় মতই শান্তিনিকেতনে প্রবল ছিল। কিন্তু যেদিন কবি স্বয়ং ব্রহ্মমন্দিরে বড়োদিনে যীশুখৃষ্টের কথা ব্যাখ্যা করিলেন, সেইদিনই শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে নব পর্যায় রচনার সূত্রপাত হইল। রাজা রামমোহন রায় একদিন 'প্রিসেপটস অব জীসাস' সংকলন করিয়া বিচিত্র ধর্মকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে রামমোহনের আদর্শে নানা ধর্মের গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য নির্দেশ প্রদত্ত হয় এবং এখন পর্যন্ত তাহা প্রতিপালিত হইতেছে।

এই বিচিত্রের সাধনা আরম্ভ হইলে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ভবিষ্যতে কী রূপ গ্রহণ করিবে, তাহার স্বপ্ন মনে মনে রচিত হইতেছে।

"একদিন এমন হইবে যে দেশবিদেশের সকল জ্ঞানের বিষয় এই যজ্ঞক্ষেত্রে আহৃত হইবে—যাহা বিরুদ্ধ তাহা মিলিবে, যাহা বিচিত্র তাহা ঐক্যলাভ করিবে।···সাহিত্য, চিত্র, সংগীত, শিক্ষা এইখানে বিকাশ পাইবে, এবং বিশ্বকলার নিগূঢ় তত্ত্ব এইখানে ব্যাখ্যাত হইবে। তত্ত্ববিদ্যায় যে সমন্বয় দৃষ্টিলাভের জন্য সকল জ্ঞানী এদেশে এবং বিদেশে ব্যস্ত—এইখানে সেই সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইবে—এইখানে ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ—সকল সংশয়ের ছেদন হইবে। এইখানে বিজ্ঞানবিদ্ বিজ্ঞানের সত্য সকল উদ্ধার করিবেন। উদ্ভাবনী শক্তি এইখানে নূতন নূতন জিনিস উদ্ভাবন করিবেন। সেই মানসলোকের পরিপূর্ণ জ্ঞান তপস্যার সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে আজ দেয়।"

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের দশ বৎসর পূর্ণ হইলে ১৯১০ সালে অজিতকুমার চক্রবর্তী যে গ্রন্থ লেখেন উপরের অংশটুকু সেই পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। ইহার ভাষা

অজিতকুমারের হইলেও, ইহার মধ্যে কবির স্বপ্নের স্বগতোক্তি আমরা শুনিতে পাই।

রবীন্দ্রনাথের মানসলোকের বিস্তারের সহিত তাঁহার বিশ্বভাবনা স্পষ্টতর হইতেছে। পঞ্চাশোর্ধে য়ুরোমেরিকা সফর (১৯১২-১৩) কালে সেসব দেশের শিক্ষাবিধি, শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা-আয়তন প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া শান্তিনিকেতনের দীন আয়োজনের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার কথা কবির মনে উদয় হইতেছে। কারণ তিনি দেখিতেছেন পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহ যে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা বিজ্ঞান-গবেষণার কার্যে মগ্ন থাকিয়া। তাই বিদেশ হইতে প্রেরিত এক পত্রে লিখিতেছেন:

"শান্তিনিকেতনে দুই-একজন যোগ্য লোক এক-একটি ল্যাবরেটরী নিয়ে যদি নিজের মনে পরীক্ষার কাজে প্রবৃত্ত হন। তাহলে ক্রমশ আপনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হবে।"

এই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে শান্তিনিকেতনে বিশ্ববিদ্যালয় রচনার প্রথম ইঙ্গিত (১৯১২)। কবি বলেন:

"জ্ঞানানুশীলনের একটা হাওয়া বইয়ে দেওয়া চাই—সেই হাওয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে করতে ছাত্রদের মন আপনিই অলক্ষিতভাবে বিকাশলাভ করবে।"

শিক্ষাতত্ত্বের মূলকথা হইতেছে জ্ঞানের পরিবেশ সৃষ্টি। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে সুপ্রসারিত করিবার জন্য বহুবার বলিয়াছিলেন, কত লোকের সামান্য কথায় বিশ্বাস করিয়া সেখানে বিজ্ঞানাগার স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

য়ুরোমেরিকা সফর হইতে ফিরিলেন; অল্পকাল পরেই পিয়ার্সন ও এনড্রুস শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবির কর্মে আত্মসমর্পণ করিবেন স্থির করিয়াছেন—ইঁহারা উভয়েই খ্রীষ্টান ও ইংরেজ। তাই (১৯১৩) সাতই পৌষের উৎসব-ভাষণে কবি বলিলেন:

"এ আশ্রম, এখানে কোনো দল নাই, কোনো সম্প্রদায় নাই…। এখানে আমরা নামের পুজো থেকে আপনাদের রক্ষা করে সকলেই আশ্রয় পাব—ঐ জন্যেই তো আশ্রম। যে-কোনো দেশ থেকে, যে-কোনো সমাজ থেকে যিনিই আসুন না কেন, ··আমরা সকলকেই এই মুক্তির ক্ষেত্রে

আহ্বান করব। দেশ দেশান্তর হতে দূর দূরান্তর থেকে যে-কোনো ধর্ম-বিশ্বাসকে অবলম্বন করে যিনিই এখানে আশ্রয় চাইবেন, আমরা যেন কাউকে গ্রহণ করতে কোনো সংস্কারের বাধা বোধ না করি। কোনো সম্প্রদায়ের লিপিবদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের মন যেন সংকুচিত না হয়।" তুলনীয় রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভার ট্রাস্ট ডীডের ভাবধারা।

প্রথম মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে (১৯১৬-১৭) রবীন্দ্রনাথ জাপান হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা সফরে যান। জাপানের উগ্র জাতীয়তাবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের রূপ দেখিয়া কবি খুবই মর্মাহত হন। শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের যাহা প্রায় জাতি-বৈরীর নামান্তর সেই বিষ মানুষের মনকে যেভাবে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে রবীন্দ্রনাথ সেই মনোবিকারের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন; তাহার নির্গলিত মর্মকথা হইতেছে জাতীয় শিক্ষাই শিক্ষার চরম আদর্শ নহে—বিশ্বমানবিক শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা। কিন্তু এই বিশ্বমানবিক ও সর্বজাতিক মনোভাব চর্চার জন্য কবির উদাত্ত ভাষণ দেশে-বিদেশে কবির যোগ্য বাক্যরূপেই বিবেচিত হইয়াছিল।

কবি এক পত্রে আমেরিকা হইতে (১৯১৬) লিখিতেছেন—"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতে যোগের সূত্র" করিয়া তুলিতে হইবে। "ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসবে, ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হবে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটি সমস্ত জাতিগত ভূগোল বৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে—সর্ব মানবের জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে। পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধ ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ।" (২২ অক্টোবর, ১৯১৬। শিকাগো)।

আসমানে ইমারত নির্মিত হয় না; তাই শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করিয়া কবি তাঁহার বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানকে নিখিল ভারতীয় রূপ দানে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ১৯১৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর 'বিশ্বভারতী'র ভিত্তি প্রোথিত হয়। সেইদিন কবি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনের বার্ষিক সভায় বলিলেন—"আমাদের দেশে এক সময়ে··বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল—নালন্দা, তক্ষশিলার বিদ্যায়তন···। দেশ বিদেশ থেকে সেখানে মানুষ এসেছে···সর্বমানবের, বিশ্বমানবের শক্তিকে ডাক দিয়েছে,···বড়ো বড়ো

জায়গা থেকে লোক এসে এইসব বিদ্যায়তনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। মানুষকে তফাৎ করলে চলবে না। আজকের দিনে ভারতবর্ষে যে-কেউ এসেছে তাদের সকলকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমাদের চারদিকে অতিথিরা এসেছেন, বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ উপকরণ আমাদের চারিদিকে; আমাদের পূর্বতন ভ্রাতা পারসিক—তাঁদের জেন্দ—সেও আমাদের; দূর থেকে মুসলমান যে-শাস্ত্র ও শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তাঁদেরও যা দেবার আছে, তা আমাদের নিতে হবে। আমাদের নিজের দেশের যা কিছু সাধনা তার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় সাধন করতে হবে, তারপর বাইরে হাত বাড়াব, মনের ভীরুতা থাকবে না।

"যখন আমাদের দেশের মহৎদের পায়ের কাছে বিদেশ থেকে শিষ্যেরা আসবে সেদিন পৃথিবীর কাছে আমাদের দাবী প্রমাণ হবে। নইলে শুধু ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা আমাদের মুক্তির কোনো আশা নেই।"

ইহাই বিশ্বভারতী সম্বন্ধে কবির প্রথম ভাষণ।

ইহার অল্পকাল পরে (১৯১৯) রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ ভারত সফরে যান—ইহাই তাহার প্রথম ভাষণ-অভিযান। বঙ্গলুর মহীশূর প্রভৃতি বহু শহরে বিশ্বভারতীর কথা তিনি বলেন। অতঃপর আদৈরে গিয়া ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটির চানসেলর রূপে ভাষণ দান করিলেন। এই ভাষণের মধ্যে ছিল The Centre of Indian Culture।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া এম্পায়ার থিয়েটরে ও বসুবিজ্ঞান মন্দিরে যথাক্রমে The Centre of Indian Culture ও Message of the Forest ভাষণ দিলেন; ইহাই হইল কলিকাতায় বিশ্বভারতী সম্বন্ধে কবির প্রথম ভাষণ (১৯১৯, মার্চ)।

এই ভাষণদ্বয়ের মর্মার্থ কবি স্বয়ং 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় লিখিয়া দেন (১৯১৯, এপ্রিল)। ইহাই বাংলায় কবি লিখিত বিশ্বভারতী সম্বন্ধে প্রথম রচনা।

"আমাদের দেশে শিক্ষার আদর্শ কী হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ আমি কলিকাতায় এবং অন্য অনেক শহরে পাঠ করিয়াছি। সংক্ষেপে তাহার মর্মটুকু এখানে বলি।

"মানব সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে।

"একথা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষ নিজেরই মানসশক্তি দিয়া বিশ্ব-সমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বুদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তি দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে।

"ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে, তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল—এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে।…অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-চেতনা সূত্রে বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক।…ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন, শিখ মুসলমান খৃষ্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে-মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না।…অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্ত-সম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।…

"দ্বিতীয় কথা এই যে, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে… মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে…। …বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল হইবে না।

"তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে।…আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহারা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা-স্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থানে অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গোপালন করিবে, কাপড় বুনিবে, এবং নিজের আর্থিক

সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

"এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।"

১৯১৯ সালের এপ্রিল-মে-জুন মাসে রৌলট্ বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে পঞ্জাবে যেসব অমানুষিক অত্যাচার সংঘটিত হয় রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রতিবাদে তাঁহার স্যর উপাধি বড়লাটকে প্রত্যার্পণ করিয়া যে পত্র লেখেন—সে কাহিনী রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস-অন্তর্গত বিষয়। কলিকাতার উত্তেজনা হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়া কবি যথারীতি বিদ্যালয়ের কাজে মনঃসংযোগ করিলেন। গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিল এবং কয়েকদিন পরে (৩ জুলাই, ১৯১৯) বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগ বা উচ্চ জ্ঞানচর্চার কার্য আরম্ভ হইল। কবি ভাবিতেছেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষক, আশ্রমবাসী আশ্রমবাসিনীদের লইয়া এই বিদ্যাচর্চার আয়োজন করিবেন। সেইভাবে পঠন-পাঠন আরম্ভ হইল।

১৯২০-২১ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন য়ুরোপ সফরে আছেন, সেই সময়ে ভারতে গান্ধীজি কর্তৃক প্রথম দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হয়। গান্ধীজি ছাত্রদের সরকারী বিদ্যায়তন বর্জন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। একদল ছাত্র সরকারী স্কুল, কলেজ বর্জন করিয়া শান্তিনিকেতনে আসেন ও 'বিশ্বভারতী' নামে উচ্চ জ্ঞানালোচনার যে 'উত্তর বিভাগ' উন্মুক্ত হইয়াছে, সেখানে প্রবেশ করিল। অ-বাঙালী বহু বয়স্ক ছাত্র আসায় পঠন-পাঠন ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রচলিত হইল। ইতিপূর্বে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অল্প বয়সে মালায়ালী, মারাঠী, নেপালী, গুজরাটী, সিন্ধী যেসব ছাত্র আসিয়াছিল, তাহারা স্বাভাবিকভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ভালোভাবেই আয়ত্ত করিয়া লইত। বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে তাহারা বালককালেই আশ্রমে আসিত। কিন্তু ১৯২০ সালে রাজনীতির উত্তেজনায় ও চাপে বয়স্ক ছাত্ররা আসিতে আরম্ভ করিলে বাংলার মাধ্যমে পঠন-পাঠনের প্রশ্ন অন্তর্হিত হইল।

য়ুরোমেরিকা সফরকালে অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গ শান্তিনিকেতনের শান্তময়কে বিরুদ্ধ করিয়া তোলে। বিদেশে থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ সকল সংবাদ পাইতেছেন ; মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। একপত্রে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার আশঙ্কা যে বিশ্বভারতীর উত্তর-বিভাগ বা বয়স্ক ছাত্রদের বিভাগকারে

আশ্রমের কনিষ্ঠা-ভগ্নী বা স্কুল বিভাগকে একদিন কোণঠাসা করিবে। আর অধিক ধনাগম হইলে বিশ্বভারতী তাহার নিজস্ব সত্তাও বিসর্জন দিবে এ আশঙ্কাও প্রকাশ করেন। কবি লেখেন তিনি যখন থাকিবেন না, তখন বিশ্বভারতীর নিয়ন্তা হইবেন সুনিপুণ হিসাবনবিশ, এবং সেদিন শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ আশ্রম হইতে নির্বাসিত হইবেন। এ কি কবির দৈববাণী!

রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালের মাঝামাঝি সময়ে য়ুরোমেরিকা সফরান্তে দেশে ফিরিলেন। অতঃপর শারদীয় অবকাশের পর অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি বিশ্বভারতীর প্রথম 'ভিজিটিং প্রফেসার' রূপে আসিলে বিশ্বভারতীর উচ্চতর জ্ঞানচর্চা নূতন ধারায় চলিল। অধ্যাপক লেভি সেখানে চীন ও তিব্বতী ভাষা চর্চা ও বৌদ্ধ মহাযান শাস্ত্রাদি আলোচনার সূত্রপাত করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হয় যে, বহু বৎসর পূর্বে তরুণ সংস্কৃত পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্যকে রবীন্দ্রনাথ পালিভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ দেন এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি বহু ব্যয়ে সরবরাহ করেন। বিধুশেখরের 'মিলিন্দপঞ্‌হো' পালি গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয় ১৯০৮ সালে।

ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস সম্যকরূপে আলোচনার জন্য সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত জানা যেমন আবশ্যিক, তেমনি গত দুইশত বৎসর পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ যেসব গবেষণা করিয়াছেন, সে-সব জানিবার জন্য ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ভাষা জ্ঞান অপরিহার্য। বিশ্বভারতীতে ইতিপূর্বেই জার্মান ও ফরাসী শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেদিন অনেকেরই আশা হইয়াছিল যে বিশ্বভারতীতে বিদেশী ভাষা শিক্ষার আয়োজন পূর্ণ রূপ লইবে।

জ্ঞানানুশীলন ও গবেষণা কার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের পক্ষে আবশ্যিক : কিন্তু জ্ঞানচর্চাই সমগ্র জীবন নহে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে সামুদায়িক জীবনের অন্তর্গত করিয়া দেখিতেন ; তাই তিনি 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় শিক্ষা কলা ও সংগীতকেও বিশ্বভারতী বিদ্যা-সমবায়ের অন্তর্গত করেন। এই দুইটির চর্চার আয়োজন যে বিশ্বভারতী পর্বেই আরম্ভ হয়, তাহা নহে ; ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্বে সংগীত ও চারুকলার যথাযথ আয়োজন ছিল। কালে বিশ্বভারতীর কলাভবন ও সংগীতভবন যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে।

কলাভবন ও সংগীতভবন ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে হিন্দীভবন, চীনাভবন, বিদ্যাভবন প্রভৃতি 'ভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এই সব ভবনের জন্য বাহির হইতে ধনাগম হইবার পূর্বেই এইসব চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল।

সে-ইতিহাস বলিতে গেলে প্রবন্ধ আরও দীর্ঘ হইয়া যাইবে বলিয়া নিবৃত্ত হইলাম।

বিশ্বভারতীর সকল কথা বলা হয় না, যদি বিশ্বভারতীর অগ্রগতি 'শ্রীনিকেতন'-এর কথা অনুক্ত থাকে। সাধারণ বিদ্যায়তন বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক আদর্শে গ্রামোদ্যোগের স্থান নাই। কিন্তু গ্রাম সেবা ও গ্রামিনদের সহিত সংযোগ রক্ষার পরিকল্পনা কবির শিক্ষাদর্শে নূতন নহে। তাঁহার যৌবন কাটে গ্রামের মধ্যে—গ্রামের দুঃখ দারিদ্র্য দুর্বলতা দেখিবার জানিবার সুযোগ জীবনে যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। কবি লক্ষ্য করিয়াছেন শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে নূতন 'জাতে'র ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছে। ধর্মভেদ, জাতিভেদ ও ধনভেদে মানুষ তো বিভক্ত ছিলই; তাহার উপর হইয়াছে শিক্ষাভেদে নূতন জাতিভেদ। ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্বে কবি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ভদ্রলোকের ছেলেদের কিছুটা 'ছোটলোক' ও ছোটলোকের ছেলেদের কিছুটা ভদ্রলোক করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিবেন। সেইজন্য গ্রামের মধ্যে সেবা, শিক্ষা প্রভৃতির জন্য ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়মিত যাওয়ার অভ্যাস এককালে দেখা গিয়াছিল।

বিশ্বভারতী পর্বে শ্রীনিকেতনে পল্লী সংস্কার কর্মে ব্রতী হইয়া দেখেন গ্রামের বালকদের মধ্যে শিক্ষা প্রবর্তন করিতে না পারিলে গ্রামোদ্যোগ সফল হইতে পারে না—গ্রামের বালকরাই হইবে ভাবীকালের নায়ক। সেই উদ্দেশে 'শিক্ষা সত্র' স্থাপন করেন—ভারতের বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা বিশ্বভারতীতেই হয় ১৯২৬ সালে।

পাশ্চাত্যদেশে স্কুল কলেজে যাহারা শিক্ষা লাভ করিয়াও জ্ঞানচর্চার দ্বারা জীবনের উন্নতি করিতে চাহে, তাহাদের জন্য নানারূপ ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে যাহারা স্কুলের শিক্ষা শেষ করিতে পারে নাই—অথচ জ্ঞানপিপাসু—তাহাদের জন্য কবি স্থাপন করিলেন লোকশিক্ষা সংসদ। বাংলা ভাষার মাধ্যমে স্তরে স্তরে বিবিধ বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য এই আয়োজন। এই লোকশিক্ষা সংসদ হইতে উত্তীর্ণ স্নাতকগণ বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে কন্দ্‌বর্তন পত্র বা সার্টিফিকেট পাইত। কিন্তু বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হইলে তাহা আর সম্ভব হইল না; কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম মধ্যে এই শিক্ষা সংসদকে খাপখাওয়ানো যায় না। পূর্বতন বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার যে

আভাস বিশ্বভারতী অ্যাক্‌ট প্রণয়ন কালে অস্পষ্টভাবে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা প্রয়োগের বাধা ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হইল এবং 'লোকশিক্ষা সংসদ'কে বিশ্বভারতীর পরিমণ্ডল হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হইল।

বাংলার মাধ্যমে লোকশিক্ষা প্রসার উদ্দেশ্যেই 'বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ' প্রকাশনের ব্যবস্থা হয়।

এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে আমি কেবল একটি বিষয়ের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম (১৯০৯-১৯২১) ও বিশ্বভারতী পর্বে (১৯২১-১৯৫২) এখানকার অধ্যাপকগণ জ্ঞানভাণ্ডারে যে সম্পদ দান করিয়াছেন তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি যে কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগের গৌরবময় কার্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে। সেই ধারা শুদ্ধ হয় নাই। অধ্যাপকদের এই সকল কার্যে রবীন্দ্রনাথ যে কী পরিমাণ উৎসাহ দিতেন তাহা আজ বিস্মৃত। কিন্তু এখনো দুই একজন আছেন যাঁহারা তাহার সাক্ষ্য দান করিতে পারেন।

বিশ্বভারতীর গত চব্বিশ বৎসরের এবং তাহারও পূর্বে আরও বিশ বৎসরের ইতিহাস অনুধাবন করিলে এমন সব ঘটনার সম্মুখীন হওয়া যায়, যাহা প্রীতিকর নহে। এমনকি অন্যায়ও যে হয় নাই তাহাও বলিতে পারি না। আমার প্রশ্ন—এইটি মানুষের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। কোন্ প্রতিষ্ঠান ভ্রমশূন্য? দেবতারাই কি ভ্রম-প্রমাদের উর্ধ্বে? স্বয়ং ভগবান কি সম্পূর্ণ (perfect)? তিনিও কি সৃষ্টির মধ্য দিয়া অসংখ্য ভুল ভ্রান্তি করিয়া অদ্ভুত প্রাণী সমূহ জগতে আনিয়া আবার অবলুপ্ত করেন নাই? আমাদের একমাত্র ভরসা যে আমরা স্থাণু নহি—ইহার মধ্যে ডাইনামিজম্ বা চলিষ্ণুতা আছে বলিয়া আমাদের ভরসা। রবীন্দ্রনাথ সেই চলিষ্ণু জীবনের আদর্শ আমাদের কাছে দিয়া গিয়াছেন: চরৈবেতি, চরৈবেতি।

পরিশিষ্ট

ব্রহ্মসভার ট্রাস্ট ডীড : ১৮৩০

১৮৩০ সালের ৮ জানুয়ারি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্ট ডীড নিষ্পন্ন হয়। নিম্নে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

The trustees "shall at all times permit the said building [at 55 Upper Chitpore Road] land, tenements, hereditaments and premises with their appurtances, to be used, occupied, enjoyed, applied and appropriated, as and for a place of public meeting, of all sorts of description of people, without distinction, as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober, religious and devout manner; "For the worship and adoration of the Eternal Unsearchable, and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe but not under, or by any other name, designation, or title peculiarly used for, and applied to, any particular Being, or Beings, by any man, or set of men, whatsoever; "And that no graven image, statue or sculpture, carving, painting, picture portrait or the likeness of anything, shall be admitted within the messuage, building, land, tenements, hereditaments and premises; and that no sacrifice, offering, or oblation of any kind or thing, shall ever be permitted therein; and that no animal or living creature shall, within or on the said messuage, building, land, tenements hereditaments and premises, be deprived of life, either for religious purposes or food; And that no eating and drinking (except as shall necessary, by any accident, for the preservation of life), feasting or rioting be permitted therein or thereon; And that, in conducting the said worship or adoration, no object, animate or inanimate, that has been, or is or shall hereafter become, or be recognized, as an object of worship, by any man or set of men shall be reviled, or slightly or contemptuously spoken of or alluded to either in preaching, praying, or in the hymns, or other mode of worship that may be delivered or used in the said messuage or building;

And that no sermon, preaching, discourse, prayer or hymn be delivered, made or used in such worship *but* such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the Universe, or to the Promotion of charity, morality, piety, benevolence, virtue, and the strengthening the bonds of union between men of all religions persuation and creeds;

"And also, that a person of good repute, and well-known for his knowledge, piety, and morality, be employed by the said trustees···as a resident superintendent, and for the purpose of superintending the worship so to be performed as is hereinbefore stated and expressed; and that such worship be performed daily, or at least as often as once in seven days...."

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর মেঃ অব অ্যাসোসিয়েশন : ১৯২১

বিশ্বভারতীর যে সংবিধান রচিত হইল, তাহার আদর্শ কবি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল (Memorandum of Association) :—

"To study the Mind of Man in its realisation of different aspects of truth from diverse points of view.

"To bring into more intimate relation with one another, through patient study and research, the different cultures of the East on the basis of their underlying unity.

"To approach the West from the standpoint of such a unity of the life and thought of Asia.

"To seek to realize in a common fellowship of study the meeting of the East and the West, and thus ultimately to strengthen the fundamental conditions of world-peace through the establishment of free communication of ideas between two hemispheres.

"And with such ideals in view to provide at Santiniketan aforesaid a centre of culture where research into and study of the religion, literature, history, science and art of Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian and other civilizations may be pursued along with the culture of the West, with that simplicity in externals which is necessary for true

spiritual realization, in amity, good-fellowship and co-operation between the thinkers and scholars of both Eastern and Western countries, free from all antagonisms of race, nationality, creed or caste, and in the name of the One Supreme Being, who is Shantam, Shivam, Adwaitam.

…"The close and friendly relations between the Visvabharati and the…Santiniketan Asrama, in conformity with the spirit of the said trust, being so far as possible maintained for even and provided always that nothing shall be done or permitted to be done within the precincts of Santiniketan, which may reasonably cause pain to any person belonging to any religious sect whatsoever.

"The membership of the Visvabharati and of its Constituent Bodies shall be open to all persons irrespective of sex, nationality, race, creed, caste or class; and no test or condition shall be imposed as to religious belief or profession in admitting members, students, teachers, workers, or in any other connection whatsoever."

রবীন্দ্রনাথের শিল্পজিজ্ঞাসা

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

পৃথিবীর ইতিহাসে যখন কোনও জীবজন্তু ছিল না, যখন পর্যন্ত বিনাশের বিস্তার অব্যাহত ছিল, সেই সময় একদিন গাছ বেরিয়ে এল অন্ধ ভূমিগর্ভ থেকে, আকাশে মাথা তুলে সূর্যের পানে জোড় হাতে কেঁদে প্রার্থনা জানাল, আমি থাকব, আমাকে থাকতে দাও। মঞ্জুর হল প্রার্থনা। এমনই করে প্রাণের সেই অভিব্যক্তির ইতিহাস তো নির্বস্তুক জ্ঞানের কথা। কিন্তু এই কথাটিকে আমাদের প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, আমাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে এনে দিয়েছেন, আমাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত করেছেন। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে চোখ তুলে জানলা দিয়ে যখন বাইরে গাছের দিকে তাকাই তখন যে-প্রাণ আমার শিরায় শিরায় স্পন্দমান তাকে একান্তভাবে অনুভব করি গাছটার পাতায় পাতায় আলোর শিহরণে। রবীন্দ্রনাথের আগে কি আমরা এমন নিবিড় রূপ বুঝেছিলাম যে প্রাণের মেলা নিরন্তর চলেছে আমাদের নিয়ে, এই মেলা আছে, আমরাও আছি, এই মেলার মধ্যেই আমরা আছি। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে নয়, বরং ইন্দ্রিয়গুলিকে বাইরে পাঠিয়ে তাদের দিয়েই প্রাণের ইতিহাসকে আজ আমরা জানতে পারছি, সে-ইতিহাসে নিজেদের যুক্ত করছি। আমরা যে কেউ একা নই, মিথ্যা নই অথবা নই সৃষ্টিছাড়া, আমরা যে পরস্পরের থেকে সম্পর্কশূন্য নই, পরবাসে আমরা যে কেউ নির্বাসিত হয়ে নেই, প্রাণের অভিজ্ঞানে আমরা সবাই যে সবার আপনার ও অন্তরঙ্গ, এই সত্যটাকেই রবীন্দ্রনাথ ...কচিত্তে প্রতিষ্ঠা করেছেন। হাতের আঙুল ও পায়ের আঙুল যেমন একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, উপরন্তু একই শক্তির প্রকাশ ও প্রসার, তেমনই চরাচরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাবৎ বস্তুই কোনও এক অমোঘ শক্তির ব্যাপ্ত ও ...রূপ। কিন্তু যা ছিল অথবা যা হতে পারত নিছক নিবস্তুক জ্ঞান তা রবীন্দ্রনাথের সৌজন্যেই প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান হয়ে ওঠেনি!

জ্ঞানের দিক দিয়ে আজ যাকে প্রাণ বলছি অতীতের কোনও এক

সীমানার ওপারে তার অস্তিত্বমাত্র ছিল না। জড় থেকে ক্রমে প্রাণ উদ্‌ভূত হল। কে জানে সব জড় বস্তুর মধ্যেই প্রাণ প্রচ্ছন্ন রয়েছে কিনা। হয়তো ভবিষ্যতের কোনও এক সময়ে জ্ঞানের দ্বারাই আমরা জানতে পারব যে সমস্তই প্রাণে স্পন্দিত হচ্ছে: সর্বং প্রাণ এজতি। কিন্তু জ্ঞানের পক্ষে যেটা অনুমান, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানীর কাছে সেটা অনুভব। তথ্য নয় শুধু, তা নিতান্ত সত্য। তাঁর সত্যের প্রদীপখানি দিয়ে তিনি আমাদের সবার প্রদীপে আলো জালিয়ে দিয়েছেন। সেই আলোতে আমরা প্রাণী ও অপ্রাণী সব কিছুর মধ্যে নিজেদের চিনে নিতে পারছি। তাতে সবার সঙ্গে সবার ও সব কিছুর যোগ স্থাপিত হচ্ছে। "আমাদের অন্তঃকরণের যত-কিছু বৃত্তি আছে সে কেবল সকলের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই, সত্যকে পাই। নহিলে আমি আছি বা কিছু আছে, ইহার অর্থই থাকে না। জগতের সঙ্গে আমাদের এই-যে যোগ ইহা তিন প্রকারের। বুদ্ধির যোগ, প্রয়োজনের যোগ, আর আনন্দের যোগ।…এই আনন্দের যোগ ব্যাপারখানা কী? না, পরকে আপনার করিয়া জানা, আপনাকে পরের করিয়া জানা।" ('বিশ্বসাহিত্য' : সাহিত্য) সবার ও সব-কিছুর মধ্যেই যে আমি আছি, এই সত্যটাকে বোধ করার নামই যোগ। এক কথায় একে বলতে পারি আত্মপ্রসারণ।

"The *I am* in me realizes its own extension; its own infinity whenever it truly realizes something else. Unfortunately, owing to our limitations and a thousand and one preoccupations, great part of our world, though closely surrounding us, is far away from the lamp-post of our attention: it is dim, it passes by us, a caravan of shadows." (*The Religion of an Artist*). সাধারণ মানুষ অধিকাংশ সময়েই তার পৃথিবীকে সংকীর্ণ করে রাখে দেহরক্ষা ও স্বার্থের গণ্ডিতে। যেমন অধিকাংশ স্ত্রী বাইরের পৃথিবীকে ভুলে থাকে শুধু নিজের সংসারের প্রতি প্রাত্যহিক কর্তব্যের পৌনঃপুনিকতায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে। প্রকৃতপক্ষে বিস্মৃতি হল বিশাল পৃথিবীকে বাইরে রাখা। কিন্তু এমন এক-একজন লোকের কথা আমরা জানি যাঁরা কোন এক দুরন্ত শক্তির তাড়নাতে হয়

একাকার করে ফেলেন। জীবনে হয়তো স্বস্তি তাঁরা পান না, কিন্তু তাঁরা যেমন মনে রেখেছিলেন পৃথিবীকে তেমনই পৃথিবীও তাঁদের মনে রাখে। আমরা যখন পৃথিবীকে ভুলে থাকি তখন স্বস্তি আমাদেরও থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেন সেই দুরন্ত শক্তি। শুধু দুরন্ত নন, আমার মনে হয়, সে শক্তি বিশেষ অর্থে বর্বরও। নিষ্ঠুর হাতে তিনি ছিনিয়ে নেন স্বস্তির পেয়ালা, কঠিন আঘাতে চুরমার করে দেন আমাদের চারপাশের বিস্মৃতির দেওয়াল। তখন বজ্রের আলোতে আমরা সেই সত্যের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াই যার আকাশভরা সূর্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ, বিপুলা নদীরূপে যার অদৃশ্য নিঃশব্দ জল নিরবধি চলে।

যাকে বলেছি সত্যের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ানো তাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভূমার সঙ্গে যুক্ত হওয়া। ভূমা বলে তিনি প্রকারান্তরে বলেননি ঘুমা। বরং বলেছেন, ঘুমিয়ো না, ওঠো, জাগো, কোন্ বিপুলের মধ্যে তুমি রয়েছ সে-সম্বন্ধে সচেতন হও। বিপুলের মধ্যে নিজেকে জানার অর্থ হল নিজেকে বিপুলের অঙ্গ তথা নিজেকেই বিপুল রূপে জানা। "চারিদিকের রসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড় থাকে না তখন সেই অস্পষ্টতা দুঃখকর। তখন আত্মোপলব্ধি ম্লান। আমি যে আমি, এইটে খুব করে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ।" ('সাহিত্যের পথে'-র উৎসর্গপত্র) সেজন্যে প্রত্যেক মানুষই যে বিপুল তা প্রত্যেকে বুঝুক, প্রত্যেকে জানুক। দৈনন্দিনকার জীবনযাত্রায়, একই কর্মধারার অবিরাম পুনরাবৃত্তিজনিত স্বাচ্ছন্দ্যে সেই আত্মপরিচয় ভুলে থেকে থেকে অনীহা ও জাড্যের যে-খোলসটা জমে ওঠে তা ফেটে যাক। খোলসটাই তো পৃথিবীর আর-সব-কিছুর থেকে মানুষকে পৃথক করে রাখে। যখন সে-পার্থক্য ঘুচে যায় তখনই মিলন ঘটে চরাচরের সঙ্গে। সেই মিলনের নামই আনন্দ। দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা তা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেয় যে জীবনের অর্থ শীতল অভ্যাসে বেঁচে থাকা নয়। ট্রাজেডির যে-দুঃখ তা আমাদের সেই বিপুলের সঙ্গে নিবিড় রূপেই যোগ করে। "মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল ও বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়।" ('সাহিত্যের পথে'-র উৎসর্গপত্র) স্বভাব বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন বিস্মৃতির শৃঙ্খল থেকে মুক্তির কামনা, প্রকৃতপক্ষে তা মিলনেরই আকাঙ্ক্ষা।

আবার মিলনের আকাঙ্ক্ষা হল অনন্তের মধ্যে অমরতার মধ্যে মুক্তির কামনা। আদিবৃক্ষের প্রার্থনা সবাই বয়ে চলেছি: আমি থাকব, আমাকে থাকতে দাও।

শিল্পই যেমন যে-খোলসের জন্যে আমরা পরস্পরের থেকে পরিচ্ছিন্ন হয়ে থাকি সেটাকে ফাটিয়ে দিতে পারে তেমনই আমাদের সেই প্রার্থনার পূরণ হওয়া সম্ভব শুধু শিল্পের মধ্যে। একই সঙ্গে এই বিস্ফোরণ ও সংরক্ষণ শক্তিতে শিল্পের সার্থকতা। সেজন্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন যে "সাহিত্যের বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিস দেখিতে হয়। প্রথম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি। দ্বিতীয় তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা।" ('সাহিত্যের তাৎপর্য' : সাহিত্য) প্রথম বিচারে প্রকাশ পাবে সাহিত্য তথা শিল্প বিবিক্ত ও বিশেষকে ভেঙে কতখানি বিশ্বজন ও সর্বজনীন এবং দ্বিতীয় বিচারে প্রকাশ পাবে তা বস্তু ও ব্যক্তিকে কতটা অবিনাশী ও কালজয়ী করতে পেরেছে। অর্থাৎ দেশে ও কালে শিল্পের অবদান যতখানি শিল্পের যাথার্থ্য ও ততখানি।

এই যেমন গেল ভোক্তার মনের দিকের কথা তথা তাঁর মনে কোন্ ধরনের প্রতিক্রিয়া জাগানোতে শিল্পের মূল্য তার কথা তেমনই স্রষ্টার মনের দিকের কথাও রয়েছে। তিনি কেমনতর মনের অধিকারী যা শিল্প সৃষ্টি করে, সেই সেতু তৈরি করে দেয় যা পারাপার করে সবাই বৃহতের অঙ্গীভূত হয়?

রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলেছেন, "আমরা যদি এইটে বুঝি যে, সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তবে সাহিত্যের মধ্যে আমাদের যাহা দরকার তাহা দেখিতে পাইব। যেখানে সাহিত্যরচনায় লেখক উপলক্ষ্যমাত্র না হইয়াছে সেখানে তাহার লেখা নষ্ট হইয়া গেছে। যেখানে লেখক নিজের ভাবনায় সমগ্র মানুষের ভাব অনুভব করিয়াছে, নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, সেইখানেই তাহার লেখা সাহিত্যে জায়গা পাইয়াছে।" ('বিশ্বসাহিত্য' : সাহিত্য) সুতরাং শিল্পী মাত্রেই বিশ্বমানব-মনের অধিকারী। তাঁর মন সমগ্র মানুষের মনকে আত্মসাৎ করে আবার সেই মনকেই প্রকাশ করে। শিল্পী যেন আমাদের সকলের মুখপাত্র। আমরা যা অস্পষ্টভাবে অনুভব করি, যা আমাদের মনে ক্ষণিকের জন্যে ভেসে উঠেই মিলিয়ে যায়, যা আমাদের কাছে ব্যক্ত হবার জন্যে দাবি জানিয়ে বিফল হয়ে ফিরে যায় তাকে শিল্পীই স্পষ্ট করে তোলেন, স্থায়ী

রূপের মধ্যে ধরে দেন, তার ব্যক্ত হবার দাবি মিটিয়ে দেন। তখন শিল্পীর মনে আমরা নিজেদের মনকেই আবিষ্কার করি।

শিল্পের সার্থকতা যেমন পরস্পরের মধ্যে যোগসাধনে তেমনই শিল্পের শুরুতেও রয়েছে যোগানুভূতি। ওই যোগ আমরাও অনুভব করি, কিন্তু তা আমাদের মধ্যে নিতান্তই ক্ষীণ। পক্ষান্তরে শিল্পীর মনে যোগানুভবটা অত্যন্ত তীব্র। এতই তীব্র যে সামান্য একটি সূত্র পেলেই তাকে অবলম্বন করে শিল্পীর মন কল্পনায় ও সৃজনে তৎপর হয়ে ওঠে। বাইরের থেকে একটুখানি ইশারা পেলেই সে-মন তাতে সাড়া না দিয়ে পারে না, সেই ইশারার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন অনুষঙ্গকেও তা টেনে আনে নিজের কাছে। তখন কেকাধ্বনি শুধু একটা তীক্ষ্ণ শব্দ নয়, তার সঙ্গে এসে হাজির হয় "সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর—বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।" ('কেকাধ্বনি' : বিচিত্র প্রবন্ধ)

যেন অন্ধকার বন্ধ ঘরে আলোর আভাস দেখা গেল কোনও ফাঁক দিয়ে, অমনই সেই ফাঁক দিয়ে গলে শিল্পী বেরিয়ে এলেন বাইরে। বেরিয়ে আসাটাই আনন্দের জন্মলগ্ন। কিন্তু একা বেরিয়ে এসে কোন্ সুখ, যদি না অন্যান্য বন্দীদেরও সেই আনন্দের ভাগ দেওয়া যায়, যদি না তাদেরও মুক্ত করা যায়! তাই শিল্পী ফিরে যান সেই ফাঁকটাতে, ঘরের ভিতরে আরও যেসব বন্দী আছে তাদেরকে শোনান বাইরে আসার আনন্দের বার্তা। মুক্তির অনুভূতিকে সঞ্চারিত করেন বন্দী মানুষগুলোর মনে। তাদের প্রলুব্ধ করেন, উদ্বুদ্ধ করেন, সাহায্য করেন বেরিয়ে আসার জন্যে। সেটাই তাঁর প্রকাশ। এবং "প্রকাশই কবিত্ব, মনের তলার মধ্যে কী আছে বা না আছে তাহা আলোচনা করিয়া বাহিরের লোকের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।" ('সাহিত্যের সামগ্রী' : সাহিত্য) যেসব মুক্তপুরুষ আপন অনুভূতিকে অন্যের মধ্যে সংক্রমিত করতে পারেন না তাঁদের সাধু-সন্ন্যাসী বা যা হোক একটা কিছু আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু শিল্পী আখ্যা দেওয়া নৈব নৈব চ। অনুভূতি যত অনির্বচনীয়ই হোক-না কেন তা যদি ব্যক্তি বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে অথবা তা যদি ব্যক্তি বিশেষেরই বহনীয় হয় তবে তা কোনক্রমেই শিল্প নয়। তলিয়ে ভাবলেই মানতে হবে যে শিল্পীর মতো বন্দীদশাও কারও নেই। তিনি মুক্ত হয়েও ফিরে আসেন বন্দীশালার সেই ফাঁকে, যতক্ষণ না সব বন্দীকে তিনি মুক্ত করছেন ততক্ষণ তিনিও এক

অদৃশ্য নৈতিক দায়িত্বে বন্দী। সবার মুক্তিতেই যে তাঁর মুক্তি। যখন সবাই তাঁর আনন্দে সমান ভাগ নেবে শুধু তখনই তাঁর আনন্দ পূর্ণ। সহানুভূতিতে তো নয়ই, এমনকি শ্রদ্ধানুভূতিতেও শিল্পীর তৃপ্তি হয় না, তাঁর তৃপ্তি সমানুভূতিতে। ভক্ত তিনি চান না, তিনি চান ভোক্তাকে, সেই মানুষকে যে তাঁর সঙ্গে একাসনে বসে তাঁর অনুভূতিকে ভোগ করবে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় এ বিশ্বের একজন স্রষ্টা আছে। সে-স্রষ্টাও শিল্পী। বিশ্বশিল্পীর স্বরূপও এই ভাবেই অনুধাবন করেছেন বলে তিনি সেই স্রষ্টার উদ্দেশে বলেছেন, "তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নীচে। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।" যেমন বিশ্বশিল্পীর স্বরূপ তেমনই সব শিল্পীরই।

কিন্তু যে-মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশেরই মতো নীরব হয়ে থাকে সে কেমন করে অপরকে তার অনুভূতির ভাগ দেবে! সেজন্যে প্রকাশই কবিত্ব। তাহলেই প্রশ্ন ওঠে প্রকাশ কাকে বলে?

এক কথায় এর উত্তর হল রূপান্তর। যিনি শিল্পী তিনি সর্বত্র আপনাকে অনুভব করছেন। তাঁর মনে তিনি এমন একটা শক্তিকে অনুভব করছেন যা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, যা সর্বত্র সক্রিয়, তাঁর নিজের মধ্যেও। সে-শক্তি যখন কোনও বিশেষ একটি রূপ থেকে আপনাকে প্রত্যাহার করে তখনও তা নিঃশেষ হয়ে যায় না,- এমনকি বিলোপ পর্যন্ত ঘটে না, প্রকৃতপক্ষে তখন তা অন্য-এক রূপের মধ্যে অভিব্যক্তি খুঁজে নেয়। যেটা আপাতচোখে ক্ষয় সেটা শিল্পীর কাছে একই আধেয়র একটা আধার থেকে অন্য-এক আধারে আশ্রয় গ্রহণ। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো আশুচেতন পুরুষই লিখতে পারেন: "শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে।" ('পরিশিষ্ট': চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড) সমস্তর সঙ্গে একাত্মবোধেই প্রিয়জনের মৃত্যুকেও শিল্পীর শুধু একটি রূপান্তর মনে হয়। কিন্তু এখানে রূপান্তরটিকে শিল্পীর নিছক একটি মানসিক ক্রিয়া বলে ভাবা চলে না, কারণ বাস্তবেও শমীন্দ্রনাথ আর সেই শমীন্দ্রনাথ রূপে নেই। এবং প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে শমীন্দ্রনাথের রূপের পরিবর্তনই রবীন্দ্রনাথের মানসে শমীন্দ্রনাথের অনন্তরূপ প্রকাশিত করেছে। রূপান্তরটি যেমন বাস্তবে সত্য তেমনই মানসে। অবশ্য

এই রূপান্তরণ ব্যাপারটি সম্পন্ন হয় শুধু সৌভাগ্যবানদেরই হৃদয়ে। "বাহিরের বিশ্ব ইহাদের মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা রসে, নানা রঙে, নানা ছাঁচে নানা রকম করিয়া তৈরি হইয়া উঠিতেছে।" ('সাহিত্যের তাৎপর্য': সাহিত্য) এই যে বাইরের জিনিস নানা রকম করে সৌভাগ্যবানদের মনে তৈরি হয়ে ওঠে এটা শিল্পায়নের প্রথম কথা। প্রকৃতির অনুকৃতিকে শিল্প বলে না, শিল্প বলে সৃষ্টিকে, একটা জিনিসকে যেভাবে পাওয়া গেল সেটাকে হৃদয়ের উত্তাপে গালিয়ে অন্যভাবে প্রকাশ করাকে। বাইরে সেই অন্য-রূপে প্রকাশ যতক্ষণ না ঘটছে ততক্ষণ সেটা শিল্প হচ্ছে না বটে, তবু অন্য-রূপে প্রকাশের একটা প্রস্তুতি আছে। সেই প্রস্তুতিটা এক মানসিক ক্রিয়া। "মন প্রাকৃতিক জিনিসকে মানসিক করিয়া লয়।" ('সাহিত্যের বিচারক': সাহিত্য) প্রকৃতি এসে মানুষের মনের সঙ্গ কামনা করছে, মানুষের মনে ঠাঁই চাইছে, মন সেটাকে গ্রহণ করছে নিজের মতো করে। এইভাবে বাইরের পৃথিবী শিল্পীর মনে স্বীকৃতি সাধছে ও রূপ পালটে স্বীকৃতি পাচ্ছে এইটে গেল এক দিক।

কিন্তু আর একদিকে শিল্পীও সমগ্র মানবের সঙ্গে মিলিত হতে ইচ্ছে করছেন, সমগ্র মানবের মধ্যে প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করছেন। সমস্ত বিনাশ ও ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে শিল্পীর দুয়ারে প্রকৃতি এসে যেমন ধরনা দেয় তেমনই শিল্পীর আকাঙ্ক্ষা এই যে প্রকৃতির সহিত সঙ্গত হবার ফলে তাঁর অন্তরে আনন্দের যে ঝরনা ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে তা যেন কোনওদিন শুকিয়ে না যায়, তা যেন প্রতি মানুষের হৃদয়ে অফুরন্তভাবে বয়ে যায়, তা যেন কোনও কালে বিস্মৃতি ও বিলুপ্তি দ্বারা আক্রান্ত না হয়। কিন্তু রাধার গলার হারটিও মিলনকালে একটি বাধা। সেজন্যে আমাদের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনের জন্যে শিল্পীর পক্ষে তাঁর লৌকিক ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছদটি ত্যাগ করা চাই। সেটি ত্যাগ করলে থাকে শুধু তাঁর আনন্দময় ব্যক্তিত্ব, যা তিনি পেয়েছেন প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, বিপুলের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করে। লৌকিক ব্যক্তিত্বের নয়, শিল্পী শুধু তাঁর এই নগ্ন ও শুদ্ধ আনন্দময় ব্যক্তিত্বেরই অমরতা চান। সে-অমরতা সম্ভব কেবল তখন আমাদের মনেও যখন তিনি একই আনন্দময় ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতে পারেন। যে হৃদয়ানুভূতি রূপ নেয় আনন্দময় ব্যক্তিত্বের তা আমাদের মনেও আছে, শিল্পী সেটিকে বাইরে থেকে এনে আমাদের মনে ঢুকিয়ে দেন না। কিন্তু সে-অনুভূতি আমাদের

মনে ঘুমিয়ে আছে, শিল্পী সেটাকে শুধু জাগিয়ে দেন। তখন তা নিজে নিজেই সৃষ্টি করতে থাকে আনন্দময় ব্যক্তিত্বের। শিল্পীর বাকি কাজ হল উক্ত সৃষ্টিকর্মে জাগ্রত অনুভূতিকে সাহায্য করা। এইভাবে একটা বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শিল্পীর আনন্দ প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদের মনে।

এর মধ্যে আবার একটা শর্ত আছে। যে-কারণ উপস্থিত থাকার ফলে শিল্পীর চিত্তে আনন্দের জন্ম হয় সে-কারণটা আমাদের ক্ষেত্রেও উপস্থিত থাকা চাই, নতুবা আমাদের চিত্তে অমন আনন্দ জন্মাতে পারে না। সেই কারণটা কী? না, সেটার ভিত্তি এক বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা। যে-অভিজ্ঞতার বশে শিল্পীর লৌকিক ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছদ খুলে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে অলৌকিক ব্যক্তিত্ব সেটা আমাদের পক্ষেও আবশ্যিক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জনৈক ভৃত্যের কথা একবার কবিতায় ও দুবার দুটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। একদিন ভৃত্যটি খুব বেলা করে কাজে এলে রবীন্দ্রনাথ তাকে ধমকে দিলেন। আগের দিন রাত্রে তার মেয়ে মারা গেছে, এই তথ্যটুকু জানিয়েই ভৃত্যটি রোজকার কাজে লেগে গেল। ভৃত্যটি তো ভৃত্যই থেকে গেল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর মনিব থাকলেন না। লৌকিক ব্যক্তিত্ব ভেদ করে তাঁর অলৌকিক ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে এল। তিনি হয়ে গেলেন সব মেয়ে-মরা বাপেদের অন্তর্বেদনার শরিক। শিল্পীর কাজ হল ঐ অভিজ্ঞতাটাকে পাঠকের মনে পৌঁছে দেওয়া।

কিন্তু না, এ-কথাটা ঠিক হল না যদি রবীন্দ্রনাথের ও-কবিতা পড়ে কোনও পাঠকের খেয়াল হয় যে তার নিজের ভৃত্যটি ইদানীং কাজে বড় ফাঁকি দিচ্ছে এবং অবিলম্বে এর বিহিত করা দরকার তাহলে বলতে হবে কবিতাটি ব্যর্থ। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গোলাপ ফুলের উল্লেখ করেছেন। "In the pulp of its petals you may find everything that went to make the rose, but the rose which is *maya*, an image, is lost." (*The Religion of an Artist*) সেই গোলাপ দেখে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ বড় জোর ভাবতে পারি যে গোলাপ নির্যাসের ব্যবসায় নামলে কতটা লাভ হতে পারে। কিন্তু শিল্পী বস্তুর সেই ব্যবহারিক মূল্যের ষোল আনাই বাতিল করে দেন, তাঁর কাছে ফুলটির মূল্য তার সৌন্দর্যে তার সুষমায়, তার রূপের সামঞ্জস্যে ও রঙের স্পন্দনে। যদি কেউ প্রশ্ন আপত্তি তুলে বলে যে ওটা নেহাতই বাড়তি তবে তাকে মনে করিয়ে দেওয়া

প্রয়োজন যে এটি আসলে ঐশ্বর্যের লক্ষণ। "যেখানে মানুষ দীন সেখানে তো প্রকাশ নেই, সেখানে সে যা আনে তাই খায়। যাকে নিজেই সম্পূর্ণ শোষণ করে নিয়ে নিঃশেষ না করতে পারি, তাই দিয়েই তো প্রকাশ।" ('সাহিত্য' : সাহিত্যের পথে) অবশ্য বাড়তি জিনিসটা আমাদের চোখে পড়ে না। সেটার দিকে শিল্পীই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, সে-সম্বন্ধে সচেতন করে তোলেন। "পূর্বে যাহা চোখে পড়িত না বলিয়া আমাদের কাছে অসত্য ছিল কবি তাহাকে আমাদের দৃষ্টির সামনে আনিয়া আমাদের সত্যের রাজ্যের, আনন্দের রাজ্যের সীমানা বাড়াইয়া দিতেছেন।" ('সৌন্দর্যবোধ' : সাহিত্য)

এজন্যেই শিল্পীর কাজ তাঁর অভিজ্ঞতাকে আমাদের মনে পৌঁছে দেওয়া বলাও চলে না। বলতে হয় যে বাইরের পৃথিবীকে যে-রূপে দেখবার ফলে শিল্পীর মনে এক বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্ম নিচ্ছে সেই রূপটাকেই আমাদের সামনে স্থাপন করা তাঁর কাজ। ধরা যাক খেয়ার 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ' কবিতা দুটির কথা। রাজার দুলাল যখন সামনে পথ দিয়ে যাবে তখন মেয়েটিকে কেন সাজতে হবে কিংবা রাজার দুলাল সামনের পথ দিয়ে যাবার সময় মেয়েটি কেন তার গলার মণি-হার ছিঁড়ে রথের তলায় ফেলে দিল তার বুদ্ধিগম্য কারণ কোথাও বলা হয়নি এবং তার ফলে মেয়েটির মনে কী ভাব জাগল বা কী অভিজ্ঞতা হল তা-ও কোথাও বলা হয়নি। শুধু ঘটনাটা বিবৃত করা হয়েছে মেয়েটির পক্ষ হতে। তার অমন আচরণের কারণ ও তার ফলে যে-ভাব জাগল সেটা বুঝে নেবার দায়িত্ব পাঠকের, অর্থাৎ সেটা বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব কবির নয়। অথবা ধরা যাক পুনশ্চ-র 'শেষ চিঠি' কবিতাটি। স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামী বিবাগী হয়ে গেল মা-মরা মেয়েকে মাসীর কাছে রেখে। চার মাস পরে মেয়ের অসুখের খবর পেয়ে বাপ ফিরল ঘরে, কিন্তু মেয়েকে আর দেখতে পেল না। কেবল পেল মেয়ের লেখা একটি আখোলা চিঠি। "তাতে লেখা—'তোমাকে দেখতে বড্ড ইচ্ছে করছে।' আর কিছুই নেই।" কবিতাও শেষ। চিঠিখানি পড়ে বাপের মনের অবস্থা কী হল তা বলা হল না, কারণ সেই রকম অবস্থাটা পাঠকেরও হোক এটাই কবির অভিপ্রেত।

অতএব এবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বলা যায় যে শিল্পীর মনে যে-অনির্বচনীয়-অনুভূতি জাগে সেটা নয়, তাঁর মনে যে-অলৌকিক অভিজ্ঞতা জন্মায় সেটাও

নয়, তাঁর মনে অমন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা যে-উপলক্ষে জাগে ও জন্মায় সেই উপলক্ষটাই যখন শিল্পীর হাত দিয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় এবং পরিণামে শিল্পীর অনুরূপ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিও আমাদের মনে জন্মায় ও জাগে তখনই তাকে প্রকাশ বলি। কথাটা আবার ঘুরিয়ে বলা চলে প্রকাশের বেলায় প্রকাশকই উপলক্ষ এবং যেটাকে আপাতচোখে উপলক্ষ-বলে মনে হয় সেটাই লক্ষ্য। তাই "যেখানে সাহিত্যরচনায় লেখক উপলক্ষমাত্র না হইয়াছে সেখানে তাহার লেখা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" ('বিশ্বসাহিত্য': সাহিত্য) যখন একটা জিনিসকে কেন্দ্র করে শিল্পী ও অ-শিল্পী একই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি লাভ করি তখনই আমরা এক হয়ে যাই। "বস্তুত আমাদের কথা শ্রোতা ও বক্তা দুইজনের যোগেই তৈরি হইয়া উঠে।" ('সাহিত্যসৃষ্টি' : সাহিত্য) এটাই শিল্প-সাহিত্যের সাধনা। "এই সাধনায় মানুষের চিত্ত আপনাকে বাহিরে রূপ দিয়া সেই রূপের ভিতর হইতে পুনশ্চ আপনাকেই ফিরিয়া দেখিতেছে।" ('রূপ ও অরূপ' : সঞ্চয়) কথাটাকে আর একটু স্পষ্ট করে বলা যায়, "সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।" ('সাহিত্যের সামগ্রী' : সাহিত্য)

প্রকাশের মধ্যে একটি কথা প্রচ্ছন্ন আছে, যা আপাতচোখে তুচ্ছ হলেও গুরুত্বে অসামান্য। সে কথাটি হল প্রকাশিতব্য বস্তুর বিশেষত্ব। যতক্ষণ সেটি বিশেষভাবে শিল্পীর নিজের জিনিস না হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু তা সত্যিই উপলক্ষ ছাড়া কিছু নয়। অর্থাৎ ততক্ষণ তা নেহাতই সম্ভাব্য শিল্পের উপাদান হয়েই থাকে। শিল্পী যেমন তাঁর লৌকিক ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করেন না তেমনই বস্তুর হুবহু আদিরূপ প্রকাশ করতেও তাঁর বয়ে গেছে। কারণ বস্তুর আদিরূপে শিল্পী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে একটি স্বতন্ত্র জিনিস রচনা করেন, এবং অতঃপর সেই রচনাকে অর্থাৎ সেই বিশেষ রূপকেই তিনি গ্রহণ করেন। আসলে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও বস্তুর যথাস্থিত রূপের মধ্যে একটা অবকাশ আছে। সে-অবকাশটাই শিল্পীর সৃজনের ক্ষেত্র। সেখানে আদি-রূপ ত্যাগ করে বস্তু অন্য-এক রূপ ধারণ করে, যাকে বলা যায় অনন্য রূপ। অনেক সময়ই বস্তুর এই রূপান্তর এমন ঝটিতি এবং শিল্পীর অজান্তে হয় যে তার প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করাই যায় না।* তখনই সেটা শুধু বোঝা যায়

* শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য Studies in Philosophy গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এই প্রক্রিয়াটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন।

যখন শিল্পীর চেতনায় তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, যখন সেটা অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে ও অভিজ্ঞতা পরিণত হয় অনুভূতিতে। বস্তুকে যে-অনন্যরূপে শিল্পী ধারণ করেন সেই অনন্য রূপটিকেই তিনি আমাদের হস্তান্তর করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে দেন না। ব্যক্তিত্বের ওই বর্জনটাই তো সৃজনের আসল যাদু। বস্তুর ওই বিশেষ রূপটি তাঁরই ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি অথচ দেবার বেলায় শুধু সৃষ্টিটুকু দিয়ে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি নিয়ে কোন্ অন্ধকারে মিশে গেলেন। "Self-forgetting, and in a higher degree, self-sacrifice is our acknowledgement of this our experience of the infinite." (*The Religion of an Artist*)। শিল্পী যদি আপন আনন্দানুভূতিকেই হস্তান্তর করতেন তবে আমরা পেতাম একটা পড়ে-পাওয়া তৈরি ভাব। তাহলে আমরা আর কী সৃষ্টি করতাম! আমাদের জন্যে সৃষ্টির অবকাশ থাকত কোথায়? "আমাদের এই মায়াবী মনটিকে সৃজনের অবকাশ না দিলে, সে কোনো মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না।" ('কেকাধ্বনি' : বিচিত্র প্রবন্ধ) সুতরাং আমাদের পক্ষে শিল্পীর অনুরূপ অভিজ্ঞতা হওয়া ও অনুভূতি জাগাটাই শিল্পের ফলশ্রুতি। সেটাই সৃষ্টি। সেখানে আমরা সবাই যুক্ত সবার সঙ্গে, সব কিছুর সঙ্গে।

তাহলে ঘুরে ঘুরে আবার সেখানেই আসা গেল যেখানে শুরু হয়েছিল এ-আলোচনা। অর্থাৎ শিল্পের তাৎপর্য কী, তার সার্থকতা কোথায়, শিল্পের সংসর্গে আমাদের ভিতরে কোন্ প্রতিক্রিয়া জাগে গোড়ার সেই প্রসঙ্গে। এ যেন একটা চক্র পরিক্রমা। শুরুও নেই, সারাও নেই। কিন্তু তবু যদি আমাদের সঙ্গে বস্তুর অভেদবোধ, বস্তুর সঙ্গে শিল্পীর অভেদবোধ, আমাদের সঙ্গে শিল্পীর অভেদবোধ, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ও ব্যক্তিতে বস্তুতে অভেদবোধের মূল খুঁজতে যাওয়া হয় তাহলে বলতে হয় কোনও একটি বস্তুর শিল্পীর ব্যক্তিত্বের গুণে অনন্যরূপ প্রাপ্তিই এই জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত করে। জ্ঞানের বিচারে বস্তুর প্রকৃত পরিচয় তার অণুপরমাণুর বিন্যাসে ও স্পন্দনে। কিন্তু শিল্পী বলেন :

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর—
সুন্দর হল সে।

রবীন্দ্রনাথের গান

দেবেশ রায়

শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে যে সার্থক প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন তাতে তাঁর প্রতিপাদ্য ছিল প্রধানত দুটি:

১। "···আজকালকার ধ্রুপদ চার-পাঁচ শ' বছর পূর্ব্বে সঙ্কীর্ণ, দেশী, লোকসঙ্গীতই ছিল।···হিন্দুস্থানী দরবারি সঙ্গীত এতোদিন যে বেঁচে আছে তার অন্যতম কারণ এই যে তার ক্রাইসিস-এর সময় লোকসঙ্গীতের রক্ত তার শিরার মধ্যে ইন্‌জেক্ট করা হয়েছিল।···রবিবাবুর গানের তৃতীয় স্তরে ভাটিয়াল-বাউলের আগমন লক্ষ্য করি। এই যুগের গানে দরবারি স্বর-পদ্ধতির সঙ্গে ভাটিয়াল বাউলের মিশ্রণ হয়েছে। ···মাটির সঙ্গে যোগ ঘটিয়ে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে পুনর্জীবনদান করা তাঁর কীর্তি।"

২। "কথা ও সুরের মিলনের কালে একটি নতুন রস উৎপন্ন হয়, সেটি কথারও নয়, সেটি সুরেরও নয়। কথা ও ভাবের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ এমন সুর হিশেবে শুদ্ধ না-হলেও যে অতুলনীয় সুর রচনা সম্ভব তার প্রমাণের অভাব নেই। আবার কবিতা হিশেবে-ও চমৎকার, সুর-ও শুদ্ধ, অথচ দুয়ে মিলে একটি অভিনব মধুর রচনা হলো না, তার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট। এই নতুন সৃষ্টি-কে সঙ্গীত বলাই ভালো।"

শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর প্রবন্ধগুলিতে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বারবার এই দুটি সিদ্ধান্তেই আসতে চেয়েছেন। পরবর্তীকালে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী "রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ত্রিবেণী-সংগম" পুস্তিকাটিতে, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ "রবীন্দ্র-সঙ্গীত" গ্রন্থে, শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা "রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা" নামক গ্রন্থে মূলত ঐ দুটি সিদ্ধান্তকেই নানাভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। বস্তুত ঐ দুটি বিষয়ের বিশদ পরীক্ষার ওপরই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আলোচনা নির্ভরশীল। এতদিনে আমরা এটুকু নিঃসঙ্কোচে মেনে নিতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুরে দেশী-বিদেশী লৌকিক মার্গে সকল সুরের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের গানের সবচেয়ে বড় রাবীন্দ্রিকতা কথা ও সুরের মিলন-সাধন।

তাই মনে হয় রবীন্দ্র-সঙ্গীত আলোচনার নতুন পর্যায় শুরু করবার সময় এসেছে। তাঁর গানগুলির আরো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। ক। তাঁর সুরে কিভাবে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, লোকসুর, কীর্তন, টপ্পা ইত্যাদির মিশ্রণ ঘটেছে। মিশ্রণের অনুপাত কি প্রকার। তাঁর সঙ্গীত-রচনার ইতিহাসে এই মিশ্রণ কখন কিভাবে এগিয়েছে বা পিছিয়েছে। খ। তাঁর কথা ও সুরের কিভাবে সমন্বয় হয়েছে? এই সমন্বয় সম্বন্ধে কি তিনি প্রথমাবধি সচেতন ছিলেন? তাঁর সঙ্গীত-রচনার ইতিহাসে এই সমন্বয় কিভাবে স্তরে স্তরে এগিয়েছে বা এগনো-পেছনোর মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট রূপলাভ করেছে।

বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় পরবর্তী জিজ্ঞাসা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার ইতিহাসের প্রথম বিশ বছরে এই সমন্বয়ের চেহারা ও চরিত্র কি রকম এবং তৎপরবর্তী পর্বের সমন্বয়-চেষ্টার সঙ্গে তার সম্বন্ধই বা কি?

রবীন্দ্রনাথের সকল গানই আমাকে অভিভূত করে। কিন্তু "ভালো লাগাই শেষ কথা নয়।" আমার চেষ্টা সেই বোঝার চেষ্টা। বুঝে গান শুনলে নিশ্চয়ই আনন্দের পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে। এই চেষ্টাকে যেন কেউ মূঢ়তার দুর্বিনয় বলে মনে না করেন।

প্রায় সকল সমালোচকই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার ইতিহাসকে মোটামুটি চার-ভাগে ভাগ করেছেন—১। —১৮৮৪; ২। ১৮৮৪—১৯০০; ৩। ১৯০০—১৯২০; ৪। ১৯২০—১৯৪১। অবশ্য সকলে এই সালগুলিকেই বেছে নেন নি, দু-এক বৎসর এদিক-ওদিক আছে; কিন্তু তাঁর গানের ইতিহাসকে চার অধ্যায়ে ভাগ করা বিষয়ে প্রত্যেকেই একমত। চারটি অধ্যায়ের সাধারণ-ধর্ম-নির্ণয়েও খুব বেশি মতবিরোধ নেই।

প্রথম দুই পর্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে সাধারণত বলা হয়ে থাকে "প্রথম যুগে কিংবা স্তরে তিনি ভালো-ভালো খান্‌দানী ঘরোয়া চীজের সুরকে আশ্রয় করে গান রচনা করেছেন" (ধূর্জটিপ্রসাদ)। "প্রথম অধ্যায় পরীক্ষা··· পিয়ানোয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সৃষ্ট গতের অনুযায়ী গান রচনায় তাহার প্রবৃত্তি···এখানে প্রস্তুতি সুরসৃষ্টির ততোটা নয়, যতোটা গানের সুরের অভিনয়-নির্ভরতায়" (সুকুমার সেন)।

প্রথম প্রশ্ন—এই সিদ্ধান্তের পেছনে উপযুক্ত তথ্য আছে কি না?

আমার মনে হয়েছে সময়গত একটা ব্যাপারকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

প্রথম পর্বটিকে গীতকার-যশঃ-প্রার্থী বালকের উদ্দেশ্যহীন চেষ্টা বলে ধরে নিয়ে কতকগুলি সাধারণ মন্তব্য দ্বারা এই পর্ব-বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। ১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মায়ার খেলা'—রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের শেষ গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়েছিল। এই গীতিনাট্যগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত রচনার প্রথম পর্ব ধরা হয়েছে। ধরা হয়েছে বটে কিন্তু তাদের স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করা হয় নি।

এর কারণও রবীন্দ্রনাথ। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখেছেন, "বাল্মীকি-প্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো এবং গুটি তিনেক গান বিলেতি সুর হইতে লওয়া।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথও লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্য এবং তাঁহার দ্বিতীয় রচনা 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যে উক্তরূপে রচিত সুরের অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল।" (এ-আলোচনায় 'কালমৃগয়া' ও 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মিলিত-সংস্করণকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে, 'কালমৃগয়া' সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা করি নি)।

যেন এই সকল কারণেই 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল বৈশিষ্ট্যের কোনো সন্ধান পাওয়া যাবে না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের উক্ত মন্তব্য দুটি ব্যতীত আর কোনো তথ্য নেই যাতে প্রমাণিত হয় 'বাল্মীকি-প্রতিভার' গানগুলির "অনেকগুলি বৈঠকি-গান ভাঙা" বা "অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো।"

১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা' বইটিতে রবীন্দ্রনাথ সূচীপত্র-সূচনায় জানিয়েছিলেন "১-চিহ্নিত গানগুলি আমার পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত। ২-চিহ্নিত গানের সুর হিন্দুস্থানী হইতে লওয়া। আমার স্ব-রচিত অথবা প্রচলিত সুরের গানে কোনো চিহ্ন দেওয়া হয় নাই"—এবং বইটিতে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র গানগুলিতে কোনো-প্রকার চিহ্নই দেওয়া হয় নি।

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী তাঁর 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গম' নামক পুস্তিকায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গান-ভাঙার যে-তালিকা করেছেন তাতে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র, ইংরেজী সুরের তিনটি গান ব্যতীত, আর কোনো গান নেন নি।

বস্তুত 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্য রচনার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত-বিষয়ে নিজস্ব কতকগুলি ধারণা পোষণ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে 'সরোজিনী' নাটক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "জ্বল, জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" গান-রচনায় যে-ইতিহাস দেয়া আছে তাতে বোঝা যায় সে-সময়ই রবীন্দ্রনাথ গান সম্বন্ধে স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট ও আত্মবিশ্বাসী হবার পথে পা বাড়াচ্ছেন। ১৮৭৮ সালে আহমদাবাদে বাসকালে রবীন্দ্রনাথ "নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়", "বলি ও আমার গোলাপ বালা" "শুন নলিনী খোলো গো আঁখি" "আঁধার শাখা উজল করি"—গান কটিতে স্বাধীনভাবে সুর দেন। ১৮৮১ সনে 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা (হর্বার্ট স্পেনসারের মত)' নামক একটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন। সুতরাং 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনার পিছনে সুদীর্ঘ ছয় বৎসরব্যাপী নীরব সাধনা, সঙ্গীত-সম্পর্কে চিন্তা ও মৌলিক সৃষ্টির আবেগ আছে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে বিদেশ থেকে ফিরে আসেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনীত হয়। এই এক বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি ব্রহ্ম-সংগীত রচনা করেছিলেন পারিবারিক অনুষ্ঠানের জন্য। তার অধিকাংশেরই সুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেওয়া। কিন্তু সেই গানগুলিতে সুর ও তথ্য এত প্রত্যক্ষত অ-মিলিত যে মাত্র একবৎসর পরে রচিত 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যের কথা-সুরের অসাধারণ সমন্বয় দেখে অবাক হতে হয়। মনে হয়, এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার দুটি ধারা ছিল—একটি ব্যক্তিগত চেষ্টার ধারা, আর একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান-সঙ্গীতের ধারা। দুটি ধারা দু-এক সময় মিলেছে এবং 'বাল্মীকি-প্রতিভা' তেমনি একটি সৃষ্টি।

এতক্ষণ বাহিরের সাক্ষ্যে যদি প্রমাণিত হয়ে থাকে যে, এই গীতি-নাট্যটিতে বহিঃপ্রভাবের কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই এবং এই গীতি-নাট্য রচনার পাঁচ বৎসর পূর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা ও চিন্তা করছিলেন—তবে এখন ভেতরের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়। মনে রাখা প্রয়োজন যে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনার দুই বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ 'কালমৃগয়া' নামক গীতি-নাট্যটি রচনা করেন। অধুনা 'বাল্মীকি-প্রতিভা'—'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' নাটকের সংশ্লিষ্ট রূপ। সুতরাং 'বাল্মীকি-প্রতিভা' সম্পর্কে বক্তব্য এই দুটি গীতি-নাট্য সম্পর্কেই সমভাবে প্রযোজ্য।

গীতি-নাট্যটির বিষয় হত্যা নিষ্ঠুরতার মাঝখানে শুভবুদ্ধি ও শিল্পীমনের

জাগরণ। শুরু থেকে "বালিকার প্রবেশ" পর্যন্ত ডাকাতদের দ্রুত লয়ের গানগুলি যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, দ্রুত-সংলাপের ভঙ্গিতে একই গানের বিভিন্ন কলি বিভিন্ন পাত্রের কণ্ঠে ঘোরা-ফেরায় যে-তীব্রতা আনে, হলন্ত ধ্বনির দ্রুত সংঘাতে যে কর্কশ-ধাতব-ধ্বনিপুঞ্জ সৃষ্টি করে—তার পরে অকস্মাৎ বালিকার "ওই মেঘ করে বুঝি গগনে" গানটির টানা সুর মৃত্যু-ফাঁদে আটকা-পড়া কোনো অসহায় প্রাণের প্রতীক আনে। সেই অসহায়তা বাল্মীকিকে যে বিচলিত করেছে তা বোঝাবার জন্য বাল্মীকির কণ্ঠে একটি গান দেয়া হয়েছে—"এ কেমন হলো"। যে-ভাবদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে সমস্ত নাটকটি এসে দাঁড়িয়েছে, সে-ক্ষেত্রে দ্রুত ও ধীর লয়ের মিশ্রণের নাটকীয় তাৎপর্য অসাধারণ। লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ এই লয়-মিশ্রণের নাটকীয় তাৎপর্য সচেতনভাবে অনুধাবন করেছিলেন বলেই যতক্ষণ পর্যন্ত না বাল্মীকি দস্যুতা-ত্যাগ বিষয়ে কৃতসংকল্প ও সরস্বতীর আবির্ভাব সম্পর্কে নিশ্চিতজ্ঞান হয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত নানা আঙ্গিকে এই লয়-মিশ্রণের মধ্য দিয়ে বাল্মীকির চিত্তের অস্থিরতাকে মূর্তি দিয়েছেন। যেমন পরবর্তী "কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই, কেন এই প্রাণ কেন কাঁদে রে" গানটিতে এমন এক নর্তকের চরণধ্বনি শোনা যায় যিনি বারবার নিজেকে মাতালের মতো নাচাতে চাইছেন এবং বারবার যার পদবিক্ষেপ অন্য এক আবেগে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। "আপনা ভুলিতে চাই ভুলিব কেমনে" এই কাতর জিজ্ঞাসার পরই "ধরি ধনু, আমি মনে" ইত্যাদি দ্রুত অংশ। পঞ্চম দৃশ্যের প্রথম গানটি "জীবনের কিছু হলো না-হায়"—বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাল্মীকি তখন বুঝে গেছেন এই আন্তর-ব্যাধি থেকে তাঁকে বাইরের আমোদ-আহ্লাদ মুক্তি দিতে পারবে না। সেই অস্থিরতা (যা লয়-মিশ্রণে রূপায়িত) এখানে হতাশায় পর্যবসিত। ঝাঁপতালে কখনো দশমাত্রা জুড়ে, একসঙ্গে ন'টি অক্ষর উচ্চারণ করে, তার পরমুহূর্তে পাঁচ মাত্রা জুড়ে দুটি অক্ষর বিস্তৃত করে হাহাকারের ভাবটি আনা হয়েছে। সরস্বতীর আবির্ভাবের পর বাল্মীকির প্রাপ্তির আনন্দ বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ রামপ্রসাদী সুরের জেদি-আদুরে-অথচ-বৈরাগ্যের ভাবটিকে অপূর্বভাবে ব্যবহার করেছেন। শ্যামাসঙ্গীতের সুরে শ্যামার কাছ থেকে বিদায়-গ্রহণের নাটকীয়তাটুকুকে না ধরেও বলা যায় এতক্ষণ নানাভাবে বাল্মীকির অস্থিরতা ও হাহাকারকে সুরায়িত করে, রামপ্রসাদী সুরের সহজ গতিতে জীবনের নিশ্চিত পরিবর্তনের ইঙ্গিতের নাটকীয়তা অনস্বীকার্য।

এরপর বাল্মীকির আর এক অস্থিরতা "কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা"। বিশ্বাসহীনতা যন্ত্রণা যেখানে রূপায়িত হয়েছে দ্রুত লয় পরিবর্তনের দ্বারা, বিশ্বাসের যন্ত্রণাকে সেখানে আনা হল নির্দিষ্ট লয়ে, একই কথা পুনরাবৃত্তির দ্বারা—"কী এনেছ ধনমান, তাহা যে চাহে না প্রাণ, দেবী গো চাহি না, চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না"—এখানে "চাহি না" এই বক্তব্যটিকেই বারবার আবৃত্তি করা হয়েছে।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র সুরের নাটকীয়তা বিশ্লেষণ না করলেও সবাইই স্বীকার করে নিয়েছেন—রবীন্দ্রনাথও স্পষ্টভাবেই লিখে গেছেন, "সঙ্গীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসঙ্গত বা নিষ্ফল হয় নাই।" কিন্তু দুইটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য—এই গীতি-নাট্য রচনার পিছনে কোন্ প্রেরণা কাজ করেছে ও "স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য ইহার অতি-অল্প-স্থলেই আছে" এই মন্তব্য কতদূর সত্য ?

শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় তাঁর গ্রন্থের 'গীত-নাট্য ও নৃত্য-নাট্য' অংশটিতে ঠাকুরবাড়িতে গীতি-নাট্যের চল, এ-বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহ, রবীন্দ্রনাথের বিলাত-ভ্রমণের ফল, হার্বার্ট স্পেনসারের মত—যা সে-সময় রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল, ইওরোপীয় সঙ্গীতে ওয়েগনারের মিউজিক-ড্রামার প্রবর্তন, ইতালীয় অপেরার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন এই জাতীয় 'সুরে নাটিকা' আমাদের সঙ্গীত-ধারার অন্তর্ভুক্ত নয় বলেই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এ-জাতীয় চেষ্টা আর না করে গীত, নৃত্য ও নাটকের স্বতন্ত্র রস বজায় রেখে নতুন গীতি-নাট্য নৃত্য-নাট্য রচনা করলেন।

তিনি সমস্ত ব্যাপারটিকেই বিদেশী বলে মেনে নেয়াতেই 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (নাট্যমুখ্য সুর) বা "মায়ার খেলা' (গীতমুখ্য নাট্য) থেকে পরবর্তী 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা'-কে পৃথক করেছেন। মনে হয় উনিশ শতকের কলকাতার সাঙ্গীতিক অবস্থার কথা চিন্তা করলে বোঝা যাবে কেন রবীন্দ্রনাথ এই সময় সুরে-নাটিকা বা গীত-নাটিকা ব্যাপারে উৎসাহিত হয়েছিলেন। এই চেষ্টাগুলির প্রত্যক্ষ কারণ বিলাত-ভ্রমণ, কিন্তু, প্রকৃত কারণ নিহিত আছে সমাজের তৎকালীন পরিবেশে।

বাংলাদেশে গীতরচয়িতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পূর্বগামী নিধুবাবু। ১৮৩০ সালে, রবীন্দ্রনাথের জন্মের তিরিশ বৎসর পূর্বে তিনি মারা যান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নবতীর্থ কলকাতা বন্দর ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে, নতুন নগর-সংস্কৃতি আগে জমে ওঠে নি, পুরাতন গ্রামীন-সংস্কৃতির নানা ভাঙা-চোরা রূপ নগরে ছড়িয়ে পড়েছে। মঙ্গলগান-পাঁচালীগান-কথকতার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক বহুদিন আগেই ছিন্ন হয়েছে—এখন শুধু তার সামান্য ভগ্নাবশেষ নগরে এল। কিন্তু সকলের চেয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে কবিওয়ালাদের এই সব গানে, আখড়াই গানে, হাফ-আখড়াই গানে একটি কোনো মূল কাহিনী থাকত যার চারপাশে অন্যান্য গানগুলো এসে জমা হত। নিধুবাবুর কৃতিত্ব এই যে, তিনি এই 'পালা' ভাবকে ক্ষুণ্ণ করলেন না, অথচ তাতে আনলেন পশ্চিমী টপ্পার এক নতুন রূপ—যার ফলে গান "স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য" পেল। পালা-অন্তর্গত হয়েও পৃথক—এ তো চলে আসছে সেই আঠারো শতকের শেষ থেকেই। পালা-অন্তর্গতি ছাড়াও সার্থক—এই ব্যক্তিত্ব আনলেন নিধুবাবু। উনিশ শতকের এই ভাঙা-পালা-গানের ধারাই ঠাকুরবাড়িতে এসেছে। বিদেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ তারই নতুন রূপ দিলেন 'বাল্মীকি-প্রতিভা'তে। সুতরাং 'বাল্মীকি-প্রতিভা' বিচারে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য আদর্শ প্রয়োগ বোধ হয় ঠিক নয়।

'বাল্মীকি-প্রতিভা' থেকে 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা'কে আলাদা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য কথা বলেছেন : উক্ত "গীতি-নাট্যক'টি এই দলে পড়বে না। এগুলো হল নৃত্য-নাট্য, নাচের কথা চিন্তা করে লেখা। নাচের দরুন এই নাটকের গানে বাঁধা ছন্দের দোলার দিকে নজর রাখতে হয়েছে।" কথাগুলি নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু এজন্য কি প্রথম ও শেষ দিকের গীতি-নাট্যগুলিকে পৃথক করা যায়। "বাঁধা ছন্দের দোলা" কি 'বাল্মীকি-প্রতিভায়' নেই ? ডাকাতদলের গান বা মায়ার খেলার গান যে নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট ছন্দে বাঁধা। যদি 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র লয়-মিশ্রিত গানগুলির কথাই ধরি, তাহলেও কি এগুলিকে একেবারে আলাদা জাতের বলা ঠিক হবে ? লয়-মিশ্রণ তিনি ঐ নাটকগুলিতেও করেছেন, যেমন "আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি"। কিংবা "কেটেছে একেলা বিরহের বেলা"। তফাত এইটুকু যে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'তে যেখানে প্রথম কলি ধীর লয়ে গাইবার অব্যবহিত পরের কলিটিই দ্রুত লয়ের, পরবর্তী গানগুলিতে যে-ক্ষেত্রে স্থায়ীটি ধীর লয়ের, অন্তরা দ্রুত লয়ের—ফলে অবকাশ থাকছে। এই তফাতটুকুকে স্বীকার করে নিয়ে ও পরবর্তীকালে নৃত্য-সহযোগে গীতি-

নাট্যের অভিনয়কে মনে রেখে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় : পরবর্তীকালের গীতি-নৃত্য-নাট্যগুলি প্রথম পর্বের গীত-নাট্য ভঙ্গিরই পরিণত রূপ। আর একটা কথা, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'কে গীতি-নৃত্য-নাট্যে রূপায়িত করা কি সম্ভব নয় ?

রবীন্দ্রনাথের ওপর কলকাতার নাগরিক-সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু পূর্বে যে-প্রসঙ্গ শুরু করেছিলাম সেই প্রসঙ্গের সূত্র ধরে আর একটু বলা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীত রচনার প্রথম পর্বে এই গানগুলির বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ খাঁটি বাংলা গানের ঐতিহ্য নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিলেন। যে-কটি গানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রদত্ত সুরের নিশ্চিত হদিশ পাওয়া গেছে তাদের একটি বাদে আর সবগুলিই নাগরিক প্রেম-সঙ্গীতের ভাষাকে মনে করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর এই আখড়াই-টপ্পা গানের প্রভাব নিয়ে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম পর্বের সাধনা-স্থল কলকাতা। এই প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে এই সময়ই রবীন্দ্রনাথ যে অনেকদূর পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করেছিলেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'মায়ার খেলা','মায়ার খেলা'-র সমস্ত গানের সুর 'নিশ্চিত-ভাবে' রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'কালমৃগয়া'র অভিজ্ঞতাই 'মায়ার খেলা'র গানগুলিকে সাফল্য দিয়েছে। 'মায়ার খেলা'র গানে ও কথায় রবীন্দ্রনাথ কত সাবালক ! ১৮৮১ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকাতে বৈষ্ণব-কবিতা নিয়ে প্রবন্ধ লিখছেন—এতদিনে কীর্তনের সুরকে গানে লাগালেন। 'মায়ার খেলা'র "সখী বহে গেল বেলা", "ওকে বলো সখী বলো", "দিবস-রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি" ইত্যাদি গানে রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞ শিল্পীর মতো কীর্তনের বিচিত্র সুরমালার এক-একটি বিশেষ সুর বেছে নিয়েছেন। "ভালোবেসে যদি সুখ নাহি", "অলি বারবার ফিরে আসে", "আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান", "বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে" ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ গীতগুলির অন্তর্গত গানগুলি এই সময় রচনা করেন। 'মায়ার খেলা'তে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত-সৃষ্টিতে যে-সাফল্য পেয়েছেন, পুনরায় সেই সাফল্যে পৌছতে তাঁকে আরো প্রায় পনরো-বিশ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

কিন্তু কেন 'বাল্মীকি-প্রতিভা' থেকে 'মায়ার খেলা' পর্যন্ত ক্রমাগ্রসরমান ধারা পরবর্তী পর্বে স্তিমিত-গতি হল ? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত

ধারার তথাকথিত দ্বিতীয় পর্ব—১৮৮৪ বা ঐ সময় থেকে ১৯০০ অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত সময়টিকে একটু বিচার করা প্রয়োজন।

এই দ্বিতীয় পর্বেই রবীন্দ্রনাথ প্রচুর ধর্মসঙ্গীত রচনা করেছেন, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ভেঙেছেন, শুদ্ধ সুরের সন্ধান করেছেন—এই দ্বিতীয় পর্বের লক্ষণ-গুলিকেই বে-আইনী সাধারণীকরণ করে প্রথম পর্ব সম্পর্কেও চালিয়ে দেওয়া হয়।

প্রথমেই একটি বিষয় লক্ষণীয়, মার্গসঙ্গীতের ভিত্তির ওপর রবীন্দ্রনাথের গান প্রথম থেকেই দাঁড়িয়ে আছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অনেকগুলি গানই দেশী রাগরাগিনী নির্ভর। ছোটবেলা থেকেই তো অতি উন্নত স্তরের মার্গসঙ্গীত-শিল্পীদের গান রবীন্দ্রনাথ শুনেছেন। তখন কিন্তু তিনি গান ভাঙার প্রয়োজন বোধ করেন নি, বা শুদ্ধ সুরের সন্ধানেও নিযুক্ত হন নি।

কিন্তু কতকগুলি ঘটনা তাঁকে সঙ্গীত-রচনার ঐ স্বাধীন আবহাওয়া থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে। সেগুলিকে এইভাবে সাজানো যায়—১। ১৮৮৪ সালে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ, তার পাঁচ মাস পরে নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা, পারিবারিক আবেষ্টনী ভেঙে গেল। ২। বিবাহের দুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ পিতার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলেন, "এইক্ষণে তুমি জমিদারির কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও," আর কিছুদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ উত্তরবঙ্গে জমিদারি তদারকে বেরলেন, দুই-এক বৎসর পর সেখানেই তাঁকে থাকতে হত। ৩। এই ১৮৮৪ সালেই দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে আদি-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত করলেন।

পূর্বেই বলেছি ষোল-সতরো বৎসর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক ও ব্যক্তিগত দুটি ধারায় সঙ্গীত রচনা করছেন। উক্ত ঘটনাগুলির ফলে সেই ব্যক্তিগত সঙ্গীত-সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ ভেঙে গেল। নাগরিক জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, সাম্প্রদায়িক ধর্মের সঙ্গে নতুন যোগাযোগ—ফলে এতদিনের মুখ্য ধারা, স্বাধীন সঙ্গীত রচনা থেমে গিয়ে গৌন ধারা ধর্মসঙ্গীত রচনা প্রধান হল।

অথচ এই সময়কার ব্রহ্ম-সঙ্গীতগুলিকে অধিকতর সম্মান দেয়া হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের বৎসর রবীন্দ্রনাথ রচিত আটটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীপ্রভাতকুমার বলেছেন, "...সামাজিক কর্তব্য পালনের জন্য লেখা, ধর্মবিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক

আন্তরিকতা হইতে উৎসারিত নহে।" কিন্তু ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঘোৎসবের গানগুলির বিষয়ে বলেছেন, "এই গানগুলি শুনিলে আশ্চর্য হইয়া ভাবি, এ কি কড়ি ও কোমলের রচয়িতা যুবক কবির রচনা, না কোনো ধর্মসাধকের অন্তরের আকুতিভরা প্রার্থনা। ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসপরায়ণতা ও আত্মনির্ভরশীলতা রবীন্দ্রনাথের জীবনেতিহাসের একটি বিশেষ কথা।" পাঁচ বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এমন কি বৈপ্লবিক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

প্রকৃতপক্ষে এই সময় রবীন্দ্রনাথ কবিতায় নিজের শিল্পীমনের প্রকাশ করেছেন, আর সব কিছু ব্যয় করেছেন ব্রাহ্মসমাজের কাজে। এমনকি গানও। ১৮৮৫-র মাঘোৎসবের জন্য রচনা করলেন ৩২টি গান। পর-বৎসরও প্রায় সম-পরিমাণ। এই সময় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "ব্রাহ্মধর্মের জন্য পৃথিবী ভারতবর্ষের কাছে ঋণী।" সুতরাং গানকে এই ধর্মের কাজে নিয়োগ করলেন। দুই-একটি উদাহরণ নেয়া যাক—

> অনেক দিয়েছ নাথ,
> আমায় অনেক দিয়েছ নাথ
> আমার বাসনা তবু পূরিল না—
> দীনদশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না—ইত্যাদি

বা—

> আমায় ছ' জনায় মিলে পথ দেখায় বলে পদে-পদে পথ ভুলি হে।
> নানা কথার ছলে নানা মুনি বলে, সংশয়ে নাহি দুলি হে।

—এ গানগুলি রবীন্দ্রনাথের বালক-বয়সের ব্রহ্ম-সঙ্গীতগুলি মনে করিয়ে দেয়। এই সময় কবি 'মায়ার খেলা' রচনা করে সেই মৌলিক সঙ্গীত প্রেরণায় আর একবার সঙ্গীত রচনা করলেন—তারপর দীর্ঘদিনের জন্য নীরবতা। 'মায়ার খেলা' রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের মানসিকতায় সৃষ্ট, অথচ সময়ের দিক থেকে এটি দ্বিতীয় পর্বের।

উদ্ধৃত গানগুলির ভাষা দেখলে কি তাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষা বলে চেনা যায়? মনে করা যায় এই গীতকার 'কড়ি ও কোমল' শেষ করে 'মানসী'র কবিতা লিখছেন ঠিক ঐ সময়ই। আর এই সময়কার গানগুলিতে হিন্দী-গান ভাঙা যে সুর বসালেন হয়তো সে অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাঁকে সহায়তা করেছে কিন্তু গান না ভেঙেও তো রবীন্দ্রনাথ মার্গসঙ্গীতের

ভিত্তিকে আগেই কাজে লাগিয়েছেন ! তখন রবীন্দ্রনাথ কত প্রথানুগামী হয়ে পড়েছিলেন—"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে"—এই অপূর্ব একটি গানের শুরু দেবতার গুণকীর্তন করতে গিয়ে কোথায় পৌঁছল—এতেই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাই।

অথচ এই সময় রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' নাটকে যে গানগুলি রচনা করেছেন তার হিসেব নিলেই দেখা যায় সঙ্গীত-রচনাশক্তি ধর্মশাসনমুক্ত হলে কত সার্থক সৃষ্টি করতে পারে। "সখি, ওই বুঝি বাঁশি বাজে", "আমারে কে নিবি ভাই", "আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি" "বাজিবে সখি বাঁশি বাজিবে"—জানিয়ে দেয় 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা'র সঙ্গীত-রচনা-শক্তি ধর্মের চাপে পথ ভুলেছিল। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের ব্রহ্ম-সঙ্গীতগুলি আমার কাছে সর্বদা আর এক অরচিত সঙ্গীতের আভাস আনে।

রবীন্দ্রনাথ সার্থক ধর্মসঙ্গীত রচনা করেছেন তখন যখন সেটি তাঁর পক্ষে আর পারিবারিক বাধ্যতা বা আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। ১৯০১ সালে জমিদারির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, ১৯০১-২ সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ১৯০২ সালে স্ত্রীর মৃত্যু, কন্যা রেণুকার অসুখ, ১৯০৪ সালে দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু, ঐ সময় স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে আগমন, অতঃপর স্বদেশী আন্দোলন, ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা—এই সব রবীন্দ্রনাথকে আধ্যাত্মিক করে তুলেছিল। সেই আধ্যাত্মিকতা থেকে উৎসারিত গানের চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। তাকে 'ব্রহ্ম-সঙ্গীত' বা 'পূজা' নাম দিয়ে পূর্ববর্ণিত নিষ্প্রাণ ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত-ধারায় নেহাত গৌন আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতগুলির সঙ্গে এক করে দেখা উচিত নয়।

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সঙ্গীত-রচনা-ধারার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই বিশ্লেষণের পক্ষে সকলের চেয়ে আগে প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের গানগুলির সময়ানুক্রমিক তালিকা। 'গীতবিতানে' রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অনুসরণ করে বিষয়ানুগ—পূজা-প্রেম-প্রকৃতি ইত্যাদি যে ভাগ করা হয়েছে সেটি শিক্ষার্থী বা অনুসন্ধিৎসু কারও কোনো কাজে আসে না। বরঞ্চ রসবোধকে আগেই ও-ধরনের নির্দেশ দেওয়া কখনো বিরক্তিকর, কখনো ক্ষতিকর। কালানুক্রমিক বিবরণ পেলে সমস্ত ইতিহাসটিকে ব্যাখ্যা করার নানা চেষ্টা চলতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভুবনের যে-অধিকার আমরা পেয়েছি তার সমস্ত সম্পদের মূল্য নিরূপণ প্রয়োজন, জরিপ প্রয়োজন, বিবরণ প্রয়োজন—যাতে সে ভুবন আমাদের প্রতিজনের নিকেতনে পরিণত হয়। সেই সব বিশ্লেষণের পরও তো আমাদের বিস্ময়-স্তব্ধ জিজ্ঞাসা—তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী !

রবীন্দ্র-ঐতিহ্য ও নতুন উপন্যাস তত্ত্ব

কার্তিক লাহিড়ী

"সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়; বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।" (সূচনা—চোখের বালি)

আধুনিক উপন্যাসের জন্মক্ষণেই স্থির হয়ে গেল, কাহিনীর প্রতি প্রাক্তন ঔপন্যাসিক আনুগত্য পূর্বতন পালার পুনরাবৃত্তি মাত্র, সে-পালা আধুনিক জীবনের সূক্ষ্ম ও জটিল সমস্যাবলীর উপযুক্ত আশ্রয় নয়, তাই উপন্যাসকার বহির্ঘটনায় পীড়িত চরিত্রাবলীর স্বরূপ প্রকাশে এবং মানুষকে আপন-সীমায় ও মর্ত্যবাসী রূপে চিত্রিত করার প্রয়োজনে প্রবেশ করলেন অন্তর্লোকে, যে লোকের বার্তা এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল বহির্জগতের অত্যধিক এবং প্রকট উল্লাসে। বাংলা সাহিত্যে এই অনুসন্ধিৎসার প্রথম ফসল 'চোখের বালি'। উক্ত উপন্যাসে প্লটের শিথিল বিন্যাস ও কাহিনীর সমতল রচনাপ্রণালী যথেষ্ট দোষাবহ সাব্যস্ত হলেও একটি সিদ্ধান্ত নির্বিবাদে গ্রহণীয় যে, আধুনিক উপন্যাস কোনক্রমেই ক'হিনীময় অধ্যায় অথবা ঘটনাবহুল জীবনবৃত্তের গৌরবময় অতীতে প্রত্যাবর্তনে স্বীকৃত নয়, বরঞ্চ মনোরাজ্যের পথ আপাত সঙ্কীর্ণ প্রতীয়মান হলেও ঔপন্যাসিককে ওই পথেই সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে হবে, নইলে যুগ-চেতনার স্বরূপ লেখার মুকুরে ধরা পড়বে না, জীবন শুধু কাহিনীর গোলকধাঁধায় ঘুরে মরবে এবং এক সময় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার সামগ্রী হয়ে দাঁড়াবে।

রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'তে যে ধারার প্রবর্তন করলেন, সেই ধারায় ঔপন্যাসিকগণ সন্ধান পেলেন একটি নতুন নির্মাণের, যে নির্মিতি ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে চরিত্রের প্রাতিস্বিক সত্তার সঙ্গে সামাজিক সত্তার পরিণয় ঘটাল এবং অতি-মানবিক নায়ক সম্পর্কে যথেষ্ট দ্বিধান্বিত করে তুলল। অথচ জীবন যে ক্রমাগত চলিষ্ণু, তার অস্তিত্বের অর্থ বিভিন্ন প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামে, স্ব-সত্তার সঙ্গে সেই সত্তার দ্বন্দ্ব ও

মিলনে—এ-সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বচ্ছ ছিল বলেই তিনি আধার ও আধেয়-এর সম্পর্ক নিরূপণে বারংবার রচনা-পদ্ধতি, রূপকল্পের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, নিজেকে কেবলই নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন করে দাঁড়িয়েছেন সমস্যার মুখোমুখি, তাই 'চোখের বালি' উপন্যাসে যে রীতি গৃহীত হয়, 'গোরা' উপন্যাসে তা পরিত্যক্ত হয়ে 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে'তে ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। অর্থাৎ বক্তব্যের উপযুক্ত বাহন সন্ধানে তিনি ক্রমাগত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং প্রতিবারই প্রমাণিত হয়েছে, প্রাচীন পদ্ধতি নতুন বক্তব্যের আশ্রয় নয়, সমস্যার ক্রমিক জটিলতায় ভঙ্গিরও বিবর্তন প্রয়োজন। এই পদ্ধতি পরিবর্তনের পালায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে কাহিনীর প্রাধান্য কোনদিন স্বীকার করেন নি, বরঞ্চ যতই অগ্রবর্তী হয়েছেন, কাহিনী ততই উহ্য থেকে গেছে উপন্যাস থেকে। 'গোরা' উপন্যাসে ছিল কাহিনী ও বক্তব্যের হরপার্বতী মিলন, কাহিনী উপন্যাসের অতিরিক্ত না হয়ে বক্তব্যের সহায়ক। যদিচ 'গোরা'-পরবর্তী উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বক্তব্যের প্রতি যত নিষ্ঠ ও সমস্যা উদ্‌ঘাটনে তৎপর কাহিনীর প্রতি ততোধিক নির্বিকার। ফলে কাহিনীর শূন্য স্থান পূরণে নব প্রণালী গৃহীত হয়েছে 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে, যদিও কাহিনীর ভার মুক্ত হলেই লেখক উপনীত হন নানা প্রতিকূল সমস্যার সম্মুখে, যে সমস্যাবলী নিছক দ্বন্দ্বের নয় রক্ত-মাংসেরও। অর্থাৎ কাহিনীর ভার লঘু হলেই গুরু হয় তত্ত্বের ওজন, দৃষ্টি পড়ে কারুকর্ম ও চাতুরীর প্রতি যেজন্য চরিত্রগুলি সম্যক বিকশিত না হয়ে যান্ত্রিক অথবা উৎকেন্দ্রিক হবার সম্ভাবনা অনিবার্য করে তোলে এবং চরিত্র যদি রক্ত-মাংসের জীব না হয়ে-ওঠে তবে সে উপন্যাসের অ-সিদ্ধি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তাই তত্ত্বের আধিক্য, আঙ্গিক-সর্বস্বতা প্রভৃতি দোষাবলী মোচনে ঔপন্যাসিক সচেতন না হলে তাঁর রচনাবলী সার্থকতার আলো থেকে বঞ্চিত হবে এবং রবীন্দ্রনাথের শেষ চারখানি উপন্যাস সম্পর্কে এমন অভিযোগ স্বতঃই উচ্চারিত। এরূপ মন্তব্যের পুনর্বিচার বাঞ্ছনীয় কারণ উক্ত বিচারে অতি-আধুনিক উপন্যাসাবলীর একটি বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী ভূমি আবিষ্কার সহজ হয়।

দুই

প্রাচীন ঔপন্যাসিক তত্ত্ব প্রয়োগে 'শেষের কবিতা', 'দুইবোন', 'মালঞ্চ', ও 'চার অধ্যায়' পুস্তক চতুষ্টয়ের উপন্যাসত্ব সম্পর্কে সংশয় জাগে। প্রাচীন উপন্যাস-তত্ত্ব অনুযায়ী উপন্যাস অন্তত চারটি উপাদানের (প্লট, চরিত্র, পরিবেশ, সংলাপ) একটি মিশ্র অখণ্ড রচনা, যে-রচনায় গল্পের আদি, মধ্য ও অন্ত্য অধ্যায় সুস্পষ্ট লক্ষিত এবং কাহিনীর উক্ত তিন পর্যায়ের অস্তিত্বে চারিত্রিক বিবর্তনেরও তিনটি স্তরের বিবরণ প্রদান ঔপন্যাসিক কর্তব্য। এই দুই উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয় সংলাপ ও পরিবেশ। অর্থাৎ উপন্যাসে অঙ্কিত চরিত্রগুলির জন্ম হয় এবং ধীরে ধীরে শৈশব কৈশোর যৌবন অতিক্রম করে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে সমাপ্তিতে জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ করে। কিন্তু 'দুইবোন', 'মালঞ্চ' প্রভৃতি উপন্যাসে কাহিনী অথবা উপস্থাপিত চরিত্রগুলির এমন তিন অধ্যায়ের সাক্ষাৎ মেলে না, পাত্র-পাত্রীদের যে-কোন একটি অধ্যায়ে উপস্থিত করা হয় এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি মাত্র সংবাদ হিসেবে পরিবেশিত হয়। 'চোখের বালি' উপন্যাসের সঙ্গে শেষ পর্যায়ের যে-কোন উপন্যাসের তুলনামূলক বিচারে এ-সিদ্ধান্ত সত্য বলে বিবেচিত। অবশ্য 'চোখের বালি' উপন্যাসে ঘটনা-বাহুল্য বর্জিত হয়েছে এবং চরিত্রগুলি বহির্ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি, আন্তর জীবনের কথাই এ উপন্যাসের মূল ও শেষ লক্ষ্য। তবু নায়ক মহেন্দ্রর সঙ্গে বিনোদিনীর বিবাহ সম্পর্কিত ঘটনা প্রথম অধ্যায়ে জানানো হয়েছে, মহেন্দ্রর অনিচ্ছায় বিনোদিনীর বিবাহ হয় অন্যত্র এবং মহেন্দ্র পরবর্তী সময়ে বিবাহ করে আশাকে। আশা মহেন্দ্রর বিবাহিত জীবনের মধুর দিনগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণিত আছে, এই সময় মধ্যে আবির্ভাব হয় বিনোদিনীর। বিনোদিনী ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয় মহেন্দ্রের প্রতি, মহেন্দ্রও। এবং এই আকর্ষণের এক পর্যায়ে মহেন্দ্র আবিষ্কার করে বিনোদিনীর প্রতি বিকর্ষণ, অন্যপক্ষে বিনোদিনী আশ্রয় নেয় বিহারীর নিকট অথচ এ আত্মসমর্পণ আকস্মিক নয়। লেখক বহুস্থানে তার সূত্র রেখেছেন, যে সূত্রগুলির উল্লেখ বাহুল্যবোধে বর্জিত হল। অতঃপর উপন্যাসের পরিণতি আমরা সবাই অবগত আছি। অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীদের যে অবস্থায় উপন্যস্ত করা হয়েছে সেই সময় থেকে কাহিনীর আদি, মধ্য ও অন্ত্য কোন পর্বই অ-বিবৃত নয়। এমনকি মহেন্দ্র, আশা, বিনোদিনী, বিহারী, রাজলক্ষ্মী চরিত্রাবলীর আদি, মধ্য ও অন্ত্য অধ্যায় অতি বিস্তৃত রূপে স্পষ্ট।

মহেন্দ্র আশার বিবাহিত জীবনের আদি-পর্ব যেমন বর্ণিত, তেমনি মহেন্দ্র-বিনোদিনী অংশের প্রথম পর্বটি বিবৃত। এমনকি বিহারী, আশা এবং বিনোদিনী অধ্যায়টিরও আরম্ভ থেকে পরিণতি সংবাদরূপে পরিবেশিত হয়নি, পাঠক-সম্মুখে অতি ধীরে ধীরে নিপুণভাবে উন্মিলীত করেছেন। অন্যপক্ষে 'দুইবোন' উপন্যাসে শর্মিলার ট্রাজিডি-ই কেন্দ্র-বিন্দু, অথচ শর্মিলার এ ট্রাজিডির সূত্রপাত কোথায় এবং কোন্ অবস্থায়, লেখক শুধুমাত্র কতকগুলি সূত্র ধরিয়ে নিরস্ত থেকেছেন। শশাঙ্ক স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত, অথচ বাণিজ্যিক সাফল্যে স্ত্রীর নিকট থেকে দূরে সরে গেছেন—এমন ঘটনার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ অথবা বিবর্তন পাঠক সম্মুখে তুলে ধরেন নি লেখক, মাত্র কয়েক ছত্রের মধ্যে উক্ত ঘটনা বিবৃত করেছেন এবং এই অবসরে উর্মিমালার আবির্ভাব ও শশাঙ্কর জীবনে নব-দিগন্তের সন্ধান সংবাদ হিসেবেই রাখা হয়েছে, অর্থাৎ লেখক পরপর কয়েকটি সংবাদ পরিবেশন করে (শর্মিলার পূর্ব-জীবন, উর্মিমালা-নীরদ আখ্যান প্রভৃতি) মূল উপপাদ্যে প্রবেশ করেছেন, শুরু হয়েছে উপন্যাস। 'চোখের বালি'তে যেমন প্রতিটি সম্পর্কের আদি, মধ্য ও অন্ত্য পর্যায়ের বিকাশ ও বিবর্তন লক্ষ্য করি, 'দুইবোন'-এ তেমন বিবর্তন অবর্তমান কারণ পাত্র-পাত্রীদের উপন্যস্ত করা হয়েছে এমন এক সময় যখন তারা একটি জটিল ও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। শশাঙ্ক-গৃহে উর্মিমালার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা তীব্র হয়ে ওঠে এবং উক্ত সমস্যা অভিমুখেই অতঃপর লেখক ধাবিত হয়েছেন, কিন্তু এই সমস্যা উত্থাপনের পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত চরিত্রগুলির পশ্চাৎ-ইতিহাস আলোচিত হয়েছে মাত্র এবং কোন্ অবস্থায় তাদের আনয়ন করা হল, তার ভূমিকা ও ভূমি রচিত হয়েছে।

'মালঞ্চ' উপন্যাসেও সরলার প্রতি নীরজার ঈর্ষা জাগরিত হবার পরই উপন্যাসের মূল কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছেন লেখক। তৎপূর্বে তিনি নীরজা-আদিত্যর সাংসারিক জীবন, নীরজার অসুস্থতা এবং সেবার জন্য সরলার আগমন প্রভৃতি সংবাদ-সূত্র প্রদান করেছেন। অর্থাৎ এ উপন্যাসেও নীরজা-আদিত্য পর্বের প্রথম পর্যায় অথবা সরলা-আদিত্যর আদিপর্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হয় নি। সমস্যা যখন চূড়ায় উঠেছে, নীরজা যখন সরলার প্রতি স্বামী আদিত্যর আকর্ষণ সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত হয়েছে, লেখক তেমন অবস্থা থেকে পরিণতি পর্যন্ত কাহিনীর কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, যে বিবরণ 'চোখের বালি' উপন্যাসে প্রথমাবধি লক্ষিত। 'মালঞ্চ'-এ তাই

দেখি পাত্র-পাত্রীরা জীবনের একটি সমস্যাসঙ্কুল অধ্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং সেই পর্যায় থেকে পরিণতি পর্যন্ত লেখক তাঁর কাহিনী অংশ নির্বাচিত করে নিয়েছেন। এক কথায় বলা যায়, আদি পর্ব উহ্য রেখে মোটামুটি মধ্য পর্যায়ের শেষ পাদ থেকে অন্ত্য অধ্যায় পর্যন্ত উপন্যাসগুলির কাহিনীর সীমা।

এমনকি 'শেষের কবিতা' পর্যালোচনা করলে দেখি, অমিত-লাবণ্যর প্রণয় উপলব্ধির পরই মূল উপন্যাসের সূত্রপাত হয়েছে, তার আগে অমিত ও লাবণ্য সম্পর্কিত কয়েকটি সূত্র ধরিয়ে দিয়ে লেখক নায়ক-নায়িকাকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন এবং দুর্ঘটনা যে অপরিচয়ের বেড়া ভেঙে অনেকদূর নিয়ে গেছে এমন ভূমি প্রস্তুত করেই উপন্যাসের কেন্দ্র-সমস্যায় উপনীত হয়েছেন অর্থাৎ এই উপন্যাসগুলির কোনো পুস্তকেই লেখক চারিত্র-বিবর্তন, চরিত্রের ক্রমবিকাশ ও কাহিনীর আদি, মধ্য ও অন্ত্য পর্যায় প্রভৃতি প্রাচীন উপন্যাসতত্ত্ব মেনে নিয়ে অগ্রসর হন নি। শশাঙ্ক, শর্মিলা, অমিত, লাবণ্য, নীরজা, আদিত্য, অন্ত অথবা এলা উপন্যাসের যে-সময় আবির্ভূত হয়েছে, সেই সময় থেকে শেষ পর্যন্ত অথবা পরিণতিতে পরিবর্তীত হয়ে অন্য মানুষ হয়ে উঠেছে, এমন রূপান্তর অদৃশ্য। শর্মিলা, নীরজার ঈর্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে, অন্ত-এলার প্রণয়-পিপাসা ও অন্যদিকে পরিবেশের প্রতিবন্ধকতা তীক্ষ্ণ হয়েছে, অমিত-লাবণ্য কিঞ্চিৎ সিরিয়াস হলেও আসলে তারা তাই থেকে গেছে, আমরা শর্মিলা, নীরজা, অন্ত, এলা প্রভৃতিদের প্রাচীন রূপই প্রত্যক্ষ করি। শুধু সমস্যার উত্তুঙ্গ চূড়ায় চরিত্রগুলির কয়েকটি নতুন দিকের সংবাদ সরবরাহ করেছেন লেখক কোনো কোনো ক্ষেত্রে। ফলে প্রাচীন উপন্যাসের চরিত্রের ক্রমবিকাশ, ক্রমবৃদ্ধির সন্ধান বর্তমান উপন্যাসগুলিতে শূন্য ঝোপে কোপ দেবার সামিল। অতএব এ-গুলি উপন্যাস নয়, এমন সিদ্ধান্ত সহজেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে কতিপয় সমালোচকের নিকট। কিন্তু সেই সব সমালোচকদের স্মরণে থাকা উচিত, কোনও একটি শিল্পরূপের সূচনা-স্তরে যে ক'টি বৈশিষ্ট্য ও উপাদান অবলম্বন, পরবর্তী পরিণতস্তরে সেই বৈশিষ্ট্য ও উপাদানের ক্রমিক বিকাশ ও অভিব্যক্তি ঘটে থাকে, সেজন্য সূচনাস্তরের নন্দন-তত্ত্ব বা সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ড পরবর্তী অধ্যায় বিচারে বিশেষ ভ্রান্তিরই জন্ম দেবে বলে বিশ্বাস করি। কারণ সাহিত্য ক্রমাগত নানা দিগন্তে ও ফলফুলে সমৃদ্ধ হচ্ছে, আমরা প্রাক্‌পৌরাণিক ধারণা নিয়ে আধুনিক কবিতার বিচারে যেমন অক্ষম, তেমনি বঙ্কিম-উপন্যাসের আলোচনায়

যে মানদণ্ড প্রযুক্ত হয়েছে, সেই মানদণ্ডে রবীন্দ্র-উপন্যাসের শেষ পর্যায়ের বিচার ফলবতী হবে না, তা কিছুপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এর সূত্রপাত অবশ্য 'চোখের বালি' উপন্যাসে। কারণ 'চোখের বালি' রচনার পর বাংলা উপন্যাসের একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে এবং পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাংলা উপন্যাসকে আরও বহুধাপ অগ্রবর্তী করেছেন, যার ফসল শেষ পর্যায়ের চারখানি উপন্যাস। সেইজন্য এই উপন্যাসগুলি আলোচনার জন্য নতুন উপন্যাসতত্ত্বের প্রয়োজন কারণ প্রাচীন উপন্যাস-তত্ত্ব এই উপন্যাস বিচারে অচল, তাই নতুন উপন্যাসের জন্য নতুন উপন্যাস-তত্ত্বের আবশ্যক হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের উপন্যাসগুলির উপরোক্ত আলোচনায় আমরা নতুন উপন্যাস-তত্ত্বের কয়েকটি মূল সূত্র লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম :

১। পূর্বতন উপন্যাসের চারিত্রিক বিবর্তন, ক্রমবিকাশ (development) ও ক্রমবৃদ্ধি (growth of the character) আলোচ্য উপন্যাসে অ-পরিলক্ষিত। চরিত্রগুলি উপস্থাপিত হয় চরম মুহূর্ত (climax)-এর নিকটবর্তী কোনও এক পর্যায়ে, ফলে চরিত্রগুলি বিকশিত অবস্থায় উপনীত হয় উপন্যাসে, তাই চরিত্রের ক্রমবৃদ্ধি দর্শানো সম্ভব হয় না।

২। উপন্যাসগুলি বিশেষত সমস্যা-প্রধান। সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াবার ঝোঁক ও মূলত একটি সমস্যার বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা এইসব উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। সেজন্য কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে আমরা চরিত্রের কিছু নতুন বৈশিষ্ট্যের আভাষ পেতে পারি, কিন্তু ওই আভাসের অতীত যদি চারিত্রিক গোলত্ব (roundity of character)-এর প্রতি লক্ষ্য থাকে, তবে হতাশ হতে বাধ্য।

৩। কাহিনী এক্ষেত্রে একটি উপাদান মাত্র, চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে উৎসৃত সমস্যা প্রকাশের অতি ক্ষীণ অবলম্বন। সেজন্য কাহিনী বা প্লটের আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই সুস্পষ্ট অধ্যায় অবর্তমান। কাহিনী যে-কোনো অধ্যায়ে শুরু হয় এবং যে-কোনো অধ্যায়ে এমনকি সেই অধ্যায়েও শেষ হওয়া বিচিত্র নয়।

৪। এসব উপন্যাসে প্রাচীন তত্ত্বের চরিত্রের গোলত্ব অথবা ত্রিমাত্রিকত্ব প্রভৃতির অনুসন্ধান পণ্ডশ্রম। বরঞ্চ নাটক এবং চলচ্চিত্র-শিল্পের কয়েকটি পদ) গ্রহণ করলে উপন্যাসগুলির প্রতি সুবিচার করা হয়। যেমন :

পরিস্থিতি (situation), চরম মুহূর্ত (climax), মন্‌টাজ (রবীন্দ্র-উপন্যাসে মনটাজ পদ্ধতি অবশ্য প্রযুক্ত হয় নি)।

চতুর্থ সূত্রে নতুন উপন্যাস-তত্ত্বের অন্য একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং এই সূত্র সম্পর্কিত ধারণার জন্য উপন্যাস চতুষ্টয়ের যে-কোন একটির শরীর-বিশ্লেষণ আবশ্যক। 'মালঞ্চ' উপন্যাসকে স্পষ্ট দুইটি দৃশ্যে বিভক্ত করা যায়, ১। নীরজার কক্ষ ২। পুষ্প-উদ্যান। চরিত্রগুলি এই দুইটি দৃশ্যপটে গমনাগমন করেছে এবং সংলাপের মাধ্যমে ঘটনার জটিলতা ও চরম মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মূল-সমস্যা উপস্থাপিত করার জন্যে দুটি পরিবেশ নির্বাচিত করেছেন এবং সেই পরিবেশে আপন সমস্যার উপযোগী পরিস্থিতি রচনা করে অগ্রসর হয়েছেন, ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকে যে-সব পদ বা নাম (term) ব্যবহৃত হয়, সেই সব পদ বা নামের সাহায্যে উপন্যাসের এক-একটি স্তর অতি সুন্দররূপে বিচার করা যায়। অবশ্য স্বীকার্য, রবীন্দ্রনাথ নাটকে ধ্রুপদী পঞ্চবিভাগের ক্রম যথাযথ অনুসরণ করেন নি, কোনো কোনো সময় প্রস্তাবনা ব্যতিরেকেই সংঘাত (action) বিভাগে অবতীর্ণ হয়েছেন, হয়তো কোনো সময় চরম-মুহূর্তের পর এরিস্টটলীয় পতন (catastrophe) মানেন নি, তথাপি তিনি যে রূপেই নাটক লিখে থাকুন, নাটকের কয়েকটি পদ আলোচনার সময় প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং 'মালঞ্চ' উপন্যাস সে সংজ্ঞার মধ্যেই ঈপ্সিত আলোচনার ধারাকে সন্তুষ্ট করে। যেমন 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নাটকের প্রস্তাবনা অংশের অবকাশ না থাকলেও সংঘাত পর্বের নাটকীয় গুণাবলীর সাক্ষাৎ অদৃশ্য নয়। এ-ক্ষেত্রে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসটি প্রথমাবধি নাটকের চালে রচিত। যদি "ভূমিকা" অংশ পরিত্যাগ করা যায় তবে নাটকের শুরু হয় প্রথম অধ্যায়ে "দৃশ্য—চায়ের দোকান।" এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলি নাটকের এক একটি অঙ্কে পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে বর্ণনা আছে, তা দৃশ্যবর্ণনা, বরঞ্চ এই বর্ণনা উহ্য রাখলে নাটকের পরিমণ্ডল অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসে নাটকের পঞ্চ-বিভাগ হুবহু অনুসৃত না হলেও আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সমস্যাকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করেছেন লেখক, অবশ্য পরিবেশ অনুযায়ী পরিস্থিতি সর্বদাই নির্বাচিত হয়েছে এবং কোনো কোনো সময় অতীত ঘটনা ফ্ল্যাশ-ব্যাক পদ্ধতিতে সংলাপের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে।

'শেষের কবিতা'র মতো নাতিদীর্ঘ উপন্যাসে অমিত-লাবণ্যর প্রণয় উদ্গমের পর প্রণয়ের তীব্র আবেগ যে বাধাবন্ধনহীন পথ প্রস্তুত করে দিল, সেজন্য লেখক নির্বাচিত করেছেন কয়েকটি উপযুক্ত পরিবেশ। "সংঘাত" থেকে "মুক্তি" অধ্যায় পর্যন্ত উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঔপন্যাসিক সুন্দর সুন্দর কয়েকটি পরিস্থিতি রচনা করে নিয়েছেন এবং উক্ত পরিবেশে স্থাপন করেছেন পাত্র-পাত্রীদের। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসগুলিতে কাহিনীকে ক্রমিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে অগ্রবর্তী করেন নি, কয়েকটি দৃশ্য, পরিস্থিতি ও পরিবেশ মারফত সমাপ্তি টেনেছেন, ফলে 'চোখের বালি' উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীদের মনস্তত্ত্ব রচনায় লেখক হস্তক্ষেপ করলেও, আলোচ্য পুস্তক সমুদয়ে তিনি নাট্যকারের মতো নির্বিকার। অর্থাৎ লেখক পাত্র-পাত্রীদের আচার-আচরণ, সংলাপ মাধ্যমে তাদের মানসিক অবস্থার প্রকাশে সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে দায়ী করেছেন, যদিও সংলাপ রচনায় একই ভঙ্গিমা এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে, তবু রবীন্দ্রনাথ লেখক হিসেবে হস্তক্ষেপ করেন নি বললেই চলে। পাঠক পাত্র-পাত্রীদের অন্তরে প্রবেশ করবে ঠিক পাত্র-পাত্রীদের মন নিয়ে—এমন অভীপ্সা হয়তো রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ছিল, অথচ কয়েকটি বিষয় তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি বলে, সেই কল্পনা রূপায়িত করা সম্ভব হয় নি।

তিন

রবীন্দ্র-উপন্যাসের উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথ অন্তত দুটি বিষয়ে বিশেষ সচেতন হয়ে উঠছিলেন—

১। পূর্বতন উপন্যাসে ঘটনাস্থল একাধিক, গ্রাম ও নগর। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের ঘটনাস্থল কলকাতা এবং পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে যথাসম্ভব একটি স্থানই নির্বাচন করেছেন এবং ওই স্থান সচরাচর নগর। 'শেষের কবিতা'-র মতো নাতিদীর্ঘ উপন্যাসের মূল ঘটনাস্থল শিলং পাহাড়, যদিও উপন্যাস শেষে সেই স্থান পরিবর্তিত হয়েছে, অবশ্য লেখক সর্বদা সচেতন ছিলেন যাতে উপন্যাসের স্থান সংখ্যায় একাধিক না হয়ে পড়ে। 'মালঞ্চ' এ-ক্ষেত্রে এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। সমগ্র উপন্যাস নীরজা-আবাসের কক্ষ ও সন্নিহিত উদ্যানের সীমায় নিবদ্ধ।

২। সময়-ব্যবহারে (use of time) অবশ্য তেমন দুঃসাহসের পরিচয় না

দিলেও পূর্বতন উপন্যাসের দীর্ঘ সময় কয়েক বছরের পরিধি যথেষ্ট সঙ্কুচিত হয়েছে রবীন্দ্র-উপন্যাসে এবং শেষ-পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে সময়ের সীমা অনুল্লেখিত থাকলেও উক্ত সীমা নিশ্চয়ই বৎসরের গণ্ডী অতিক্রম করবে না বলে বিশ্বাস করি।

অথচ সময় বা যুগ-চেতনা (time-sense) রবীন্দ্র-উপন্যাসের একটি আশ্চর্য লক্ষণ। 'গোরা' এবং বিশেষ করে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস থেকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস-সমস্যা উপস্থিত করেছেন দেশ ও কালের এক অতি-সচেতন বিশ্লেষণে এবং তাঁর কোনও উপন্যাসে তৎসাময়িক কাল অথবা যুগ উপেক্ষিত হয় নি। এই সময়-চেতনা মনন উত্থিত, কারণ শুধুমাত্র স্বভাবের উপর নির্ভর করে কাহিনীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে ভাবালুতা হয় শেষ আশ্রয়। উপন্যাসে সমস্যা উত্থাপন ও সেই সমস্যার অনুরূপ পাত্র-পাত্রীর বিন্যাস আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম স্বরূপ বিবেচিত হলে মানবিক সম্পর্কের কার্যকারণ এবং উক্ত সম্পর্কের দ্বন্দ্ব-মিলন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে, ফলে ঔপন্যাসিক নিছক গল্প বলাকেই স্বীয় লক্ষ্যের বাহন করতে অসম্মত হন। যে মানুষের জীবন চিত্রিত হবে তাকে দেশ ও কালের সীমায় প্রকাশ করে দেশ ও কালের নবমূল্য আবিষ্কারের মধ্যে জীবনের তাৎপর্যের সন্ধান ঔপন্যাসিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। তাই নতুন উপন্যাস-তত্ত্বে বিশেষ করে সময়-চেতনা একান্ত আবশ্যিক, নচেৎ উপন্যাসগুলি আঙ্গিক চর্চার পরাকাষ্ঠা হলেও প্রকৃত ঔপন্যাসিক অর্থ লাভে বঞ্চিত হবে। বাংলা সাহিত্যে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বনফুল রচিত একাধিক উপন্যাস। বনফুল উপন্যাসে নানা ভঙ্গী, কৌশল ও রূপকল্পের ব্যবহার করেছেন অথচ উক্ত পুস্তকাবলীতে কদাচিৎ সময়ের ভূমিকা উল্লিখিত হয় এবং ঔপন্যাসিক কেন যে উক্ত আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছেন, এমন প্রশ্নের উত্তর সন্ধান পণ্ডশ্রম হয়ে পড়ে। মনে হয় "রূপকল্পের জন্য নবরূপকল্প", যদিও 'কিছুক্ষণ' উপন্যাসে তিনি কিঞ্চিদধিক সার্থক। 'কিছুক্ষণ'-এ সময় ব্যবহারের প্রতি অতি প্রখর দৃষ্টি থাকার ফলে চারিত্র উপস্থাপনায় সময়-চেতনার অতি মৃদু স্পর্শ লেগে গেছে। এমনকি জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র বহু সময় নতুন উপন্যাস-তত্ত্বের অতি নিকটবর্তী হয়েও যুগ-চেতনার অভাবে অবশেষে প্রত্যাবর্তন করেছেন প্রাচীন পথে, যে-পথে জীবনের গভীর অর্থের চেয়ে বাহ্যিক তরল উপাদানই মূল্যবান। 'শেষ-প্রশ্নে'র মতো সমস্যাবহুল উপন্যাস তাই পরিণত হয় পাত্র-

পাত্রীদের স্ব-বিরোধী উক্তি ও আচার-আচরণের বিপুল সমষ্টিতে। অন্নদাশে রবীন্দ্রনাথের যুগ-চেতনা যে মননের সূত্রপাত করে, সেই মননের সাহায্যে গড়ে ওঠে বাস্তব-উপন্যাসের ভিত্তি, যার অঙ্কুর জগদীশ গুপ্ত—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে যার বিশেষ বিকাশ। এক্ষেত্রে সতীনাথ ভাদুড়ীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন এবং ওই সমস্যাকে বিভিন্ন আলোক-সম্পাতে ভেঙেচুরে মূল প্রতিপাদ্যে প্রবেশে সচেষ্ট হয়েছেন, যেজন্য বহু সময় ধ্রুপদী রচনা-রীতিকে বিশ্লেষণী প্রতিভার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে দেখি এবং এক সময় লক্ষ্য করি, মানিকবাবু বাংলা-উপন্যাসের নানা দিগন্তের অর্গল অতি অনায়াসে উন্মোচন করে দিয়ে গেছেন পরবর্তীদের জন্য। অন্নদাশঙ্কর রায়ও রবীন্দ্র-মননের ঐতিহ্য আত্মস্থ করেন বলেই তিনি 'সত্যাসত্য'-র মতো ধ্রুপদী-পদ্ধতির উপন্যাসে আধুনিক ঔপন্যাসিক পরীক্ষা করতে নির্ভয়। বস্তুত যুগ বা সময় চেতনা নতুন উপন্যাস-তত্ত্বের প্রথম ও সর্বপ্রথম উপাদান এবং এ-কথা বহুবার ঘোষিত হলেও পুনরুক্তিদোষে দুষ্ট নয়।

রবীন্দ্রনাথ সময় ও স্থান ব্যবহারে শেষ পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে যে ইঙ্গিতময় প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত রেখেছেন, রবীন্দ্রোত্তর ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে অনেকেই ওই ইঙ্গিতগুলিকে উপন্যাসে প্রয়োগের দিকে নজর দিয়েছেন। আমরা কয়েকটি প্রচেষ্টা ও প্রয়োগের উল্লেখ নিয়ে লিপিবদ্ধ করছি :

১। সময় ব্যবহার (use of time) : ধূর্জটিপ্রসাদ 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসে সময়-ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। 'অন্তঃশীলা'র সময়-কাল প্রায় এক সপ্তাহ। গোপাল হালদারের 'একদা' এ-বিষয়ে দুঃসাহসিক। উপন্যাসে ব্যবহৃত সময় সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র একদিনে এবং ওই একটি দিনের পরিধিতে লেখক একজন বুদ্ধিজীবী নায়কের জগৎ সুস্পষ্ট করে তোলেন। নবেন্দু ঘোষের 'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাসের সময়কালও মাত্র একদিন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'নীল দিগন্ত' ও বহু পরিমাণে ধ্রুপদী-প্রথায় রচিত। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'তিন দিন তিন রাত্রি' উপন্যাসে সময় একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ সময় সঙ্কোচে সচেষ্ট ছিলেন, এই সব ঔপন্যাসিক অতি নিপুণভাবে সময়কে সংক্ষিপ্ত করে সমগ্র জীবনের তাৎপর্য ধরতে চেয়েছেন।

২। স্থান ব্যবহার : রবীন্দ্রনাথ স্থান ব্যবহারে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন,

এই সব ঔপন্যাসিক অতি-নিষ্ঠার সঙ্গে সেই ইঙ্গিতকে মূর্ত করে তোলেন। 'একদা' উপন্যাস—স্থান : কলকাতা। নবেন্দু ঘোষ-এর 'ডাক দিয়ে যাই'—স্থান : কলকাতা। বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর'—স্থান : কলকাতা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নীল দিগন্ত'—স্থান : কলকাতা। অর্থাৎ শহর-কেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হয়ে দেখা দেয়।

৩। এতদিন চরিত্রগুলি বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করতেন স্বয়ং লেখক, কিন্তু বর্তমান ঔপন্যাসিক নাট্যকারের মতো নির্বিকার থাকতে চান, চরিত্র স্বয়ং উদ্ভাসিত হয় এবং পাঠক চরিত্রের সঙ্গে এক এবং আত্মীয় হয়ে ওঠেন অর্থাৎ চরিত্রকে জানি ঔপন্যাসিকদের ব্যাখ্যায় নয়, চরিত্রের ক্রিয়া-কলাপ আচার-আচরণের মাধ্যমে। স্থান ও সময় ব্যবহারে ঔপন্যাসিকগণের অতি-সচেতন দৃষ্টি পাত্র-পাত্রী উপস্থাপনায় বিশেষ সতর্ক হয়ে ওঠে যেজন্য শুধু-মাত্র বহির্ঘটনা অথবা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পাত্র-পাত্রীদের উপন্যস্ত না করে, চরিত্রের অস্ফুট অবচেতন এবং বিমূর্তভাবনা প্রকাশে ঔপন্যাসিক উন্মুখ হন, ফলে কয়েকটি পদ্ধতির মিশ্রণে রচনার নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার আবশ্যিক হয়ে পড়ে। যে-প্রণালীতে স্থান পায় চেতনা-প্রবাহ, অন্তর্মুখী আত্মভাষণ (internal monologue), চিত্রকলার ইম্প্রেশনিস্ট পদ্ধতি, সিনেমার মনটাজ প্রভৃতি। গোপাল হালদারের 'একদা' উপন্যাসে চিত্রকলার ইম্প্রেশনিস্ট পদ্ধতির সঙ্গে মিশ্রিত হয় সিনেমার মনটাজ ও অন্তর্মুখী আত্মভাষণ। ধূর্জটিপ্রসাদ অংশ বিশেষে প্রয়োগ করেন চেতনা-প্রবাহ। 'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাসে ব্যবহৃত হয় চেতনা-প্রবাহ ও মনটাজ পদ্ধতি। এমনকি বুদ্ধদেব বসু 'তিথিডোর' উপন্যাস প্রচলিত প্রথায় আরম্ভ করে, শেষ করেন চেতনা-প্রবাহ ও ইম্প্রেশন পদ্ধতির একটি মিশ্র-প্রণালীতে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'নীল দিগন্ত' উপন্যাসে চেতনা-প্রবাহে নতুনত্ব আনেন জটিল বাক্যের অংশ বিশেষের এক নব সংযোজনায়। এ-বিষয়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'সৃষ্টি' ও 'স্মৃতি' উপন্যাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'স্মৃতি' সম্পূর্ণত চেতনা-প্রবাহে রচিত না হলেও চেতনা-প্রবাহের আগ্রহ ওই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। 'সৃষ্টি' উপন্যাস রচিত হয়েছে নানা প্রণালীর এক অদ্ভুত অথচ আশ্চর্য সফল মিলনে। বহু অভিজ্ঞ লেখক এই উপন্যাস থেকে পাঠ নিতে পারেন বলে আমার বিশ্বাস।

৪। ঔপন্যাসিক যে নব-প্রণালী আবিষ্কারে সমগ্র মানুষকে চিত্রিত করতে প্রয়াস পেলেন, সেই প্রণালীর এক রন্ধ্রপথে বিমূর্ত ভাবনা ধীরে ধীরে

আপন-পথ প্রশস্ত করতে থাকে এবং বিমূর্ত ভাবনা ক্রমে রূপ নিতে থাকে সাংকেতিক ও প্রতীক উপন্যাসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' এ-প্রচেষ্টার প্রথম উদাহরণ। জীবন থেকে মৌলিক দোষ-গুণাবলীর নির্যাস নিষ্কাশিত করে রূপকথার ভঙ্গিতে প্রতীক ও সাংকেতিক রচনা অবশ্য বিপুল সংখ্যায় সম্ভব হয় নি, তবু নবেন্দু ঘোষের 'আজব নগরের কাহিনী', 'দ্বীপ' এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'কন্যা' এ-ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

চার

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-পরবর্তী ঔপন্যাসিকগণ যে-ধারার সূত্রপাত করেন, সেই ধারা সম্পূর্ণ করার ভার তরুণ ঔপন্যাসিকদের এবং আনন্দের বিষয় কয়েকজন ঔপন্যাসিক এ দায়িত্ব সম্পূর্ণ করতে অগ্রসর হয়েছেন। উপন্যাসে রবীন্দ্র-ঐতিহ্য আশ্চর্য নিঃশব্দে যাঁরা বহন করছেন তাঁদের মধ্যে অমিয়ভূষণ মজুমদার, ননী ভৌমিক, বিমল কর, অসীম রায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, সীমন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতি নন্দী, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, সুরজিৎ বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এঁদের মধ্যে অমিয়ভূষণ, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র-মননের শিক্ষা অধিক গ্রহণ করেছেন, কারুকর্মের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেন নি। বরং মাঝে মাঝে সময় মনে হয় এঁরা প্রাচীন পন্থায় উপন্যাস রচনার পক্ষপাতী। বিমল কর, অসীম রায়, ননী ভৌমিক প্রমুখেরা উপন্যাস ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ, তাই বয়ঃকনিষ্ঠ যাঁরা (অর্থাৎ যাঁরা উপন্যাসজগতে অতি সাম্প্রতিক সময়ে উদিত হয়েছেন) তাঁদের উপন্যাস থেকে দু-একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করে দেখাবার চেষ্টা করব, এঁরা কিভাবে, কোন্ উপায়ে রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিত ও রবীন্দ্র-ঐতিহ্য বহন করছেন উপন্যাসে।

১। গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণ সময়-ব্যবহারে যে অভিনবত্বের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তাঁদের পথই অনুসৃত হয়েছে তরুণ ঔপন্যাসিকগণের রচনায়। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তৃতীয় ভুবন'—সময় প্রায় বারো ঘণ্টা, সুরজিৎ দাশগুপ্তর 'একই সমুদ্র'—সময় প্রায় চারদিন।

২। স্থানিক সীমাও এঁদের উপন্যাসে বিশেষ সঙ্কুচিত। মতি নন্দীর 'নক্ষত্রের রাত'—স্থান : কলকাতা। সীমন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্বিতীয় প্রহর'—স্থান : কলকাতা। জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অন্তর্লীনা'—

স্থান : কলকাতা। এ-বিষয়ে সুরজিৎ বসুর 'অবতামসী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের নায়ক একটি রুদ্ধকক্ষে আপন জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত করেছে।

৩। প্রকরণের দিকে এঁরা পূর্বসূরীদের পথ আরও প্রশস্ত করেছেন। সুরজিৎ দাশগুপ্তর 'একই সমুদ্র' ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তৃতীয় ভুবন' উপন্যাসে চেতনা-প্রবাহের সঙ্গে চলচ্চিত্রের মনটাজ, চিত্রশিল্পের ইম্প্রেশনিস্ট পদ্ধতি অতি সুন্দররূপে প্রযুক্ত হয়েছে। সীমন্তনারায়ণ, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য অতি সহজ মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সে-পদ্ধতিতে মিশ্রিত করেছেন প্রতীক উপন্যাসের ভাবানুষঙ্গ ও ভাষা। সুরজিৎ বসুর 'অবতামসী' উপন্যাসে নায়কের ভাষণে একটি নতুন পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। সে-পদ্ধতিতে আধুনিক আত্মগত ভাষণের সঙ্গে অবলীলাক্রমে মেশানো হয়েছে নাটকের স্বগত ভাষণ।

বস্তুত তরুণ ঔপন্যাসিকগণ রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হয়ে বাংলা উপন্যাসের নব-সম্ভাবনাকে নানা দিকে ফলফুলে বিকশিত করছেন। প্রাচীন তত্ত্ব অনুযায়ী বর্তমান উপন্যাসগুলির বিচার অচল, সে-কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আপন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাংলা উপন্যাসের সম্মুখে বৃহৎ সম্ভাবনার অর্গল উন্মোচিত করেন এবং সেই ধারায় উপন্যাসপ্রবাহ নানা পথ, বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে, কখনো বা অন্য নতুন ধারার সন্ধান দিয়ে সাম্প্রতিকতম কথাসাহিত্যের জন্ম দিয়েছে। অবশ্য তথাকথিত বাণিজ্যিক সাফল্যমণ্ডিত উপন্যাস অথবা প্রথিতযশা ঔপন্যাসিকদের নাম করছি না, কারণ তাঁদের রচিত উপন্যাস পূর্বতন তত্ত্বানুযায়ী তো নয়ই, এমনকি প্রাক্-বঙ্কিম কথাসাহিত্যের ধারায়ও আলোচিত হতে পারে না। 'চোখের বালি' উপন্যাস রচিত হবার পরই বাংলা উপন্যাসে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের জোয়ারের সূত্রপাত, কিন্তু অন্যান্য জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক প্রাচীন ও নবীন ধারার মধ্যে আপোস করে রবীন্দ্র-প্রবর্তিত নতুন ধারার গতি অন্য দিকে বহাতে চেষ্টা করেন। সেই সব ঔপন্যাসিকগণের দৃষ্টি বিশেষত বাণিজ্য ও জনপ্রিয়তার প্রতি নিবদ্ধ ছিল বলেই তাঁরা বাংলা উপন্যাসের নতুন সম্ভাবনার শ্রীবৃদ্ধি ঘটানর পরিবর্তে সমুদ্রকে বদ্ধ জলাশয়ে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু এই সব আপাতসফল ঔপন্যাসিকগণের সমান্তরালে কিছু সৎ এবং রসিক লেখক ছিলেন, যাঁরা অনায়াসে বুঝেছিলেন, রবীন্দ্র-প্রদর্শিত উপন্যাসধারাকে আরও স্রোতবতী এবং সমৃদ্ধময় করে তুলতে হবে, নচেৎ বাংলা উপন্যাসের ভবিষ্যৎ তিমিরময়। তাঁদের অনুসৃত পথেই কতিপয় তরুণ ঔপন্যাসিক বাণিজ্যিক সাফল্য ও জনপ্রিয়তার সস্তা, সহজ পথ হেলায় তুচ্ছ করে বেছে নিয়েছেন কঠিন, কণ্টকময় পথ; যাঁর প্রথম পথিক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের 'সে'

গুরুদাস ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের 'সে' একটি অভিনব ও অনুচ্চারিত রচনা। প্রথম প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৪৪। নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে বইটি লেখা নয়। ন বছরের নাতনীকে গল্প বলে শোনাচ্ছেন সত্তর বছরের দাদু। হালকা চালে অকুণ্ঠিত গদ্যবাহনে গল্প এগিয়ে চলেছে একটা থেকে আরেকটায়। শুধু দাদু নয়, নাতনীও কখনও কখনও কথক, বেশির ভাগ সময়ে প্রশ্নকর্তা, আর কথা বলে স্বনামখ্যাত ও বহুবিতর্কিত 'সে'। কথার স্রোতে ছলকে ওঠে শব্দের স্ফুলিঙ্গ, টুকরো কথার ঝলক—কমলহীরের আলো নয়, ইস্পাতের দীপ্তির মতো অনবরত ধাক্কা দিতে থাকে মনে। গল্পের সাজ সাজ কখনও নাটকীয় সংলাপ, কখনও গল্পের আলপনা, কখনও বা নিছক বর্ণনা; সেইসঙ্গে মাঝে-মধ্যে টীকা-ভাষ্যের এলোমেলো আলোচনা। আর আছে, সহযোগী কবিতা এবং সহমর্মী ছবি—স্কেচ ও পেন্টিং দুই। রাবীন্দ্রিক ছবির ভাষা তো নতুনই, এখানকার গদ্য ও কবিতা দুয়েরই ভাষা অরাবীন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে ভাষার (বিশেষ গদ্যের) যে বিবর্তিত-বিবিধ রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার কোনোটির এর সঙ্গে মেলে না। অদ্ভুত তির্যক ভাষা, অনেক ক্ষেত্রে শব্দও বিচিত্র। এর কোথায় যে কৌতুক, আর কোথায় যে গাম্ভীর্য, খুঁজে পাওয়া যায় না। দুটোই মিশে আছে অভেদ মিত্রতায়। গল্পের বাইরে আছে তিনজন: দাদু, পুপুদিদি, আর 'সে' (এবং পুপুদিদির সহপাঠী সুকুমারও)। গল্পের ভেতরে আছে নানান জাতের ও ধাঁচের অসংখ্য মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণী। তাদের অনেককে চিনি না, কাউকে-কাউকে চিনি, চেনা আর না-চেনা মিশিয়েও আছে কয়েকজন। মোট চোদ্দটি অধ্যায়।

'সে'-র গল্প ও বর্ণনাগুলি ন বছরের নাতনীর কাছে পেশ করা হয়েছে কথ্য ভঙ্গিতে, হালকা সুরে এবং স্থানে-স্থানে শিশুসুলভ চপল সরলতায়। তবু 'সে' নাবালকদের পাঠ্য নয় এবং সাবালকদের কাছেও অধিকাংশ

দুর্বোধ্য। সরলতা এর বহিরঙ্গ মুখোশ, অন্তরঙ্গ স্বভাবে গ্রন্থটি জটিল, আধুনিক মানসকূটের চেয়েও জটিল। তাই পাঠক ও সমালোচকের কাছে 'সে' অবহেলিত—অশ্রদ্ধার নয়, দুর্বোধ্যতার বেধগভীরতায়। এ-সম্পর্কে লেখক নিজেও সচেতন ছিলেন। বইয়ের মধ্যে একাধিকবার রচনার সংজ্ঞা দিয়েছেন "আজগবি গল্প" এবং বাগভঙ্গিকে বলেছেন: "অসম্ভব গল্প বলার হালকা চাল"। এতেও বোধ হয় তাঁর কুণ্ঠা কাটে নি, তাই উৎসর্গে আবার বলেছেন, বইটি "সমাজহারানো লক্ষ্মীছাড়া"···"শূন্যমাঠে তুচ্ছ ফুল", এবং আরও পরে সসংকোচ বিনয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন:

এমন কি আছে কেউ যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে—
যার কোনো দাম নেই
নাম নেই,
অধিকারী নাই যার কোনো,
বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয় নি কখনো॥

মায়ের অনেক সুন্দর ছেলে-মেয়ের মধ্যে একটি যদি অসুন্দর হয়, তবে তাঁর যে কুণ্ঠা ও সংকোচ জেগে ওঠে, এই বইটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবও অনেকটা সেই জাতীয়। অথচ এর কোনো প্রয়োজনই ছিল না। 'সে' প্রতিভার বিচিত্র ও সাময়িক খামখেয়াল এবং সেইজন্যেই দুর্বোধ্য—এই অর্থে যদি চিহ্নিত ও অবহেলিত হয়ে থাকে, তবে সে ত্রুটি রবীন্দ্রনাথের নয়, আমাদেরই। একথা অবশ্য ঠিক যে, ভাষা ও ভঙ্গির অভিনবত্বে বইটি দুর্গম, প্রায় সাম্প্রতিক অ্যাবসট্র্যাকট আর্টের মতো; এবং দুর্বোধ্যতা সাহিত্যের আর্টের যথার্থ লক্ষণ নয়। কিন্তু অ্যাবসট্র্যাকট আর্টের রসাস্বাদনেও তো বাধা জন্মাচ্ছে না, বলা বাহুল্য যদি সে যথার্থ আর্ট হয়। তাছাড়া মানুষের কাছে দুর্গম বলে তো কিছু নেই আজ। অগম্য বলে যাকে জানতাম সেই আকাশের ওপারের আকাশেও মানুষ আপন স্বাক্ষর রেখেছে; তেমনি মানুষ আবিষ্কার ও উদঘাটন করে চলেছে মানসের ও সাহিত্যের গূঢ়তম প্রতীক ও সাংকেতিক ব্যঞ্জনাকেও। 'সে' সেই দূরতম গূঢ়তম চেতনলোকের ফসল। ভাষা ও ভঙ্গির অভিনবত্ব পেরিয়ে তার অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারলে প্রথমেই সবিস্ময় প্রশ্ন মনে ভেসে ওঠে—বইটি কি সত্যিই বৃদ্ধ বয়সের খেয়ালখুশির হালখাতা?

প্রশ্ন নিয়ে আসে উত্তর। অন্দরমহলের যত ভেতরে যাওয়া যায়, সামনে একে-একে ফুটে ওঠে বিচিত্র দৃশ্য। মানুষ আর প্রাণী, টুকরো টুকরো ছবি-গান—সব মিলিয়ে যেন অখণ্ড রূপ নিতে থাকে, অচেনা-অজানাকেও তখন অপরিচিত মনে হয় না। বইটি গল্পের নিয়মে পরিকল্পনা করে লেখা নয়, এলোমেলো গল্পিকার ভীড়; কিন্তু একটি বিশেষ মন নিয়ে লেখা, হয়তো কবির অজ্ঞাতসারেই। সত্তরের সীমান্তে পৌঁছনো সেই মন বহুদর্শী, বহুপাঠী, অনুশীলিত এবং সুশৃংখল চিন্তার অধিকারী। তাঁর অবচেতন মনও বিশৃংখল নয় (শুধু তাঁর একার নয়; এমন না হলে দুনিয়ার অনেক ভালো কবিতাই অর্থহীন শব্দের স্তূপ হয়ে উঠত)। তাই কবি না চাইলেও, না জানলেও, এর এলোমেলো ভীড়ের মধ্যে একটি সুবিহিত পরিকল্পনার আভাষ যেন পাওয়া যায়। এক সুতোয় না হলেও এক ক্ষেত্রে আনা যায় গল্পের জনতাকে। তখন সবগুলির মধ্যে একটি অলিখিত সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। মনে হয়, এই না-বলতে-চাওয়া অস্পষ্ট অসজ্জিত কথাগুলির ভেতরে একটি নির্দিষ্ট বক্তব্যও বোধ হয় জড়িয়ে আছে। ছবির মধ্যে যেমন একটি মানুষ বা বস্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে কেটে বাদ দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ইমপ্রেশনিস্ট রীতিতে, দর্শক সেগুলিকে মনে মনে জুড়ে নিয়ে সেই অনুভূতির আলোকে তাদের আবার আলাদা-আলাদা করে দেখে নতুন রসের স্বাদ পান, তেমনি এই গ্রন্থের মধ্যেও কবির বক্তব্যের ভগ্নাংশ ছড়িয়ে আছে ইতি-উতি, তাদের মনে-মনে জুড়ে নিয়ে তারপর আবার এলোমেলোভাবে যেমন আছে তেমনি ছড়িয়ে রেখে দেখলে নতুন রসের আস্বাদন পাওয়া যাবে। 'সে' রবীন্দ্রনাথের ইমপ্রেশনিস্ট সাহিত্য। তার বিচ্ছিন্ন প্রকরণগুলি স্বতন্ত্র করে একবার দেখা যেতে পারে। তা থেকে যদি কোনো বক্তব্যে উপনীত হতে পারা যায় ভালো, না হলেও ক্ষতি নেই, আর্টের স্বাদ তো পেতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিতে গ্রোটেস্ক বা কিম্ভূত রসের লক্ষণটাই সবচেয়ে বড়। এই কিম্ভূত রচনার মূলে যেমন কবির স্বগত শিল্পদৃষ্টি, তেমনি আদিম শিল্পরীতিরও প্রভাব; ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যাকে বলেছেন, "আধুনিক কালের প্রিমিটিভ কলা"। এই প্রিমিটিভ গ্রোটেস্ক আর্টের দৃষ্টান্ত 'সে'; ছবিতে যাকে পেয়েছি রেখায়-রঙে, এখানে তাকে পাই কথার ছবি ও ছন্দে। এই গ্রোটেস্ক-এর অন্যতম লক্ষণ—অসঙ্গতি ও বলিষ্ঠতা। যেমন

রবীন্দ্রচিত্রকলায়, তেমনি এখানেও কথিকাগুলি স্বভাব-অসম্মত, কলমের টানও কম বলিষ্ঠ নয়। এই গ্রোটেস্ক রীতি ও রসকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, অদ্ভুতত্ব: "বিশ্বাস করবার অতীত যা তাকেও বিশ্বাস করবার যোগ্য করতে পার যদি তা হলেই অদ্ভুত রসের গল্প জমে। নেহাত বাজারে-চলতি ছেলে-ভোলাবার সস্তা অত্যুক্তি যদি তুমি বানাতে থাক তাহলে তোমার অপযশ হবে।" এই শেষ উক্তিটিই প্রমাণ করে এই বইতে কবি যথেচ্ছ মানসবিহার করতে চান নি, সুবিহিত আর্টের বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণ থেকেই মানস-বক্তব্য পেশ করতে চেয়েছেন। সেই আর্ট গ্রোটেস্ক।

এই গল্পিকাগুলির সঙ্গে পুরনো ছেলে-ভোলানো ছড়ার একটা সাদৃশ্যও মাঝে-মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তাদের অসামঞ্জস্যের উল্লেখ করেছেন এবং প্রায়-সমকালে 'ছড়া' নামে কাব্যগ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। সেখানেও পুরনো ছড়ার কাছাকাছি কবিতাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা রয়েছে। যাকে তিনি বলেছেন "পাগল বস্তুর দল"। কিন্তু সেকালের ছড়ার অনেকখানিই যেমন শৈশব ও সরল কল্পনার বস্তুহীন ফসল, একালের ছড়া তা নয়। 'সে'-র কাহিনীগুলিকে পুরনো ছড়ার সামিল তাই বলা চলে না, নিকট-সাদৃশ্য সত্ত্বেও "যে মোষ কোথাও নেই সেই মেষ তাড়ানো"—এমন উদ্ভট কল্পনা এখানে অনুপস্থিত। কবি তাই অন্যত্র একে নাম দিয়েছেন "বৈজ্ঞানিক রসিকতা", যাকে ছেলেমানুষির বিপরীত শব্দরূপে ব্যবহার করেছেন। বীক্ষণাগারে বৈজ্ঞানিক যেমন বিভিন্ন পদার্থের সমবায়ে পরীক্ষায় রত হন এবং যতক্ষণ না লক্ষ্যে উপনীত হন ততক্ষণ তাঁর পরীক্ষাগুলি বিচিত্র রূপ নিতে থাকে, তেমনি যেন এখানকার বক্তব্যও। লক্ষ্যে উপনীত নয়, ঐ বিচিত্র পরীক্ষাই কবির উদ্দেশ্য, তাতেই তাঁর আস্বাদন। সে যাই হোক, ইমপ্রেশনিজম বলি, গ্রোটেস্ক বলি, অথবা শব্দ-ধ্বনি-ছবি নিয়ে বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষাই বলি, সব মিলিয়ে যা দাঁড়িয়েছে, তা হল অদ্ভুত রস। শুধু 'সে' নয়, চার বছর পরে লেখা 'গল্পসল্প', 'প্রহাসিনী', 'ছড়া' ও 'খাপছাড়ার' মধ্যেও এই অদ্ভুত রসের সিঞ্চন লক্ষণীয়। কবি একে আর্টের একটি হাতিয়ার হিসেবেই প্রয়োগ করতে চেয়েছেন, নইলে একটি গ্রন্থেই অদ্ভুত রসের জীবনান্ত হত। এই রসদৃষ্টিতে 'সে' গ্রন্থের আস্বাদন করতে হবে। অনেক নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত:

"স্মৃতিরত্নমশায় মোহনবাগানের গোল-কীপারি করে ক্যালকাটার কাছ

থেকে একে একে পাঁচ গোল খেলেন। খেয়ে খিদে গেল না, উল্টো হল, পেট চোঁ চোঁ করতে লাগল। সামনে পেলেন অকটর্লনি মন্থমেণ্ট। নিচে থেকে চাটতে চাটতে চুড়ো পর্যন্ত দিলেন চেটে। বদরুদ্দিন মিঞা গোলেন্-হলে বসে জুতো সেলাই করছিল, সে হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। বললে, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এত বড়ো জিনিসটাকে এঁটো করে দিলেন! 'তোবা তোবা' বলে তিনবার মন্থমেণ্টের পায়ে থুথু ফেলে মিঞাসাহেব দৌড়ে গেল স্টেটসম্যান-আপিসে খবর দিতে।

স্মৃতিরত্নমশায়ের হঠাৎ চৈতন্য হল, মুখটা তাঁর অশুদ্ধ হয়েছে। গেলেন ম্যাজিয়ামের দরোয়ানের কাছে। বললেন, পাঁড়েজি, তুমিও ব্রাহ্মণ আমিও ব্রাহ্মণ, একটা অনুরোধ রাখতে হবে। পাঁড়েজি দাড়ি চুমরিয়ে মিয়া সেলাম করে বললে, কোমা ভু পোর্তে ভূ সি ভূ প্লে? পণ্ডিতমশায় একটু চিন্তা করে বললেন, বড়ো শক্ত প্রশ্ন, সাংখ্যকারিকা মিলিয়ে দেখে কাল জবাব দিয়ে যাব। বিশেষ আজ আমার মুখ অশুদ্ধ, আমি মন্থমেণ্ট চেটেছি।

পাঁড়েজি দেশলাই দিয়ে বর্মা চুরুট ধরালো। দু-টান টেনে বললে, তা হলে এক্ষুনি খুলুন ওয়েবস্টার ডিকসনারি, দেখুন বিধান কি। স্মৃতিরত্ন বললেন, তা হলে তো ভাটপাড়ায় যেতে হয়।"

ছোট্ট একটি কথিকা, একটা গল্পের আভাসও আছে; মন্থমেণ্ট, গোলদীঘি হল, ওয়েবস্টার, ভাটপাড়া—সবই আমাদের পরিচিত। অথচ সব এলোমেলো করে দেওয়া, অসম্পূর্ণ করে আঁকা, অসম্ভব বৈসাদৃশ্যে ও অসামঞ্জস্যে জুড়ে দেওয়া অনাত্মীয় টুকরো ছবিদের; তার মাঝে ফরাসী ভাষার একটু প্যারডিও। সব মিলে একটা সুষমিত বক্তব্য হতে পারে নি, কিন্তু হয়তো একটা ছবি নিশ্চয়ই হয়েছে। সেই ছবিটাই কবির বক্তব্য। মনের বল্গা ছেড়ে দিয়ে এলোমেলো ভাবতে আমরা ভয় পাই কিন্তু ভালোও তো বাসি। শিল্পী তাই অমিত্র অনুসঙ্গদের পাশাপাশি সাজিয়ে দিয়েছেন, তারা বাঁধা বেঁধে কোনো-একটিমাত্র ভাব ফুটিয়ে তুলছে না, দিচ্ছে বেজোড় বহুবিচিত্র একটা ময়ূরকণ্ঠী আভাস। ঐ বহু-বৈচিত্র্যই কবির খেলা, তা থেকে জন্মাই হচ্ছে অদ্ভুত রস। অদ্ভুত নবরসের অন্যতম, অসঙ্গতিই তার একমাত্র লক্ষণ। সেই অসঙ্গতি এই জাতীয় কথার ছবিতে। পড়তে-পড়তে অর্থের সন্ধান নাইবা করলাম। বাংলা নাটকের বিদূষককে দেখে আমরা যেমন

আনন্দ পাই, হেসে উঠি তার অসঙ্গত আচরণে, যার সঙ্গে এমনকি নাটকেরও কোনো যোগ নেই, তেমনি সরস আনন্দ 'সে'-র এই অদ্ভুত কল্পনার সুষম বৈষম্যেও উচ্ছলিত হয়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য, গ্রোটেস্‌ক বা ইমপ্রেশনিস্ট আর্ট—কোনোটাই হাসির নয়। কিন্তু আদিম কিম্ভূত মূর্তি দেখে আমরা হাসিও তো। আদিমরা হাসত না, আজকের লোকায়ত স্তরের মানুষও হাসে না। কিন্তু গণেশের এক নাম ছিল 'অকালকুষ্মাণ্ড', একথা শুনে আমরা গম্ভীর থাকতে পারি না। মূর্তির তো কথাই নেই। তার কারণ আমাদের কাছে ওরা অসঙ্গতির অনুভূতি নিয়ে আসে। সেই অনুভূতিই এখানে অদ্ভুত রসের জোগানদার এবং তা হাস্যমুখর। স্মৃতিরত্নের মন্থমেণ্ট চাটার খবরে যার শুরু, ডিকসনারির সন্ধানে ভাটপাড়ায় যাওয়ার পরেও তা অশেষ। বিসদৃশ ও বিপরীতকে কাছাকাছি এনেছেন কবি সাহিত্যে অদ্ভুতত্ত্বের সংস্কার করতে, যার পদ্ধতিটি হচ্ছে: "আঙুল দিয়ে না লিখে গণেশের শুঁড় দিয়ে লম্বা চালে বাড়িয়ে লেখা। যেটাকে যেরকম জানি সেটাকে অন্যরকম করে দেওয়া। অত্যন্ত সহজ কাজ!"

অন্যরকম করে দেওয়া তথা অসমঞ্জসকে সামঞ্জস্যের আদল দেওয়া সহজ কাজ মোটেই নয়। তাহলে সবাই অবন ঠাকুরের মতো ছবি লিখতে পারতেন। তাই কবিকে পরিশ্রম করতে হয়েছে, হিসেব করে শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করতে হয়েছে, যেটা যেমন তাকে অন্যভাবে অথচ কলাসম্মতিতে রূপান্তরিত করতে হয়েছে। হাসির কবিতায় তিনি ব্যবহার করেছেন মৌশল-রাঁধুনিক-চামোড়া, তার চেয়েও বিচিত্র শব্দ এখানে পাই: কচুরিপানা-ধ্বংসন, ইক্ষুছিবড়ে, শ্রীল্যাজ, আঁচাড়ি শিরোমণি. হাঁচিয়েন্দানি কোরুক্সুনা ইত্যাদি। কিন্তু শব্দতত্ত্বই এর একমাত্র শক্তি নয়, সহজ শব্দ এমনকি চলতি ঘরোয়া শব্দ কবি এখানে ব্যবহার করেছেন, কৌশলটুকু তাদের সাজানোর মধ্যে। চেহারা হারিয়ে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে নিজের দেহকে, বটগাছতলায় পাতুখুড়ো গাঁজা খেয়ে শিবনেত্র: "মনে হল, তার প্রাণপুরুষটা বিন্দু হয়ে ব্রহ্মতালুর চুড়োয় এসে জোনাক-পোকার মতো মিটমিট করছে। বুঝলুম, হয়েছে সুযোগ, নাকের গর্ত দিয়ে আত্মারামকে ঠেসে চালিয়ে দিলুম তার দেহের মধ্যে, নতুন নাগরা জুতোর ভেতরে যেমন করে পা'টা ঠেসে গুঁজতে হয়। সে হাঁপিয়ে উঠে ভাঙা গলায় বলে উঠল, কে তুমি বাবা, ভিতরে

জায়গা হবে না। তখন তার গলাটা পেয়েছি দখলে, বললুম, তোমার হবে না জায়গা, আমার হবে। বেরোও তুমি। সে শোঁ শোঁ করতে করতে বললে, অনেকখানি বেরিয়েছি। একটু বাকি। ঠেলা মারো। দিলুম ঠেলা, হুস করে গেল বেরিয়ে।

এদিকে পাতুখুড়োর গিন্নি এসে বললে, বলি, ও পোড়ারমুখো। কান জুড়িয়ে গেল।"

সাজানোর কৌশলে চেনাজানা শব্দরাও নতুন অর্থে স্নান করে উঠেছে। কবি যাকে বলেছেন "কথার ফড়িং", গল্পসল্পের মধ্যেও তারা অজস্র: আন্‌তারা, ফুস্‌কলিয়ে, হুড়্‌মুকি, ভিরভ্রিংগট্ট, ভোরন্তোল, তিড়িতঙ্ক, পাঁজঞ্জুরি। জানিত শব্দকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে ব্যবহার করা (যেমন: অন্তর-আন্‌তারা, পাঁজর-পাঁজঞ্জুরি)। কিন্তু বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গিই 'সে'-র (ও 'গল্পসল্প'-এর) অদ্ভুত রসের বাহন। স্মৃতিরত্নমশায়ের কাহিনী তার সাক্ষ্য। তা থেকে আর একটু এগোলে পাই: "তাসমানিয়াতে তাসখেলার নেমন্তন্ন ছিল, যাকে বলে দেখা-বিন্‌তি। সেখানে কোজ্‌মাচকু ছিলেন বাড়ির কর্তা, আর গিন্নির নাম ছিল শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুঞ্জুনা! তাঁদের বড়ো মেয়ের নাম পাম্‌কুনি দেবী, স্বহস্তে রেঁধেছিলেন জিন্টিনাবুর মেরিউনাথু, তার গন্ধ যায় সাত পাড়া পেরিয়ে। গন্ধে শেয়ালগুলো পর্যন্ত দিনের বেলা হাঁক ছেড়ে ডাকতে আরম্ভ করে নির্ভয়ে, লোভে কি ক্ষোভে জানি নে; কাকগুলো জমির উপর ঠোঁট গুঁজে দিয়ে মরিয়া হয়ে পাখা ঝাপটায় তিন ঘণ্টা ধরে।"

কিন্তু 'সে'-র সব বর্ণনাই এমন নিরীহ নিরপেক্ষ নয়। অদ্ভুত অসঙ্গতির আশ্রয়ে ব্যঙ্গের ব্যঞ্জনাও প্রকাশ পেয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক এবং তথাকথিত বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আদৌ নিরপেক্ষ নয়। দন্তুর সভ্যতার বিদ্রূপাত্মক ইঙ্গিত বলে যদি নিচের অংশটাকে মনে করি, তাহলে বোধ হয় খুব ভুল হবে না: "তোমার বাঘ কী করে।...রাত্তিরে যখন শুয়ে থাকি বাইরে থেকে ও জানলা আঁচড়ায়। খুলে দিলেই হাসে।...তা হতে পারে, ওরা খুব হাসিয়ে জাত। ইংরেজিতে যাকে বলে হিউমরাস। কথায় কথায় দাঁত বের করে।" টীকা নিষ্প্রয়োজন, সঙ্গের দন্তবিকশিত ছবিটিতে বক্তব্য স্পষ্টতর হয়েছে।

তা বলে 'সে' ব্যঙ্গাত্মক রচনাও নয়। এর নিতল তলে সেই সত্য হিউমার আছে, যা দন্তুর নয়, যেখানে হাসি-কান্না একই ধারায় বয়ে গেছে

অন্তঃসলিলা ফল্গু হয়ে। অদ্ভুত রসের মধ্যেও জমে উঠেছে করুণ রস, সমস্ত হইয়ের চরণে-চরণে যার আবির্ভাব হয়তো অভাবিত মনে হবে। গল্পগুলির পশ্চাৎপটে দরদী কবিমনকে সহজেই স্পর্শ করা যায়। তাই এগুলি নিছক উদ্ভট গল্প নয়, তার চেয়েও কিছু বেশি। রচনার উপসংহার সুকুমারঘটিত সকরুণ বেদনায়।

প্রথমেই চোখে পড়ে ফ্যাণ্টাসী বা রূপকথার আদল। রূপকথায় যেমন সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা লুপ্ত, এখানেও তেমনি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি কাহিনী। একটি: স্বশরীর হারিয়ে সে-র ব্যাকুলতা, গা খোঁজার জন্যে ছুটোছুটি, শেষে পাতুখুড়োর দেহে প্রবেশ এবং পাতুখুড়োর গিন্নি, পাতুখুড়ো ইত্যাদি মিলে সমস্ত ব্যাপারটা আদালতে গিয়ে পৌঁছল, পাতুখুড়ো ফিরে পেল দেহ আর খুড়িকে। হলফ করে বলতে হল: "উনিই আমার প্রথম পক্ষের পরিবার। সাহেব জিগেস করলেন, আরও আছে নাকি। পাতু বললে, না থাকলে মান রক্ষা হয় না যে। কুলীনের ছেলে। নৈকষ্যকুলীন।"—এই শেষ কথাটুকুতে বাস্তবের খোঁচা আছে, পুপুর সহপাঠী সুকুমারের গল্পে তাও নেই। পুপুদিদির কাল্পনিক হারিয়ে যাওয়া এবং ছাতাকে পক্ষীরাজ করে সুকুমারের শূন্যে ওড়ার চেষ্টা—এই প্রসঙ্গে এলিসের কথা মনে পড়ে। সুকুমারের ট্র্যাজেডি লঘুকে দিয়েছে গুরুত্ব।

রূপকথা পেরিয়ে চুপকথায় কবি গেছেন গানের সুরে সুরে। কিন্তু এখানে তিনি নেমে এসেছেন সরাসরি মাটির জগতে। কারণ সুকুমারের বাহন রাতের বেলা পক্ষীরাজ হয় বটে, দিনের বেলা সে নেহাতই এক ভাঙ্গা ছাতা। সেই ছাতার মালিক মানুষ। এই মানুষের কথা নিয়েই 'সে'। তাই গোড়াতেই বলে দিলেন, "লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে"। অনেক গল্প শুরু হয় "এক যে ছিল রাজা" দিয়ে, "আমি আরম্ভ করে দিলুম, এক যে আছে মানুষ"। সে কেমন মানুষ? কবির স্বপ্নলোকের? না, সে গল্পও নয়: "সে মানুষ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল না। একদিন রাত্রি দশটার পর এল আমার ঘরে।" এই যে "এক-যে-আছে-মানুষ তার আর শেষ নেই। তার দিদির জর হয়, ডাক্তার ডাকতে যায়। টমি কুকুর আছে। বেড়ালের নখের আঁচড় লেগে তার নাক যায় ছড়ে।" ইত্যাদি। প্রাত্যহিক জীবনে যে সব মানুষকে দেখি চারপাশে, তাদেরই ছবি কবি এঁকেছেন সামান্য বা অসামান্য হের-ফের করে; যেমনটি, তার অন্যরকম

করে। তবু অন্তরূপের মধ্যে স্বরূপ সর্বাংশে চাপা পড়ে না। জানি না, কবি এক্ষেত্রে কতটা সচেতন ছিলেন, কিন্তু যে ছবি তিনি এঁকেছেন, তা চেনা-জানা মানুষের, সেই মানুষের জানা-অজানা বিবিধ সমস্যার।

'সে'-র চরিত্রগুলি এত সজীব যে গল্পের আবরণের মধ্যে থেকেও জানান দেয়, তারা লেখকের কাছের দেখা মানুষ। সুকুমারের মধ্যে বালক-রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়, যদিও অন্যজন বললেও আপত্তি করার কোনো কারণ নেই। বনমালী, পুত্তুলালদের সহজেই চেনা যায় "ভৃত্যরাজকতন্ত্রের" সদস্য হিসেবে। পুপু কবির পৌত্রী নন্দিনী। নিউমার্কেট ও বোলপুর স্টেশনের নামোল্লেখও 'সে'-র পরিচিত জগতের সাক্ষ্যবহ। গল্পের মধ্যে অদ্ভুত চরিত্র বলে যাদের জানি, চারিত্রিক অসঙ্গতি সত্ত্বেও তাদের মানবিক রূপ অস্পষ্ট থাকে না। যেমন, 'পুনশ্চ' কাব্যের ছেলেটা, লোকটা বা সহযাত্রী অদ্ভুত ধরনের মানুষ, তেমনি এখানকার চরিত্রগুলিও। যেমন ধরা যাক মাস্টারমশায়ের কথা। 'গল্পসল্প'-এর বিজ্ঞানী নীলমণির মতো এই মাস্টারমশায়ও জীবন্ত। তাঁর মাধ্যমে কবি আধুনিক শিক্ষারীতির সমালোচনাও করেছেন। মাস্টারমশায় গতানুগতিক রীতির বিরোধী ছিলেন, ছেলেদের পড়ার দায়িত্ব তাদের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন, যাতে অধ্যাপনাকে কখনও নামতে না হয় প্রহরার কাজে। তিনি বলতেন: "পড়াচ্ছি যদি না ভুলি তবে পড়াতে পারতুম না, নিছক মাস্টারিই করে যেতুম।···আমার পড়ানো চলে মেঘের মতো শূন্য দিয়ে, বর্ষণ হয় নানা খেতে। ফসল ফলে খেত অনুসারে। অসম্ভবকে নিয়ে ঠেলাঠেলি করে সময় নষ্ট করি নে বলে হেডমাস্টার হন ক্ষাপা।" বৈজ্ঞানিক নীলমণিবাবুর মতো মাস্টারমশায় কবির প্রিয় (নিজেকে ওঁদের "সমজদার বন্ধু" বলেছেন), "তিনি অদ্ভুত ছিলেন, কিন্তু খাঁটি অদ্ভুত।" বিশেষত মাস্টারমশায়ের আয়নায় শিক্ষক-রবীন্দ্রনাথকে বারেবারে চোখে পড়ে।

প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ নারীর স্থান নির্দেশ করেছিলেন সংসারে, জায়া ও জননীত্বে; শেষ পর্বে তার মুক্তি কামনা করেছেন এই গণ্ডী থেকে এনে ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বই যে নারীর প্রথমতম ধর্ম, এ সত্য স্বীকার করেছেন (১৩৩৫ সালে লেখা প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য)। তবে সকল অবস্থাতেই নারীর কল্যাণী রূপের জয়গান করেছেন এবং পুরুষের ওপরেই তাকে স্থান দিয়েছেন অধিকার ক্ষেত্রে (এই ভাবনারই চূড়ান্ত রূপ বোধহয় 'ল্যাবোরেটরি'র সোহিনী)।

'সে'-র একজায়গায় রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিতত্ত্বের বিচিত্র বর্ণনা দিয়েছেন—তাতে পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বিজ্ঞানের তত্ত্ব মিলিয়ে এক অপরূপ অসমঞ্জস তথ্যের আমদানি করা হয়েছে সচেতন ইচ্ছায়। সৃষ্টির আদিতে জল, তার দোলা নিয়ে জাগল নারী: "নারী জাতটা বিশুদ্ধ জলীয়; তার কাঠিন্য নেই, চাঞ্চল্য আছে, চঞ্চল করেও।" তখন পৃথিবীতে ছিল সুরুচি, কোমলতা, সৌন্দর্য, লালিত্য। তারপর এল দিনবদলের পালা, "বিধাতার পৌরুষ প্রকাশ পেল ডাঙায়; পুরুষের স্বাক্ষর পড়ল সৃষ্টির শক্ত জমিতে।" জাগল মাটি, সেই সঙ্গে এল "দুর্জয়শক্তিমান বেসুর প্রবাহ", এবং মলিনতা "ভুরিপরিমাণে···প্রবলবেগে।" তার জের আজও চলছে। সৃষ্টিতত্ত্ব উপলক্ষ, এর মাধ্যমে যা প্রকাশ পাচ্ছে, তা নারী-পুরুষ সম্পর্কে কবির নিজস্ব মনোভাব, যার প্রতিধ্বনি 'প্রহাসিনী'র হালকা চালের কবিতাতেও শোনা যায়। বিশেষত 'নারীর কর্তব্য' কবিতায়:

তবু আজও রক্ষা আছে, পবিত্র এ দেশে
অসংখ্য জন্মেছে মেয়ে পুরুষের বেশে!
মন্দির রাঙায় তারা জীবরক্তপাতে,
সে-রক্তে ফোঁটা দেয় সন্তানের মাথে!
কিন্তু, যবে ছাড়ে নাড়ী
ভিড় করে আসে দ্বারে ডাক্তারের গাড়ি!···
···মেয়েদের বুদ্ধি নিয়ে পুরুষ যখন ঠাণ্ডা হবে,
দেশখানা রক্ষা পাবে তবে!

সামাজিক অসঙ্গতির ছবিও 'সে'-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'গেছোবাবা' নামে একটি বানরকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করার হাস্যকর কাহিনী। ইদানীং আমাদের দেশে ধর্মবৃক্ষবিহারী এমন অনেক গেছো বাবার ভীড় বেড়ে গেছে, যাঁদের পদতলে পঙ্কু-গোবরা-উধোর মতো অজ্ঞ ও নিরীহ মানুষ সভক্তিতে সর্বস্ব সমর্পণ করে এবং সকাতরে প্রার্থনা করে: "বাবা ঐ কপিরূপ ধরে এসেছেন আমাদের ভোলাবার জন্যে।···যত পার মুখ ভ্যাঙাও, নড়ছি নে—তোমার ঐ শ্রীল্যাজের শরণ নিলুম"। আর একটি বিচিত্র চিত্র "শিবাশোধন সমিতির রিপোর্ট"। হৌ হৌ শেয়াল এল মানবসমাজে, পণ—"মানুষ হব"। তার নাম বদলিয়ে রাখা হল শিবুরাম, নাপিতের ক্ষুরে তার ল্যাজ গেল, দেহের ওপরের লোম গেল, তাকে মানুষের মতো সোজা করার

নানা কায়-কল্প করা হল, তার মনের কথা কেউ জানল না, সেখানে ল্যাজ-হারানোর অসহ বেদনা। শেষে এক রাতে সঙ্গীদের হুক্কা হুয়া ডাকে বেরিয়ে পড়ল মানবসমাজ ছেড়ে। কিন্তু শৃগাল-সমাজেও ঠাঁই হল না। পথে-পথে শিবুরাম তথা হৌ-হৌ কেঁদে বেড়াতে লাগল, "আমার ল্যাজ কই, আমার ল্যাজ কই"। কথিকাটিকে নানা অর্থের ভাষ্যে উজ্জ্বল করা যেতে পারে। বাঙালী পাঠক-পাঠিকা 'কথামালা'র গল্প পড়েছেন, প্রত্যেকেই মনোমত অর্থ করে নিতে পারেন। লক্ষণীয় এর তীব্র ব্যঙ্গটুকু, মানুষ করে তোলার নিরঙ্কুশ ব্যবস্থাপত্রে যার যাবতীয় বিধান, শুধু যার মধ্যে নেই মানবতা! মনে পড়ে 'অচলায়তন' নাটক, এবং 'রক্তকরবী'র মতো আরেক গোঁসাইজীও এখানে আছেন, শিবুরামের সঙ্গে যার সাদৃশ্য টানা হয়েছে। কবি নিজেও বলেছেন একে "আগাগোড়া ব্যঙ্গ", পরমুহূর্তেই সামলে নিয়েছেন "প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামি" বলে। আর একটি কথিকা—'বাঘ'। বাঘের গল্প বাঘের নয়। কিসের, তা নিচের উদ্ধৃতির দ্বীপাবলী থেকেই স্বতঃপ্রকাশ: "ওরা কখনো চাষী কৈবর্তর মাংস খায় না; বিশেষত যারা গঙ্গার পশ্চিম পারে থাকে। শাস্ত্রে বারণ। আর যারা পূব পারে থাকে? তারা যদি জেলে কৈবর্ত হয় তো সেটা অতি পবিত্র মাংস। সেটা খাবার নিয়ম বাঁ থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে। বাঁ থাবা কেন? ঐটে হচ্ছে শুদ্ধ রীতি। ওদের পণ্ডিতরা ডান থাবাকে নোংরা বলে।…না খেয়ে মরা ভালো কিন্তু মরে না খেয়ে বেঁচে থাকা যে বিষম দুর্গ্রহ।…ইংরেজের ভূত তাহলে খেতে পায় কী করে? তারা বেঁচে থাকতে যা খেয়েছে তাতেই তাদের সাতজন্ম অমনি চলে যায়। আমরা যা খাই তাতে বৈতরণী পার হবার অনেক আগেই পেট চোঁ-চোঁ করতে থাকে।…বাঘরা যদি এতই ধার্মিক হবে তাহলে জীবহত্যে করে কাঁচা মাংস খায় কী করে। সে বুঝি যে-সে মাংস! ও-যে মন্ত্র দিয়ে শোধন করা। কিরকম মন্ত্র? ওদের সনাতন হালুম-মন্ত্র। সেই মন্ত্র পড়ে তবে ওরা হত্যা করে। তাকে কি হত্যা বলে!…বাঘেদের বুঝি ভারি অহংকার? ভয়ংকর। সেইজন্যেই তো ওরা এত করে জাত বাঁচিয়ে চলে।…আধুনিক বাঘেদের মধ্যে ভারি একটা কাণ্ড চলছে—যাকে বলে প্রগতি, প্রচেষ্টা। ওরা বলছে, আজ থেকে আমরা যাকে পাব, তাকেই খাব। বাঁ থাবা দিয়ে খাব, ডান থাবা দিয়ে খাব, পিছনের থাবা দিয়েও খাব; হালুম-মন্ত্র পড়েও খাব, না পড়েও খাব—এমনকি, বৃহস্পতিবারেও আমরা আঁচড়ে খাব, শনিবারেও

আমরা কামড়ে খাব—এত ঔদার্য।" এই বাঘ সেদিন ছিল, আজও আছে আমাদের চারপাশে, কাছে ও দূরে—জাতিভেদ, বর্ণভেদের ব্যবসা ফেঁদে, সাম্রাজ্যবাদী লোভের দাঁত বার করে, শোষণের থাবা উঁচিয়ে। দুনিয়ার বহুরূপী অত্যাচারীদের চেহারা বাঁকা হয়ে পড়েছে বাঘেদের জীবনকাহিনীতে।

শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানে হাতেখড়ি হয়েছিল এবং পরবর্তী জীবনেও বিজ্ঞানচর্চা তিনি ভোলেন নি। তিরিশের দশকে বিজ্ঞানের অনুশীলন তাঁকে নেশার মতো পেয়ে বসেছিল, বিজ্ঞানীদের সাহচর্যও তিনি পেয়েছিলেন। সেই অনুশীলনের বিস্ময়কর প্রকাশ 'বিশ্বপরিচয়'। এই সময় থেকে বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও তত্ত্বগুলিকে তিনি রচনায় নানাভাবে প্রয়োগ করেছেন, 'মানুষের ধর্ম' বিচারণার ক্ষেত্রেও। আবার তাকে হালকা সুরে প্রকাশিত করেছেন 'প্রহাসিনী' ও 'খাপছাড়া'য়। কবি বিজ্ঞানের ভালো-মন্দ দুটি দিকই লক্ষ্য করেছিলেন। 'গল্পসল্প'-এ বিজ্ঞানীর প্রতি তাঁর দরদ অপরিসীম। অপরপক্ষে 'সে' বইয়ে বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয়ের যে উল্লেখ পাই, তার মধ্যে তার ভালো-মন্দ দুইই বর্তমান। তার চেয়েও বড়ো কথা, উনবিংশ-বিংশ শতকের অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি যে অবহিত ছিলেন, তার পরিচয় এখানে আছে। এবং সেইসব আবিষ্কৃত তথ্য ও তত্ত্বকে যথারীতি এলোমেলো করে দিয়ে অসঙ্গতির ছন্দ আনবার চেষ্টা করেছেন। সেই প্রয়াসে ডারউইন-মেণ্ডেল-ল্যামার্ক থেকে প্লাঙ্ক, কুরী, সদি-রাদারফোর্ড, আইনস্টাইন পর্যন্ত সকলকে এখানে এনে হাজির করেছেন। মুখ্যতঃ জীববিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যাকে আশ্রয় করে কথিকাগুলি দানা বেঁধেছে, এগুলিরই নাম তিনি দিয়েছেন "বৈজ্ঞানিক রসিকতা"। বিবর্তনতত্ত্বের গোড়াতেই সৃষ্টিতত্ত্ব। এর আগে একটি সৃষ্টিকাহিনীর উল্লেখ করেছি, এখানে আরেকটা: "পৃথিবী-সৃষ্টির গোড়াকার মালমসলা ছিল পাথর লোহা প্রভৃতি মোটা মোটা ভারি ভারি জিনিস। তারই ঢালাই পেটাই চলেছিল অনেককাল। কঠোরের বে-আব্রুতা ছিল বহুযুগ ধরে। অবশেষে নরম মাটি পৃথিবীকে শ্যামল আস্তরণে ঢাকা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার যেন লজ্জা রক্ষা করলে। তখন জীবজন্তু আসরে নামল স্তূপাকার হাড়মাংসের বোঝাই নিয়ে; মোটা মোটা বর্ম প'রে তারা দুশো পাঁচশো মোন অসভ্য লেজ টেনে টেনে বেড়াতে লাগল। তারা ছিল দর্শনধারী জীব।…শেষকালে এল মনোবাহী মানুষ।" শারীরবিদ্যার অন্তর্গত ব্রেন-বদলের প্রচেষ্টাকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "জু থেকে চেয়ে নিলে

একটা বনমানুষ। বের করলে তার মগজ। আর, 'সে'-র মাথার খুলি খুলে ফেললে। তার মধ্যে বাঁদরের মগজ পুরে দিয়ে খড়ির পলেস্তারা দিয়ে মাথাটা বেঁধে রাখলে পনেরো দিন। খুলি জুড়ে গেল।" অনতিকাল পরে 'সে' ছুটে এল সরবে প্রতিবাদ করতে করতে, তার খুলিতে বনমানুষের মগজ।

মহাশূন্যলোকের হদিশও তাঁর নজর এড়ায় নি, তার বর্ণনাটুকু খুব সুন্দর : "আমার আকাশে আছে সকাল, আছে সন্ধে, আছে মাঝরাত্রের তারা, আছে দক্ষিণে হাওয়ার যাওয়া আসা, আর আছে, কিছুই না—কিছুই না—কিছুই না।...আকাশের সবচেয়ে অমূল্যধন ঐ কিছুই-না।...এইখানটা আজ আছে খালি আগামী যুগের জন্যে।"

আলোর তত্ত্ব পেয়েছে আলোকিত রূপ : "বিশ্বজগতে সূক্ষ্ম আলোর কণাই বহুরূপী হয়ে স্থূলরূপের ভাণ করছে। সেদিন আলো আপন আদিম সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ পাবে।...দেউলে হয়ে যাওয়ার মানেই তো আলো হয়ে যাওয়া। আমি কোন্ রঙের আলো হব, দাদামশায়? সোনার রঙের। আর তুমি? আমি একেবারে বিশুদ্ধ রেডিয়ম। সেদিন আলোয় আলোয় লড়াই হবে না তো? ইলেকট্রন নিয়ে হবে নাকি কাড়াকাড়ি। ভাবনা ধরিয়ে দিলে। লীগ অফ লাইট্স্-এর দরকার হবে বোধ হচ্ছে। ইলেকট্রন নিয়ে টানাটানির গুজব এখনি শুনতে পাচ্ছি।...আচ্ছা, গান? গান হবে রঙের সংগত। তান যখন ঠিকরে পড়তে থাকবে, ঝলক মারবে আকাশের দিকে দিকে। তখনকার তানসেনরা দিগন্তে অরোরা বোরিয়ালিস বানিয়ে দেবে। আর, তোমার গদ্যকাব্য কী হবে বলো তো। তাতে লোহার ইলেকট্রনও মিশবে আবার সোনারও।"—লোহার ইলেকট্রন সোনায় রূপান্তরিত হয়েছে, বিজ্ঞানের তথ্য হয়েছে আর্ট রূপান্তরের অভিনব অভিঘাতে ও উত্তাপে। গ্রন্থটির উৎসর্জন তাই বিজ্ঞানবিদ "করতলযুগলেষু"।

'সে' কেবলমাত্র কথার ছবি নয়, এখানে ছবিও কথা বলেছে কথকতার সহযোগী হয়ে। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কবি সমানে তুলি ধরেছেন, তাঁর চোখের সামনে এখন শুধুই আকার এবং "ছবি হল আমার শেষ বয়সের প্রিয়া"। তার অব্যবহিত প্রভাব এসে পড়েছে সাহিত্যেও, 'সে'-তে লিপি-চিত্রের পাশে তাই চিত্রলিপি। ডাইনামিকের পাশে স্ট্যাটিক। স্কেচ অথবা পেন্টিং সবের মধ্যে রবীন্দ্র-চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যগুলি স্বতঃ।

রেখার বন্ধনে কবি ধরে রেখেছেন শিবুরাম, পুত্তুলাল, বাঘ, সুকুমার এবং

...কর্ণ, গাঙডিসাংড়ুং প্রভৃতিকে। বেধের আভাসও আনতে চেয়েছেন—গেছোবাবা, সে, স্মৃতিরত্ন, পাঁড়েজি, কোরুক্কুনা প্রভৃতি। আরও গাঢ় ও গভীর বেধে পাই সে, পুপু, অনাথতারিণী সভার সভ্য পাতুখুড়োর গিন্নি, পান্নারাম প্রভৃতি। এই রেখা ও বিভিন্ন বেধের চিত্রকলা বর্ণিত বিষয় ও চরিত্রকে আরও স্পষ্টতর করে তোলার জন্যে। যাদের চরিত্রে গভীরতা বা জটিলতা কম, তাদের এঁকেছেন রেখায় বা স্বল্প-গভীরতায়। অল্প স্থানেও যে-চরিত্র অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছে, তাদের প্রকাশ করেছেন গাঢ়তর রঙে গভীরতার আভাসে। এছাড়া অন্য কারণও আছে। কথার ছবির সঙ্গে ছবির ভাষা মিলিয়ে-মিলিয়ে পড়তে হবে। আবার, কথার বাইরেও এসব ছবির স্বতন্ত্র মূল্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, সেখানে তারা শুধুই ছবি, অক্ষরবাহিনীর পতাকাবাহী ক্রীতদাসমাত্র নয়। সেখানে কবি চিত্রকর।

রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন সমালোচনাকে একত্রিত করে নিলে বক্তব্য দাঁড়ায় : রবীন্দ্রনাথের ছবি আকারের যথাযথ প্রতিচ্ছবি নয়, ভাবের ব্যন্‌জিতে বাহন ; তাঁর শিল্পে পাই আদিম বলিষ্ঠতা ও সামঞ্জস্যহীনতার সুন্দরতম উপস্থাপনা। ফলে, এর বাইরে অসঙ্গতি অসুন্দর, ভেতরে সেই অসামঞ্জস্যের সুষমা ও ছন্দ। এই অসঙ্গতির ছন্দ জাগানো হয়েছে দুটি কারণে। কবির মতে, সুন্দর-অসুন্দরে ভেদ বস্তুজগতে নেই, তা আছে মানুষের মনে ও আর্টের রাজ্যে ; সেই আর্ট ও মনের প্যাটার্নে বস্তুজগতের সবই তাঁর তুলির মুখের যাত্রী। অন্যদিক থেকে, পি. ধোয়েরে বলেছেন : "আর্ট ইজ নট ট্রুথ, ইট ইজ নট নেচার ; ইট ইজ এ প্যাটার্ন অব রিদম্ অফ্ ডিজাইন হ্বাট উই ইম্‌পোজ অন্ নেচার।" শিল্পী-মনের ভাবনা ও ছন্দ আরোপিত হয় প্রকৃতি-জগতের ওপর, সেই আরোপিত প্রকৃতির রূপই উঠে আসে আর্ট হয়ে। শিল্পী তাই যেমনকে-তেমন আঁকেন না, তাকে মনোমত রূপান্তরিত করে নেন। যেখানে রূপান্তর স্বভাবসম্মত ও সঙ্গতিপূর্ণ, সেখানে সিরিয়াস আর্টের প্রকাশ, যেখানে তার অসঙ্গতির বা সঙ্গতি ভেঙে অসামঞ্জস্যের ছন্দ আনা হয়, সেখানেই কমেডী, গ্রোটেস্‌ক, অদ্ভুত রসের উদ্ভব। রবীন্দ্রনাথের চিত্রে এই অসঙ্গতির ছন্দ, অসামঞ্জস্যের সুষমার আর্টই লক্ষণীয়। তার সঙ্গে এসে মিলেছে আদিমতা ও বলিষ্ঠতা।

রবীন্দ্র-চিত্রের এই স্বধর্ম 'সে'-গ্রন্থের ছবিগুলিতে তো বটেই, তার কথা-অংশেও প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। সেই আরোপিত বা অনুভূত অসঙ্গতি,

কোথাও হালকা কথার টান, কোথাওবা গাঢ় গভীর বেধ। নিজের লেখা সম্পর্কে কবি যেকথা বলেছেন—"যেটাকে যেরকম জানি সেটাকে অন্যরকম করে দেওয়া"—তা তাঁর ছবি সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। এক জায়গায় তিনি বলেছেন : "যখন ছবি আঁকতে শুরু করি, আমার একটা পরিবর্তন দেখলুম। দেখলুম গাছের ডালে, পাতায় নানা রকম অদ্ভুত জীব-জন্তুর মূর্তি, আগে তা দেখিনি।" এই অদ্ভুত জীব-জন্তুর সঙ্গে মিল পেয়েছেন তিনি প্রাগৈতিহাসিক জীবের, যার বর্ণনা 'সে'-র পূর্ব-উদ্ধৃত সৃষ্টিতত্ত্বে আছে। ছবির রাজ্যে এইসব জীবকে তিনি ধরে রেখেছেন রেখায় ও রঙে, কলমের অথবা আঙুলের মুখে, সেখান থেকে তাদের নিয়ে এসেছেন কথার রাজ্যেও। উদাহরণত উল্লেখ করা যেতে পারে সচিত্র ঘণ্টাকর্ণ "তাদের দুটো কানে দুটো ঘণ্টা। আর, দুটো লেজে দুটো হাতুড়ি। লেজের ঝাপটা দিয়ে একবার এ-কানে বাজায় ঢঙ, একবার ও-কানে বাজায় ঢঙ" ; জিবরেরকরা-কাঁটাওয়ালা "রাক্ষস গোছের কিছু", "মানুষে গোরুতে সিঙ্গিতে মিশোল" গাঙ্গিদাঙ্গু। কথার ছবিগুলি স্বল্পবাক, রেখার ছবিগুলি বিচিত্র, অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ। সেটা স্বেচ্ছাকৃত। শিশু-মনের খেলার মতো। সমকালীন 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যে পাই এরই আরেক রূপ।

রবীন্দ্রনাথের ছবির আলোচনায় এ-সত্যও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে, সুন্দরের কবির অসুন্দরের দিকেও ক্রমশ চোখ পড়েছে, এবং ছবির মারফতে সেই দৃষ্টি এসে হাজির হয়েছে সুন্দরের এলাকায়। এই অসুন্দরের চেতনার অভাব থাকলে কবিকে পূর্ণতার সাধক বলা যেতে পারত না, কারণ কেবল সুন্দরতাই সৃষ্টির সবটা নয়। বাস্তব অনুভূতির পথেও তাঁর কবিসত্তা মিলেছে একই বিন্দুতে শিল্পিসত্তার সঙ্গে। রোমান্টিকতা ও দার্শনিকতার মোহ কাটিয়ে তিরিশের সন্ধিক্ষণে এসে তিনি উপলব্ধি করেছেন, এই জীবনে আছে ক্লেদ, কুশ্রীতা, গ্লানি, আবর্জনা, যারা একান্ত সত্য। 'পরিশেষ'-এর বিখ্যাত 'প্রশ্ন' কবিতায় তাঁর মনের বাঁক ফেরার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। অতঃপর কবি নেমেছেন অসুন্দরেরও সাধনায়, 'পুনশ্চ' কাব্য থেকে তা স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। "চিররূপের বাণীতে" রূপকে অনুভব করেছেন মনের সঙ্গে মেলে ওতঃপ্রোতভাবে, 'শাপমোচন'-এ কুৎসিত বীভৎসতার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দেখেছেন সুন্দররূপে ; এই কাব্যে এমন সব চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে, যা অসুন্দরের প্রতীক : "মহিষাসুরের মুণ্ড যেন", "মাছের কান্‌কা", "মরা বেড়াল

...না, ছাইপাঁশ", "বাদলের কালো ছায়া স্যাঁৎসেঁতে গলিটাতে ঢুকে ...পড়া জন্তুর মতন মূর্ছায় অসাড়"। পরবর্তী আরও অনেক কবিতায় এই ...তীয় চিত্রকল্প বিরল নয়। তাঁর চিত্রকলা এই অসৌন্দর্যের চেতনা থেকে ..., যাকে কবি বলেছেন "সাবলাইম"। 'সে'-গ্রন্থের বর্ণনাগুলিতে এই ...লাইম অসুন্দরতার ঠাস্‌বুনুনি, কবি চিত্রকরের চোখ দিয়ে এর অক্ষরগুলি ...বিয়েছেন। যেমন, "গুরুর অতি-অপূর্ব বিশ্রী মুখ"। যেমন তার আঁকা ..., তেমনি তার ভাষ্য : "শ্রীমুখটা নিতান্ত মেয়েলি, বিশ্রী মুখেই পুরুষের ...গৌরব। ওর জোরটা আকর্ষণের নয়, বিপ্রকর্ষণের।" সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনাগুলিও ...খানে স্মরণ করা যেতে পারে। আর সাবলিমিটির পরিচয় একটি কবিতায়, ...এই বইয়ের একমাত্র সিরিয়াস রচনা হিংস্র বাঘ সম্পর্কে :

"হিংসারেও করেছ প্রবল হস্তে দান
আশ্চর্য মহিমা এ কী। প্রখরনখর বিভীষিকা,
সৌন্দর্য দিয়েছ তারে, দেহধারী যেন বজ্রশিখা,"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "মাই পিকচার্স আর মাই ভার্সিফিকেশন ইন ...লাইনস।" ছবি তাঁর রেখাবাহন কবিতা এ যেমন সত্য, তেমনি, বিশেষ ...রে, শেষ পর্বের রচনাও কথাবাহন ছবি। 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'চতুরঙ্গ', ...তেমনি 'সে'-ও : "বসে বসে ছবি আঁকছি। এখানকার মাঠের ছবি। ...দিকে বরাবর চলে গেছে রাস্তা মাটির রাস্তা—দক্ষিণ দিকে পোড়ো ...জমি, উঁচুনিচু ঢেউ-খেলানো, মাঝে-মাঝে ঝাঁকড়া বুনো খেজুর। দূরে ...গাঁ-গবটে তালগাছ আকাশের দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে। তারই ...পিছনে জমে উঠেছে ঘন মেঘ, যেন একটা প্রকাণ্ড নীল বাঘ ওৎ পেতে ...আছে, কখন এক লাফে মাঝ-আকাশে উঠে সূর্যটাকে দেবে থাবার ঘা। ...তিতে রঙ গুলে তুলি বসিয়ে এই সব এঁকে চলেছে।" এই বর্ণনার সঙ্গে ...মেলানো ছবিও আছে তাঁর। আর একদিন : "সায়াহ্নের ছায়া ঘনিয়ে ...। দেখা গেল সামনের মহানিমগাছের মাথার উপরে সন্ধ্যাতারা দেখা ...দিয়েছে। সমস্ত আকাশটা যেন ঝিম ঝিম করছে। কী জানি কেন ...মনে মনে বলছি, পশ্চিম-আকাশ থেকে ঐ আসছে রাত্রিরূপিনী শান্তি, স্নিগ্ধ ...তা, স্তব্ধ।" মৃত্যুর পটভূমিকায় সমস্ত অদ্ভুত রস পরিণত হয়েছে করুণ ..., অসঙ্গতি আত্মনিবেদন করেছে সঙ্গতির কাছে। সেকথা শিল্পী জানে ...কবিও না। তাই বেদনার অভিব্যক্তি সুকুমারের ট্র্যাজেডিতেও।

'সে' অদ্ভুত রসাত্মক একটি রচনা। শিল্পকর্মের কোনো একটি শ্রেণীতে একে ফেলা যায় না। যেমন এর বিষয়, তেমনি এর ভঙ্গি—দুইই অভিনব। প্রকরণের দিক থেকে এতে জড়ো হয়েছে রূপকথার জগৎ ও আধুনিক সমাজচিত্র, বিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং চিত্রের শিল্পকলা। এমন বিচিত্র মিশ্র যৌগিক হবারই সম্ভাবনা বেশি। আশ্চর্যের কথা, বিরোধী ভাব ও আঙ্গিককে কবি নবরূপ দিয়েছেন রাসায়নিক মিশ্রণের মাধ্যমে। ত্রৈলোক্য নাথের 'কঙ্কাবতী' বা অবন ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা', কিংবা বিদেশী 'এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' থেকে 'টাইম মেশিন', 'ব্যাক টু মেথুসেলা', কি 'এপ্ অ্যান্ড এসেন্স' পর্যন্ত—এই জাতীয় অদ্ভুত রচনার সাক্ষাৎ আমরা আগেও পেয়েছি। কিন্তু আপাত বৈষম্য সত্ত্বেও এই বইগুলির একটি সামগ্রিক বক্তব্য আছে। 'সে'-র মধ্যে তা-ও নেই, কোনো একটি সুবিহিত ধারাবাহিক কাহিনী নেই। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিচিত্র পথে কবি মনে-মনে ভ্রমণ করেছেন, চোখের সামনে তাদের ছবি তুলে ধরেছেন আর এঁকেছেন জামিতিক অসঙ্গতিতে, অদ্ভুত রসে চুবিয়ে-চুবিয়ে। কাহিনীগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, সমগ্র বইটি একটি দ্বীপপুঞ্জ। তবু সবগুলির মধ্য থেকে একটি বক্তব্য ঘুরে-ফিরে নিজেকে জানাতে থাকে—মানুষ। জটিল জীবন আর হৃদয় নিয়ে যে বহুরূপী মানুষ আমাদের প্রতিবেশী ও স্বজন, তাদের কথাই কবি বলেছেন, ধারাবাহিকতায় নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ এক-একটি স্তবকের মাধ্যমে। এযুগের মানুষ এবং তার জীবন ও মনের নানা সমস্যার সমাহারে 'সে' এক নয়া রূপকথা। কিম্ভূত কল্পনা এর বাইরের খোলস, ভেতরে সত্য রয়েছে ভূমিকা। যদিও এখানকার মানুষও "নিছক খেলার মানুষ, সত্যমিথ্যার কোনো জবাবদিহি নেই", তবু সে একান্ত সত্য। বাস্তবের জীবনে ও মনে ও কর্মে-চিন্তায় কবি দেখেছেন অসঙ্গতি, বলেছেন তার কথা। এই অসঙ্গতিকে আরের কাঁধে চাপিয়েছেন, আরোপ করেছেন ও গড়ে তুলেছেন মনোমত এক-একটি অসামঞ্জস্যের ডিজাইন। অনেক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য ভেঙে দিয়ে অসামঞ্জস্যের সমন্বয় এনেছেন। প্রথম অবস্থায় আর্ট তাঁর হাসির, দ্বিতীয় অবস্থায় আনন্দ, মনে যার বাসা। এই গ্রোটেস্ককেও কবি "আরো সত্য" বলতে দ্বিধা করেন নি, যার ভিত্তি বাস্তব সত্যের ওপর, প্রকাশ কল্পনার মনোরথে।

এই নতুন খেলায় মেতে ওঠার দুটি কারণ বইটিতে পাওয়া যায়।

জায়গায় তিনি বলেছেন আদিমতম যুগের সৃষ্টির প্রাথমিক জীবযাত্রাকে জানবার আকাঙ্ক্ষার কথা: "পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম অভিযানের সেই অস্পষ্ট যুগটাকে স্পষ্ট করে জানবার ব্যাকুলতা।" অন্যপক্ষে বর্তমানকে জানবার সমান আকুলতা। এতক্ষণ ধরে যে অসঙ্গতিকে আমরা খুঁজছি চরিত্রে-রসে-আর্টে, আসলে তা তো আমাদের এই বিংশ শতকের জীবনেই বর্তমান। হাকসলিও তাঁর মতো করে প্রহসনে একে রূপ দিতে চেয়েছেন, এই অসুন্দর ও অসঙ্গতির সমাহারকে, যা আমাদের চারপাশেই নিত্য বেড়ে চলেছে, জট পাকাচ্ছে মনের গোপন অন্তঃপুরে। তাই কবি কল্পনা করেছেন, সঙ্গীতশালাতে আদিতে ছিল সুর, তারপর এল বেসুর, কুশ্রীর কাছে সুশ্রীর হার হল, তারই জোরে চলেছে সারা দুনিয়ার শক্তিমানরা: "ঐ যে স্থূলতনু গজানন সর্বাগ্রে পেয়ে থাকেন পূজা—এটাই তো চোখ-ভোলানো সুন্দর ললিতকলার বিরুদ্ধে স্থূলতম প্রোটেস্ট্। বর্তমান যুগে ঐ গণেশের শুঁড়ই তো চিমনি মূর্তি ধরে পাশ্চাত্য পণ্যযজ্ঞশালায় বৃংহিতধ্বনি করছে। এই বৃংহিত বেসুরের জোরেই কি ওরা সিদ্ধিলাভ করছে না?" কবির সমকালীন দৃষ্টি, বিংশ শতকের খণ্ডিত স্বরূপ উন্মোচন এখানে স্পষ্টতম হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। যিনি গোপন হিংসাকে দেখেছেন কপট রাত্রিছায়ে হত্যাকারীর বেশে, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের অসহায়তাকে, তরুণ প্রাণের বিসর্জনকে, যিনি দেখেছেন মনুষ্যত্বের দৈন্য, অশ্লীল দিনরাত্রির স্থূলতা, তিনি অনুভব করেছেন, অগ্রসৃত সভ্যতার মধ্যবর্তী অসভ্যতাকে। তাই বলেছেন: "বেসুরের নবযুগ এসেছে সমস্ত জগতে। সভ্যজাতরা আজ বলছে, বেসুরটাতেই বাস্তব, ওতেই পুঞ্জীভূত পৌরুষ, সুরের মেয়েমানুষি-ই দুর্বল করছে সভ্যতা। ওদের শাসনকর্তা বলছে, জোর চাই, খৃস্টানি চাইনে।...এদিকে বেতালপঞ্চবিংশতি চাপল সাহিত্যের ঘাড়ে। আনন্দ করা, বাংলাও ওদের পিছু ধরেছে।...মনে রেখো, পিটুনির চোটে ঠেলা মেরে জোর চালানো আজ পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচলিত।" এখানে কবির বক্তব্য প্রতীকের আবরণ সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে অবারিতভাবে। এরই মধ্যে তিনি দেখেছেন ভবিষ্যৎকে। সেও বেতাল-বেসুরের বীভৎসতা, "হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস" নাম দিয়েছেন তার। এই শূন্য দ্বীপে মানুষ বিচিত্র কারণে রত—পাকযন্ত্র তারা উপড়ে ফেলেছে, নাক দিয়ে পোস্টাই নিচ্ছে পিচ ঠেলে-ঠেলে, হৃদযন্ত্রকে শায়েস্তা করবার জন্যে বিধান দেওয়া হয়েছে,

"সবাই মিলে হামাগুড়ি দাও, ফিরে এসো চতুষ্পদী চালে যদি দীর্ঘকাল
সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও।" সঙ্গে ছবিও আছে। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট,
থেকে অমানুষের অভিমুখে গড়িয়ে চলা। নবযুগের মহাকাব্যের নাম
কবি দিয়েছেন—"বেসুর হিড়িম্বের দিগ্বিজয়"।

অসঙ্গতি কি কেবল বাইরের বিশ্বজগতে, কবির অন্তরজগতেও
দিয়েছে। 'সে'-র বক্তব্য যেমন বেসুরের দাপাদাপি, তার ভঙ্গিও
বেতালপঞ্চবিংশতি, এলোমেলো জটপাকানো। সকলের পেছনে কবির
মনুষ্যত্বের অধোগতি দেখে চঞ্চল বিক্ষুব্ধ এবং বিশৃংখল হয়ে উঠেছে।
প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, দুঃখের ব্যাপারকে মন থেকে মুছে ফেলার,
তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দৃশ্য ও আসবাবও যেন সহ্য করতে পারতেন না।
দুঃখকে-নিজেকে ভোলবার জন্যে ডুব দিতে চাইতেন অন্যমনস্কতায়।
দিয়েছিলেন 'ক্ষুধিত পাষাণের' নবাব-প্রাসাদে। কিন্তু সেখানে
ব্যক্তিগত ও পারিবারিক। আজকের বেদনা বিশ্বজোড়া, মানুষে-
জন্তুর তাল ঠোকাঠুকি। ঠিক একবছর পরে লেখা 'জন্মদিনে' কবিতায়
এই ব্যথিত অনুভব সীমাহীন হয়ে উঠেছে; তার সঙ্গে যুক্ত
মৃত্যুবেদনা। 'গল্পসল্প', 'সে'-রই পরবর্তী ও সরল সংস্করণ; সেখানেও
কথা আছে:

> "চোখের পরে দিয়ে ঢাকা
> ভোলা মনকে ভুলিয়ে রাখা
> কোনো মতেই চলবে নাতো আর!"

'সে' লেখার সময়ে মৃত্যুভীতি ছিল কিনা বা কতটা সচেতন ছিল,
যায় না। তবে বিশ্বজোড়া ব্যথা ভুলতে কবি এখানেও চেষ্টা
"আপনাকে ভুলে গিয়ে আর কিছু হয়ে যাবার ঐ একটা বড়ো
আত্মবিস্মৃতির খেয়ায় কবি সচেতন মন থেকে সরে গেছেন তাঁর শৈশব
অবচেতন মনে ও মননে! সেই মগ্নচৈতন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন অদ্ভুত
মানুষ ও ঘটনা:

> "খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে
> ভেসে আসে বায়ুস্রোতে!"

এই খেয়াল কবিমানসের অবচেতন স্তর, যেখানে গিয়ে তিনি
ভুলতে চেয়েছেন! সেখানে "নিয়মের দিগন্ত" নেই, আছে "নিরুদ্দেশ

বেশ" তথা ঔদাসীন্য। এই মগ্নচৈতন্য থেকে চিত্রের জন্ম। তাই দুয়ে মিলেছে
অনিয়মের-অসঙ্গতির আঘাটায়:

> "যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
> কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা।"

বর্তমান থেকে পালাতে গিয়ে কবি সৃষ্টি করেছেন উদ্ভটের-কিম্ভূতের রাজ্য; অবচেতন মন সচেতন মনের পাহারা এড়িয়ে তাঁকে সাহায্য করেছে। এই আত্মবিস্মৃতি ও মগ্নচৈতন্যের খেয়ালখুশি 'প্রহাসিনী' 'ছড়া' এবং 'গল্পসল্প'তেও! তবে 'সে'-তে আদিমতার যে গভীর ভাবানুষঙ্গ আছে, তা ক্রমশ স্তিমিত হয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে অভ্যস্ত থাকার ফলে এই নতুন পদ্ধতিকেও তিনি পরিণত করেছেন সুস্থ আর্টে। 'গল্পসল্প' তাই 'সে'-র তুলনায় অনেক সহজ সরল ও লঘু। 'সে' প্রায় পুরোপুরি অবচেতন মনের অবদান।

শৈশবে কবি যাদের কাছে গল্প শুনেছেন, তাদের ছায়া 'সে'-স্বভাবে থাকা অসম্ভব নয়। বিশেষ করে মনে পড়ে আবদুল মাঝিকে। তবু কবির অবচেতন মনই—'সে'। তাঁর দ্বিতীয় সত্তা। বিস্মৃতির জন্যে মানুষ নিজের মধ্যে দ্বিতীয় ভুবনের সৃষ্টি করে, সেখানে নিজেকে নানা নতুন রূপে দেখে ও আস্বাদন করে। রবীন্দ্রনাথও মগ্নচৈতন্যের সহায়ে উপনীত হয়েছেন কিম্ভূতের রাজ্যে। কিন্তু এ প্রক্রিয়া তো ব্যাধির পথে নয়, শিল্পরচনার পথে। তাই একটি মন, কবির সচেতন মন গল্প তৈরি করে, আর সেই গল্পের নায়ক হয়ে দেখা দেয় তাঁরই দ্বিতীয় সত্তা, যাকে তিনি ইচ্ছেমতো সাজান, সাজ খুলে ফেলেন। এর তো সাংসারিক কোনো দায় নেই, একটি কল্পনার প্রতিমা মাত্র: "গল্পের মূল অবলম্বন হচ্ছে একটি সর্বনামধারী সে, কেবলমাত্র বাক্য দিয়ে তৈরি। সেইজন্যে একে নিয়ে যা-তা করা সম্ভব, কোনোখানে এসে কোনো প্রশ্নের হুঁচোট খাবার আশঙ্কা নেই। কিন্তু অনাসৃষ্টির চাক্ষুষ প্রমাণ দেবার জন্যে একজন শরীরধারী জোগাড় করতে হয়েছে।" অর্থাৎ কবির দুটি সত্তা মুখোমুখি এসে বসেছে। আরও একজায়গায় বলেছেন: "আমাদের এই 'সে' পদার্থটি ক্ষণজন্মা বটে; এমনতরো কোটিকে গোটিক মেলে। মিথ্যে কথা বানাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা। আমার আজগবি গল্পের এত বড়ো উত্তরসাধক ওস্তাদ বহুভাগ্যে ঘটেছে।" এর পাশে 'গল্পসল্প'-এর একটি সংলাপকে রাখা যায়: "ঠাকুরদা, এক সময় শুনেছি তুমি মুখে মুখে

গল্প বলে শোনাতে। এখন শোনাও না কেন। আর একটু হোলেই বলতে যাচ্ছিলুম 'ক্ষমতায় ভাঁটা পড়েছে বলে'।" এই গল্পকারের ইঙ্গিত 'সে' সম্পর্কে। 'গল্পসল্প'-এ বাচস্পতি ও পান্নালাল মাঝে-মাঝে এলেও 'সে' নেই, কবি একক। সুতরাং এই দুটি উদ্ধৃতি থেকে 'সে'-র স্বরূপ বিশ্লেষণ দুরূহ নয়, ভিন্ন কেউ হলে কুসুমির প্রশ্নে তার সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা থাকত। 'সে'-কে ভোলা যায় না। আপনার একটি নতুন সত্তা সৃষ্টি করে কবি তার গল্প বলেছেন, তার সঙ্গে গল্প করেছেন, দুজনে বিতর্ক করেছেন, নিজের মধ্যে নিজেকে আর একভাবে অনুভব করেছেন, যেমন একদিন করেছিলেন জীবনদেবতাকে নিয়ে। 'সে' দ্বিধাবিভক্ত প্রতিভার যৌথ সৃষ্টি, যার উৎস মগ্নচৈতন্য। এ-রাজ্যে অভিজাত কবি রবীন্দ্রনাথ বসে থাকেন স্বীয় গণ্ডীতে, আর 'সে'-র মাধ্যমে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ শিশুর মতো যা-ইচ্ছে-তাই ভাবতে পারেন, বলতে পারেন, সাজতে পারেন, এমনকি আদিম বন্যতাও অনুভব করতে পারেন এবং তাকে পেরিয়ে আরও পেছনে চলে যেতে পারেন। সভ্য ও সতর্ক মন নিয়ে নিজেকে ভোলা যায় না, পৌঁছনো যায় না সেই আদিম যুগে, যেখানে সত্য-মিথ্যের ও সাজানো-গোছানোর দায় নেই।

রবীন্দ্রনাথের মনে একটা ক্ষোভ জেগে উঠেছিল শেষ পর্বে এসে। সাধারণ মানুষের বেড়ার ওপারে তিনি যেতে পারেন নি কখনও। কয়েকটি কবিতায় অবশ্য তাদের মনের কথা তিনি বলেছেন এবং নিজেকে ব্রাত্য বলে ঘোষণাও করেছেন। তবু ক্ষোভ সমূলে নিশ্চিহ্ন হয় নি, স্বাভাবিক কারণেই হতে পারে না। 'সে'-র মাধ্যমে তিনি অবাধে ভ্রমণ করেছেন সেই সাধারণ মানুষের মধ্যে। পাতুখুড়ো ও খুড়ির সংসারে, মাঝরাত্তিরের অন্ধকারে কনে-দেখার সমারোহে, ভৌতিক দেহে, অনবরত অসম্ভব গল্পসৃষ্টির কারিগরিতে। 'সে' অসাধারণ কিন্তু উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষ নয়। কবির ব্রাত্য-প্রীতিতে 'সে'-ও ব্রাত্য।

এই ব্রাত্য-প্রীতিতে 'সে'-র এলোমেলো কাহিনীর মধ্যে এসেছে মাটির গন্ধ, মানুষের পদচিহ্ন। যে-বাস্তবকে কবি ভুলতে চেয়েছিলেন, তাকে ভুলতে পারলেন না। সচেতন থেকে অবচেতনের অভিমুখে সেও কবির সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথ রূপান্তরিত হলেন 'সে'-তে, বাস্তবজগৎ আরও কাছে সরে এল, নব নব রূপ নিল বিচিত্র ঘটনায়-চরিত্রে-প্রাণীতে। এবং তার অন্তরালে আভাসিত হয়ে রইল সমাজসংসার ও বিশ্বের ছবি, সেই ছবি সম্পর্কে

কবির বক্তব্য। কিন্তু কথক একা 'সে' নয়, স্বয়ং কবিও। তাই প্রতীকের নামাবলী সরিয়ে মাঝে মাঝে বাস্তব ফুটে উঠেছে সশরীরে। 'সে' কবির পৃথ্বী ও মানবপ্রীতির এক অপরূপ নিদর্শনও।

'সে' একদিকে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিচিত্তের মনস্তাত্ত্বিক বিক্ষোভ, অন্যদিকে সমাজচিন্তার প্রক্ষেপন। যদি কেবলমাত্র প্রথমটি হত, তবে আমরা বইটিকে বলতাম—নিছক খেয়ালখুশি, অথবা প্রতিভার বিচিত্র আত্মপ্রকাশ, বা বাস্তববিমুখ একটি পলাতক রচনা, এমনকি, হয়তো অভিজাতসুলভ প্রতিক্রিয়াশীল সৃষ্টি। কিন্তু সেই সঙ্গে দ্বিতীয়টি থাকাতে স্বীকার করতেই হবে, কবি পলাতক বা প্রতিক্রিয়াশীল নন, বিশ্বের অনুগ। একদিকে তিনি স্ব-তন্ত্র আর্টিস্ট, অন্যদিকে তিনি পরতন্ত্র মানবপ্রেমিক। একাদিকে তাঁর মনের গভীরে নেমেছেন, অন্যদিকে বিশ্বের অতলে অবগাহন করেছেন। জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে প্রকাশের প্রচলিত নিয়মকে ভেঙে নতুন পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, হয়তো বা রূপক-নাট্যেরই পরবর্তী বিবর্তন এটি। জটিল নিশ্চয়ই, কিন্তু দুর্গমতা দোষ নয়, অগম্যতাই অপরাধ। আজকের জীবন ও মন ও সমাজ জটিল-দুর্গম। 'সে'-তে পাই একই সঙ্গে কবির তথা আধুনিক মনের ব্যাসকূট জটিলতাকে, আর আধুনিক জীবনের কুটিল অসঙ্গতি ও অসুন্দরকে। দুয়ে মিলিয়েই এর সার্থকতা। 'সে'-কে নবযুগের মহাকাব্য বলব না, কবিও বলেন নি, কিন্তু আজকের দুনিয়ার একাংশে জীবনের ও মানসের সকল স্তরে যে "বেসুর-হিড়িম্বের দিগ্‌বিজয়" সগর্জনে ঘোষিত হচ্ছে, 'সে' তার একটি সার্থক প্রতিলিপি, যেমন ভাবে তেমনি ভঙ্গিতে। এইখানেই এর স্বরূপ এবং সেই রূপেই এর যথার্থ মূল্যায়ন। দৃষ্টির সীমা পেরিয়ে চৈতন্যের গহনলোক থেকে একে উপলব্ধি ও আস্বাদন করতে হবে। আর তা যদি না-ও হয়, 'সে'-র আন্তর-বক্তব্য যদি পাঠকের কাছে নিতান্ত দুর্বোধ্যও থেকে যায়, তবু শুধু অসামঞ্জস্যের সমন্বয় বা ছন্দিত অ-ছন্দের শিল্পকর্ম হিসেবেও রচনাটিকে রসাত্মক মনে হতে কোনো বাধা নেই। পড়ে আর মনে-মনে ছবি এঁকে আর আঁকা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে যে আনন্দ পাওয়া যেতে পারে, তা-ও কম লাভ নয়।

শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

এক

একটি গল্পে পড়েছিলাম যে একবার শয়তান তার অনুচরদের পরীক্ষা করবার জন্য তাদের ডেকে পাঠিয়ে বলল, "তোমরা প্রত্যেকে একটি করে শয়তানী কাজ করে এসো, আমি দেখব তোমরা কে শয়তানী বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ।"

অনুচররা বেরিয়ে পড়ল। তারপর যে যার মনের মতো একটি শয়তানী করে ফিরে এল।

শয়তান এক এক করে তাদের কাজের বিবরণ নিতে লাগল। কেউ মা-র কোল থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করেছে, কেউ প্রেমিক-প্রেমিকার মনকে বিষিয়েছে, কেউ ক্ষুধিতকে খাদ্যে বঞ্চিত রেখে তিলে তিলে তার প্রাণবায়ু হরণ করেছে ইত্যাদি।

দুর্বল গোছের এক ক্ষুদে শয়তান-অনুচর পেছন দিকে এক কোণে ভীরুভাবে দাঁড়িয়েছিল। এত বড় বড় কীর্তিমানদের পাশে সে নিজেকে অত্যন্ত হীন মনে করেছিল। শয়তানের প্রশ্নের উত্তরে সে দীন কণ্ঠে জানাল, "প্রভু, আমি বিশেষ কিছু করতে পারিনি, আমি শক্তিহীন। আমি একটি বালকের পড়বার বইপত্র সব কেড়ে নিয়ে ধ্বংস করেছি; সে বালকটি খুবই দরিদ্র, সে আর জীবনে পড়াশুনোর নাম করতে পারবে না।"

শয়তান শুনে খুব খুশি হল এবং প্রচুর সাধুবাদ দিল তাকে। বলল, "তোমার কাজই সবচেয়ে সেরা। তুমি একটা মানুষকে যাবজ্জীবন অন্ধকারে রাখবার ব্যবস্থা করেছ।"

এই গল্পটি যদিও শয়তান-নির্ভর, তবুও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এ গল্প একালের লোকের বানানো, যে-কাল শিক্ষাহীনতাকে চরম দুর্ভাগ্য মনে করে। আগেকার দিনে তা মনে করা হত না।

এমন একদিন ছিল যখন শিক্ষা ব্যাপারটা ছিল পুরোহিত বা রাজারাজড়ার একচেটে। গীর্জা, মন্দির, মঠ বা রাজপরিবারের বাইরে শিক্ষাকেন্দ্র ছিল

না। কিন্তু গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষায় সকলের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। শিক্ষা নিয়ে ব্যাপক চিন্তার সঠিক পত্তন তখন থেকে।

পুরনো আমলের শিক্ষা সর্বজনীন ছিল না। এবং আর একটি জিনিস তার ছিল না—সাম্প্রদায়িক ধর্মচিন্তা থেকে বিমুক্তি। আর এ আমলে ও দুটো নীতি প্রায় সর্বস্বীকৃত।

রুশোকে আধুনিক শিক্ষাচিন্তার প্রধান পথিকৃৎ বলে ধরা হয় একালে। ঊনবিংশ শতকের আগেই তিনি (এবং লক্) এই অবহেলিত বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে সভ্যতার যে সংকট তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা নিরসন করবার প্রয়াসে তিনি ছিলেন নিরলস। এই প্রয়াস তাঁকে সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাবিয়েছে; শিক্ষাচিন্তাও এই সূত্রে তাঁর মানসভাবনার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর 'এমিল' নামের বইটিতে তিনি এই শিক্ষাচিন্তাকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

রুশো আগের যুগের শিক্ষাচিন্তাকে তার সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিলেন। বিশেষ বৃত্তি বা প্রয়োজনের জন্য শিক্ষা নয়; তাঁর মতে, মানুষের পূর্ণতা-প্রাপ্তিই শিক্ষার লক্ষ্য। শিশুর স্বাভাবিক সত্তাকে প্রত্যক্ষভাবে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে বহির্বিশ্বের মুখোমুখি। সে স্বাভাবিকভাবে সংগ্রহ করুক তার মানসবৃদ্ধির মৃত্তিকারস—যেমন প্রকৃতিসন্তান তরু বা লতা করে থাকে। মধ্যিখানে আর কারো থাকবার দরকার নেই। রাষ্ট্রনেতা বা ধর্মনেতা মধ্যবর্তী হলে প্রত্যক্ষতায় সে বাধাই সৃষ্টি করবে। এই শিক্ষায় সকলেরই আছে অধিকার।

কিন্তু পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তিনি একজন শিশুর জন্য একজন সর্বক্ষণের শিক্ষক নিযুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। এটার উপযোগিতা যাই হোক, ধনবান লোক ছাড়া এই ব্যবস্থা করা অসম্ভব। পরবর্তীকালে এর অসুবিধা সম্পর্কে বার্টাণ্ড রাসেল মন্তব্য করেছেন, "arithmetically impossible."

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রুশোর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। পরের যুগের শিক্ষা-চিন্তার অগ্রণী নায়করা প্রায় সকলেই কোনো না কোনো ভাবে রুশোর দ্বারা প্রভাবিত।

পরিকল্পনার ত্রুটি যাই থাক, কতকগুলি মূলনীতিকে তিনি তুলে ধরেছিলেন। সর্বজনশিক্ষার সূত্রটিও—সুপরিকল্পিতভাবে বলা না হলেও—তাঁরই বলা।

আজ তাই বার্টাণ্ড রাসেলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে একথা আমরা সবাই বলতে পারি, "What I do mean is that the educational system we must aim at producing in the future is one which gives to every boy and girl an opportunity for the best that exists. The ideal system of education must be democratic, although that ideal is not immediately attainable. This, I think, would, nowadays, be pretty generally conceded." (*On Education*, P. 13)

সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্যের জন্য সার্বজনীন শিক্ষার আদর্শ সব দেশেই কিছু বাধা পেয়েছে। ভারতবর্ষের মতো পরাধীন দেশে এই বাধা ছিল আরো বেশী। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার প্রধান বাধাও ছিল এই পরাধীনতা।

পাশ্চাত্ত্য এই মূল সূত্রগুলিকে গ্রহণ করেছে বহু পূর্বে। এবং ফলে শিক্ষার স্তরপরম্পরা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই মোটা দাগের কথাগুলো প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এত শক্তি ক্ষয় করতে হয়েছে যে সামগ্রিক শিক্ষাভাবনাকে খুঁটিয়ে আকার দেওয়ার দিকে ততটা মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি। বস্তুত ঐ সাধারণ সূত্রগুলির কার্যক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা আজ পর্যন্ত না হলেও ওর অনেকগুলি উনিশ শতকেই আমাদের দেশের চিন্তাক্ষেত্রে এসে গিয়েছিল। কিন্তু সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে খুঁটিয়ে ভাবা ও হাতে-কলমে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলাদেশে—তথা ভারতবর্ষে—আর কেউ করেন নি। শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজী, বিবেকানন্দ প্রভৃতি এ বিষয়ে কিছুটা অগ্রসর হলেও তাঁদের চিন্তা ও প্রয়াস নানাদিক দিয়ে খণ্ডিত। এঁদের কেউ ছিলেন মূলত রাজনৈতিক নেতা, কেউ ধর্মীয়। শিক্ষা এঁদের জীবনসাধনায় অপেক্ষাকৃত গৌণ। আর বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবনসাধনার বৃন্তে বিধৃত।

দুই

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল ইংরেজদের হাতে—পদানত জাতির জন্য। সেই সময়কার শিক্ষাব্যবস্থা-সম্পর্কিত বিতর্ক অত্যন্ত পরিচিত। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যোগ ঘটিয়ে শিক্ষা-

প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয় নি। দাসমনোবৃত্তি গড়ে তোলাই ছিল ইংরেজদের লক্ষ্য। সে লক্ষ্যের কথা তদানীন্তন ইংরেজ রাজপুরুষরা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেই গিয়েছেন। সে শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত পঙ্গু, তা সারা দেশের জোর-কদম অগ্রগতির ভার বইতে অক্ষম, কিন্তু সম্ভাবনার তুলনায় যত সংকীর্ণই হোক, সেই প্রথম আমাদের দেশে সাধারণের জন্য নিয়মিত শিক্ষার কথা অন্তত কাগজে-কলমে ভাবা হল। তার আগে কোনো যুগে আমাদের দেশে সে ভাবনা ছিল না।

দাস মনোবৃত্তি আমাদের মধ্যে কিছুটা ঢুকেছিলও। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, সেটুকুই মাত্র ইতিহাস নয়। উনিশ শতকের শিক্ষার নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও অনেকে ব্যক্তিত্বে উন্নত হয়েছেন এবং উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভেবেছেন।

উনিশ শতকেই বিদ্যাসাগর জনশিক্ষা ও মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। একেবারে প্রাথমিক স্তরের কতকগুলি বই রচনা করে তিনি জনশিক্ষার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে—তথা জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়ার কথাটি তিনি আলোচনা করেছেন তাঁর 'Notes on the Sanskrit College'-এ। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সংযোগ ও সমন্বয়ও ছিল তাঁর অভীষ্ট। ('সংস্কৃত কলেজ ও বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 'বিশ্ব-ভারতী পত্রিকা', শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৮৮০ শক)। আর বিদ্যাসাগর Secular চিন্তার জন্যও খ্যাত।

উনিশ শতকের সভাসমিতির অধিকাংশেরই প্রধান একটি লক্ষ্য ছিল শিক্ষা। প্রতিষ্ঠানগুলির নাম থেকেই তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন', 'জ্ঞানসন্দীপন সভা', 'বিজ্ঞানদায়িনী সভা', 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা', 'জ্ঞানচন্দ্রোদয় সভা', 'সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ', 'টিচার্স সোসাইটি', 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' ইত্যাদি।

'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন' নামে যাই হোক, সেখানে ধর্মবিষয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল, জ্ঞানবিজ্ঞানই ছিল তাঁদের আলোচ্য। 'জ্ঞানসন্দীপন সভা'র নিয়মও ছিল তাই। 'ডিবেটিং ক্লাব'-এর উদ্দেশ্য ছিল 'ইংলণ্ডীয় বিদ্যা' বৃদ্ধি। রামমোহন রায়ের সিমলার স্কুলে ১৮৩২-এর শেষ দিকে 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা' স্থাপিত হয়। সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলা

ভাষার বিশেষ অনুশীলন। সভার সভাপতি ছিলেন রামমোহন-পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এবং সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ' বা 'সাধারণ-জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র সঙ্গে নব্যবঙ্গের মুখপাত্ররা প্রায় সকলেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার সাধারণ সভ্য ছিলেন। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কোনো নিষেধ ছিল না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হত।

'জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র সভ্যদের অনেকে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। ১৮৩৯-এর ৬ই অক্টোবর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে এর প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতিরা 'তত্ত্ববোধিনী'র বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যদিও 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা'র প্রচার সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তবু একালের আধুনিক সমালোচকও স্বীকার করেছেন যে "শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তত্ত্ববোধিনী সভার দান সমসাময়িক যে কোনো প্রগতিশীল সভার তুলনায় বেশী ছাড়া কম নয়।…কোনো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা তার ছিল না।…পূর্বেকার সমস্ত প্রগতিশীল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সভার যা কিছু ভাল তার সবটুকু বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে এবং যা কিছু মন্দ তার সবটুকু নির্ভয়ে বর্জন" করেছিল এই সভা। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' শিক্ষা বিষয়েও উৎসাহী ছিল। এদের পত্রিকা ও পাঠশালার কার্যকলাপের মধ্যে তার স্বাক্ষর আছে।

১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে 'বেথুন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি। সোসাইটির আলোচনা হত ইংরেজী, বাংলা বা উর্দুতে—সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে। ধর্ম ও রাজনীতি প্রথমে নিষিদ্ধ ছিল, পরে স্বীকৃত হয়।

১৮৫২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৮৫৯-এর মে মাসের মধ্যে পঠিত ও আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে সাহিত্যিক ও সামাজিক বিষয় তো ছিলই, আর ছিল এই ধরনের বিষয়: বাংলা শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা (প্যারীচরণ সরকার), কলেজীয় শিক্ষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্যের স্থান (প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী), কৃষ্ণনগরে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের চরিত্র

ও সামাজিক জীবন (উমেশচন্দ্র দত্ত), বাংলা শিক্ষাব্যবস্থা ও মাতৃভাষায় শিক্ষার সমস্যা (জগদীশনাথ রায়), বাংলায় ইংরেজী শিক্ষা (রেভারেণ্ড লালবিহারী দে) প্রভৃতি।

১৮৬৮ সালের ১০ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে 'বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা' বিষয়ে আলোচনা করেন। চাষী, মজুর, কারিগর প্রভৃতি সাধারণ মানুষেরা যে এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উপকৃত হচ্ছে না, এদিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি এই সমস্যা দূরীকরণের জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেন।

এই দিনেরই আলোচনা প্রসঙ্গে সোসাইটির তদানীন্তন সম্পাদক কৈলাশচন্দ্র বসু বলেন যে প্রতিটি মানুষের মানসিক শক্তি ও বৃত্তি সমূহের উন্মেষ সাধনই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত।

১৮৬৯-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারীর বিষয় ছিল 'শিক্ষিত ভারতবাসী, তাহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব।' বক্তা ছিলেন গোপালচন্দ্র দত্ত।

ঐ বছরের ২৯শে এপ্রিল ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষ বলেন, 'বাঙ্গালী সমাজের উপরে ইংরেজী শিক্ষার ফল' সম্পর্কে।

১৮৮১-এর ২৯শে এপ্রিলের (৮ই বৈশাখ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ) অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সঙ্গীত ও ভাব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং দৃষ্টান্ত-সঙ্গীত গান করেন। এই দিনের সভাপতি ছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধটি পরে (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৮৬৬ এর ১৭ই ডিসেম্বর মিস মেরী কার্পেন্টার 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র একটি বক্তৃতায় সমাজ-বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। এই প্রস্তাব বিবেচনা করে একটি খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করবার জন্য যে কমিটি হয় তাতে ছিলেন বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেভারেণ্ড লং, কেশবচন্দ্র সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মনমোহন ঘোষ প্রভৃতি। ১৮৬৭-এর ২২শে জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত 'Bengal Social Science Association' বা 'বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা'র চারিটি বিভাগ ছিল: আইন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি-বাণিজ্য।

শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞানসম্মত 'সার্কুলার' প্রণয়ণ করেছিলেন এঁরা। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র প্রশ্নমালাও এঁরা প্রচার করেছিলেন।

পরে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনও সম্প্রসারিত হয়। উনিশ শতকের

এই শিক্ষা-আগ্রহী আবহাওয়ার মধ্যেই মানুষ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর সে হাওয়াটা তাঁর বাড়ির মধ্যে ঘন আকারেই ছিল। এঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর ছাত্রজীবনের স্বীয় অভিজ্ঞতা।

তিন

চোখ-কান-খোলা যে কোন লোকের পক্ষেই অশিক্ষার দেশব্যাপ্ত জড়ত্ব সম্পর্কে অচেতন থাকা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ কথাটা আরো বেশী সত্য। তাঁর সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা ও প্রখর জীবনবোধ এর কারণ। বিপুল সংখ্যক মানুষের এই বাধ্যতামুলক ব্যর্থতা তাঁকে পীড়িত করত। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের মনের অজ্ঞানতার আবরণ অপসারিত না হলে সে যথার্থ সত্য, সৌন্দর্য, মঙ্গল ও আনন্দে আশ্রিত হতে পারে না।

এই আশ্রয় বৃহৎভাবে তিনি পেয়েছিলেন। সেইজন্য বঞ্চিতদের অপ্রাপ্তির পরিমাণটাও স্পষ্টভাবে পরিমাপ করতে পেরেছিলেন। মনুষ্য জগতের যেখানেই জড়ত্বের অভিশাপ বিরাজ করুক, তা সকল মানুষকেই কলঙ্কিত করে বলে তিনি মনে করতেন। দেশব্যাপী বিদ্যাহীনতার ব্যাধি দেখে তাই তিনি নিজেকে লজ্জিত, ব্যথিত ও অপরাধী মনে না করে পারতেন না। তাঁর সমগ্র জীবন-সাধনা পীড়িত হত, বাধা পেত। তাঁর শিক্ষা-চিন্তা তাই নিছক সংস্কার-চিন্তা নয়, তাঁর শিক্ষা-প্রসার-প্রয়াস তাঁর সমগ্র জীবন সাধনার অংশ বিশেষ। পূর্ণতা যাঁর জীবন লক্ষ্যের প্রতীক, অপূর্ণতার বিরুদ্ধে তিনি সদাজাগ্রত প্রহরী।

এই পাহারার, এই প্রয়াসের দুটো দিক। এক, তত্ত্বগত আলোচনা। দুই, প্রয়োগ। একদিকে চিন্তা, অন্যদিকে পরীক্ষা।

চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি এই কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের ওপর খুবই জোর দিয়েছিলেন :

ক। সার্বজনীন শিক্ষা।

সকল মানুষের অধিকার আছে শিক্ষায় এবং সেই শিক্ষা জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য—এই কথা আজকে আর বিশদভাবে আলোচনা করবার দরকার নেই। এ নীতি আজ সর্বস্বীকৃত।

খ। মাতৃভাষায় শিক্ষা।

শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা। বিদেশী ভাষার দরজায় হোঁচট খেয়েই

আমাদের শিক্ষাকাল শেষ হয়, বিদ্যার অন্দরমহলে আর ঢোকা ঘটে ওঠে না। বিষয় থাকে আমাদের অধীত, কিন্তু অধিগত নয়। বিদ্যা আমাদের মনের ওপর আটা দিয়ে জোড়া থাকে পরীক্ষা পর্যন্ত, তারপর ঝরে পড়ে। বিদ্যা আমাদের মনে বসে না; মেশে না, এক হয়ে যায় না। 'তোতাকাহিনী'র তোতার মতো বিদ্যা আমাদের মধ্যে গজগজ করে, তার জৈবিক আত্মসাৎ ঘটে না। মন তাই ভাল করে গজায় না। অঙ্কুর-মনকে আলো-বাতাস-রস দিই না, মুখস্থ বিদ্যার ওজন চাপাই। মনের বাড় নষ্ট হয় তাতে। মনকে রুদ্ধ করি, উদ্বুদ্ধ করে তুলি না।

মুখস্থ বিদ্যাকে তিনি এক ধরনের চৌর্যবৃত্তি বলেই মনে করতেন। "সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণশক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব যারা বই মুখস্থ করিয়া পাশ করে তারা অসভ্য রকমে চুরি করে, অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?" (শিক্ষার বাহন)

গ। শিক্ষার সামঞ্জস্য।

ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে, শিল্প সুষমার সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, আধুনিক বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে। এবং শিক্ষা হবে আনন্দের সঙ্গে।

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা দেশমানস থেকে বিচ্ছিন্ন। রবীন্দ্রনাথ এই বিচ্ছিন্নতাকে সমর্থন করতেন না। আর একটি কারণেও তিনি শিক্ষাকে ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুগত করতে চেয়েছিলেন। তিনি চাইতেন শিক্ষায়তনের আবহাওয়া হবে বিলাসিতাহীন, অনাড়ম্বর, শুচি, ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রকৃতি পরিবেশ-লালিত এবং শিক্ষক-ছাত্রের নিকট সংযোগ অন্তরঙ্গ।

একালের কন্ট্রাকটর-কারুনিক সরকার যখন শিক্ষার নামে শুধু ইমারত-আসবাব-আমলাতে সব টাকা খরচ করেন তখন রবীন্দ্রনাথের গাছতলার অনাড়ম্বর ক্লাসগুলির কথা স্মর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, "সত্যকে গভীর করিয়া দেখিলে দেখা যায়—উপকরণের একটা সীমা আছে যেখানে অমৃতের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা যেখানে দুর্বল। দৈন্য জিনিসটাকে আমি বড় বলি না। সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশী, তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটা ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে, সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে সেদিন সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তুকুয়াশার বিস্তর কলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে।" (শিক্ষার বাহন)

ভারতীয় ঐতিহ্যের উপকরণ-স্বল্পতা ছিল রবীন্দ্রনাথের কাম্য। "বহু-কুয়াশা"র পরিবর্তে "ভাব"-এর আবির্ভাব ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষিত। রবীন্দ্রনাথের তপোবনের আদর্শে এই অনাড়ম্বর ভাবটাই প্রধান। অনেকে ঐ আদর্শকে দেখতে চান আধুনিক-বিজ্ঞান-বিমুখ নিছক আধ্যাত্মিকতায় মুড়ে। আধ্যাত্মিক চিন্তা রবীন্দ্রনাথে অবশ্যই ছিল কিন্তু তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য স্মরণীয়।

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবেই বলেছেন, "আমি বলি নে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, কলকারখানার কোনোই প্রয়োজন নেই।" রবীন্দ্রনাথের ভয় আসলে ছিল যান্ত্রিকতায়। তিনি এই প্রবন্ধেই বলেছেন, "যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো করে তোলায় পশ্চিম সমাজে মানব সম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে।" এবং "এই যান্ত্রিকতায় যাদের মন পেকে যায় তারা যতই ফললাভ করবে ফল লাভের দিকে তাদের লোভের ততই অন্ত থাকে না। লোভ যতই বাড়তে থাকে, মানুষকে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না।"

চার

এই গেল রবীন্দ্র-শিক্ষাচিন্তার সংক্ষিপ্ত সূত্রাকার উল্লেখ কিন্তু এখানেই এ বিষয়ের শেষ কথা নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-আগ্রহ শুধু তত্ত্বে নয়, প্রয়োগেও।

তাঁর সুবিপুল শিক্ষা-সাহিত্যকে তিনি পুঁথির পাতায় কয়েকটি অক্ষর হিসেবে মাত্র পুরে রাখতে চান নি, জীবনের দুরূহ ক্ষেত্রে তাকে বাস্তব আকার দিতে চেয়েছিলেন।

তাঁর এই প্রয়োগের সর্বোত্তম স্বাক্ষর নিঃসন্দেহে বিশ্বভারতী, তাঁর আমলের বিশ্বভারতী। এখানে তিনি ঐতিহ্য-বিধৃত, প্রকৃতি-পরিবেশ-সম্পৃক্ত, বিজ্ঞানবুদ্ধি-সমন্বিত, শিল্পসৌন্দর্যবোধ সম্পন্ন সানন্দ শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দিতে চেয়েছিলেন।

বিশেষজ্ঞতার বিকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যায়তনের নিয়মিত শিক্ষা প্রয়োজনীয়, কিন্তু এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। সার্বজনীন শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বভারতী তার হস্ত বিশেষ প্রসারিত করতে পারছিল না। অথচ "শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর

কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সেদিকে খেয়ালই নাই", এই বর্বর মনোবৃত্তি ছিল তাঁর কাছে দুঃসহ।

বিদ্যায়তনের ব্যয়বহুল ও নিয়মবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে সকল মানুষের আসা সম্ভব ছিল না। এই বাধাকে রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করতে চেষ্টা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, প্রাচীন বাংলাদেশে মেলা, যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ-মহাভারতের গীতাভিনয় প্রভৃতি জনশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয় ছিল। এটা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন নিয়মানুগ শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষা নয়, কিন্তু দেশের ঐতিহ্য ও জীবন-নীতির শিক্ষা আনন্দের সঙ্গে পরিবেশনের ব্যবস্থা এখানে ছিল। এই সানন্দ শিক্ষাদান প্রথাকে রবীন্দ্রনাথ খুব বড় বলে মনে করতেন এবং নিজ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পথে গ্রহণও করেছিলেন।

কিন্তু আজ এই কথকতা-গীতাভিনয়ের পুরনো প্রথায় নব জীবন আনা বোধহয় আর সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ তাই নতুন একটি পন্থার কথা ভেবেছিলেন। শিক্ষায়তনের শিক্ষা যেমন সম্পূর্ণ নিয়মবদ্ধ, অভিনয়-কথকতা তেমনি সম্পূর্ণ নিয়মহীন। এ দুটো দুই বিপরীত ধারার রীতি। একটিতে নিয়ম ও ব্যয়ের বেড়া, সেটা ডিঙিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করা অনেকের পক্ষে দুরূহ। আর অন্য প্রথাটি এতই শিথিল যে তাতে শিক্ষা অত্যন্ত পরোক্ষ, অনক্ষর, অপরিকল্পিত এবং অপূর্ণ সুতরাং মাঝামাঝি আর একটা পন্থার প্রয়োজন। এই পন্থাটিই—লোক-শিক্ষা সংসদ।

বিশ্ববিদ্যালয় মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে দেশের সর্বদেহে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করবে কেমন করে, এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব—"একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপকভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইস্কুল-কলেজের বাইরে থেকেও দেশের পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরের মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না, তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করচে এইটি দেখবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষে সে রকম বহুলতার প্রয়োজন নেই। প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রবণতা থাকে বিষয় বিশেষে। সেই বিষয়ে আপন বিশেষ অধিকারের পরিচয়

দিতে পারলে সমাজে সে আপন বিশেষ স্থান পাবার অধিকারী হয়।" (বিশ্ববিদ্যালয়)

রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শ অনুযায়ী দেশের নানা জায়গায় লোকশিক্ষা সংসদের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। এই সব কেন্দ্রে একজন কেন্দ্রাধ্যক্ষের নেতৃত্বে ছাত্রদের সমাবেশ ঘটত। নিজেদের উদ্যোগে গড়া হত ক্ষুদ্র পাঠাগার। ঐ সঙ্গে অনেক জায়গায় থাকত পাঠচক্র। স্থানীয় অধ্যাপক-শিক্ষক-বিদ্বজ্জনের সহযোগিতায় সেখানে কিছু ক্লাসও (অনেকটা আলোচনা বৈঠকের মতো) হত।

এই পন্থায় নিয়মের কড়াকড়ি বা ব্যয়বাহুল্য ছিল না। নিজেদের অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে এই শিক্ষাকেন্দ্রে সুযোগ গ্রহণ করা চলত। প্রথমে বাংলা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, বিষয়গুলি ক্রমশ বাড়াবেন যাতে সকলেই তার প্রবণতা অনুযায়ী বিষয় নিয়ে পড়তে পারে।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, এই সংসদ মাধ্যমে দেশ জুড়ে পরীক্ষার বেড়াজাল পাততে। কিন্তু বর্তমানে সংসদের কেন্দ্রসংখ্যা দ্রুত হ্রাসের দিকে। নতুন বিষয় শুরু করা দূরের কথা, কার্যত শুধু মাত্র একটি বিষয়—বাংলা—টিমটিম করে টিঁকে আছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর একাজ এগোয় নি, বরং পেছিয়ে গেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিশ্বভারতী আসবার পর অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। লোক-শিক্ষা সংসদের পরীক্ষায় পাশ করলে আগে বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া হত। এখন তা দেওয়া হয় না। কর্তৃপক্ষের অযত্নে ও কর্মীর অভাবে এই প্রতিষ্ঠান মুমূর্ষু। কিন্তু আমাদের দেশের লোকশিক্ষা আজও এত পশ্চাৎপদ যে এ প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা যথেষ্ট।

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ভারত-মনীষীদের মধ্যেও শিক্ষার গুরুত্ব অনুভূত না হয়ে পারে নি। শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজি এবং স্বামী বিবেকানন্দের কথা এ প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়বে। মানব চিত্তের সম্ভাবনাগুলিকে জাগ্রত করবার কথা এঁদের শিক্ষা-চিন্তাতেও আছে। তবে এঁদের কারো পরিকল্পনা ও পরীক্ষাই

রবীন্দ্রনাথের মতো এত ব্যাপক ও সামগ্রিক নয়। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-কল্পনার তুলনায় সঙ্কীর্ণ। শ্রীঅরবিন্দ ও বিবেকানন্দ তাঁদের বিশিষ্ট ধর্মচিন্তার সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করেছেন। ফলে পণ্ডিচেরী বা বেলুড় (বা বিবেকানন্দপন্থী অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান) অন্য পন্থীদের পক্ষে অনুকূল নয়। এঁদের শিক্ষাচিন্তা অনেকটা পরিমাণে সম্প্রদায়গত। সম্প্রদায়-অনুসারী আধ্যাত্মিক উন্নতি এর মূল লক্ষ্য। ধর্মচিন্তা এঁদের শিক্ষাচিন্তার মূলে। "পণ্ডিচেরীতে প্রবর্তিত শিক্ষা শুধু উচ্চতম আধ্যাত্মিক অধিকারীদের পক্ষেই নেওয়া সম্ভব।" (বিশ্বভারতী প্রত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮১ শক)

রবীন্দ্রনাথেও ধর্ম আছে। কিন্তু সে ধর্ম সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। সাম্প্রদায়িক ধর্মকে তিনি তাঁর ব্যক্তিজীবনেই বর্জন করেছিলেন, সাধারণের শিক্ষার ক্ষেত্রে সেটা আনা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাঁর ধর্মকে হয়তো বলা যায় ব্যক্তিধর্ম। ব্যক্তির নিজের সম্ভাবনা, বোধ, বিবেক, সৌন্দর্যানুভূতির ওপর এর ভিত্তি।

আমাদের রেনেসাঁস চেয়েছিল Secular education। বিদ্যাসাগর ও 'ইয়ং বেঙ্গল' উভয়েরই সেই আদর্শ ছিল। মিশনারী ধর্মযাজকরাই ছিলেন ধর্মীয় শিক্ষার পক্ষে। আলেকজাণ্ডার ডাফ যখন প্রথম ভারতে আসেন (১৮৩০ খ্রীঃ), তখন তাঁর দুশ্চিন্তা হয়েছিল এই ভেবে যে তরুণরা Secular education-এ শিক্ষিত হচ্ছে। অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও ধর্মের প্রতি তাদের বিরাগ, ঔদাসীন্য। তাদের কাছে খ্রীষ্টধর্মের কথাটা বলা অসুবিধার হবে।

কলকাতায় আসবার দুমাস পরে ডাফ সাহেব জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশন (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন। মিশনারী-সুলভ দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে তিনি ধর্মশিক্ষারও ব্যবস্থা করেন। কিন্তু স্বাধীন নিরপেক্ষ চিন্তা—যা সে-আমলের বৈশিষ্ট্য ছিল, তাকেও তিনি সম্পূর্ণ অপসারিত করেন নি। অন্যধর্মী বা ধর্ম-নিরপেক্ষদের জন্য Secular ধরনের সাধারণ শিক্ষারও সুযোগ ঐ প্রতিষ্ঠানে ছিল।

এই সুযোগ পণ্ডিচেরী বা বেলুড়ে নেই। এখানে ধর্মটা শিক্ষার মধ্যে পুরো অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম বাদ দিয়ে শিক্ষা নেওয়া ওখানে অসম্ভব। ওখানে তারও নেওয়া হয় তাই বিশেষ ধর্মের। ডাফ সাহেবের প্রতিষ্ঠানে যার

অবারিত ছিল। অবশ্য সে বারণহীনতার একটা কারণ অখ্রীষ্টান ছাত্রদের কিছুটা আকর্ষণ করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও Secular শিক্ষা সেখানে সম্ভব ছিল, যা পণ্ডিচেরী বা বেলুড়ে সম্ভব নয়। এই দুই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ জীবনপদ্ধতি আছে। যার মধ্যে সম্প্রদায়গত ধর্ম-বিষয় ওতপ্রোতভাবে লিপ্ত। উনবিংশ শতকের হিন্দু রিভাইভালিজমের তরঙ্গ এই দুই জায়গায় তার স্পর্শ রেখে গেছে।

রবীন্দ্রনাথে এই ছোঁয়াচ লাগে নি। শান্তিনিকেতনের দ্বার অবারিত, শিক্ষা ও জীবনপদ্ধতি ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্ম যতটা আছে তার অর্থ আলাদা।

'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন, "বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবের আত্মা যুক্ত হইয়াই আমাদের দেবমন্দির স্থাপন করে এবং স্বার্থবন্ধনহীন মঙ্গল কর্মই আমাদের পূজানুষ্ঠান। এমন কি কোনো একটি স্থান আমরা পাইব না যেখানে 'শান্তংশিবমদ্বৈতম্' বিশ্বপ্রকৃতিকে এবং মানুষকে, সুন্দরকে এবং মঙ্গলকে এক করিয়া দিয়া প্রাত্যহিক জীবনের কাজে ও পরিবেষ্টনে মানুষের হৃদয়ে সহজে অবাধে প্রত্যক্ষ হইতেছেন? সেই জায়গাটি যদি পাওয়া যায় তবে সেইখানেই ধর্মশিক্ষা হইবে। কেননা পূর্বেই বলিয়াছি, ধর্মসাধনার হাওয়ার মধ্যে স্বভাবের গূঢ় নিয়মেই ধর্মশিক্ষা হইতে পারে, সকলপ্রকার কৃত্রিম উপায় তাহাকে বিকৃত করে ও বাধা দেয়।"

পণ্ডিচেরী বা বেলুড় "স্বভাবের গূঢ় নিয়ম"-এর ওপর ধর্মশিক্ষার ভার ছেড়ে দেয় না, বরং সম্প্রদায়গত "কৃত্রিম উপায়" তাদের চিন্তাকেন্দ্রে। "কোন প্রথা রূপকল্পনা বা বাহ্য প্রক্রিয়াকে সাধনার বাধা ও মানুষের বুদ্ধি ও চরিত্রের পক্ষে বিপজ্জনক" বলেই মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। ঐ প্রবন্ধেই তিনি ধর্মশিক্ষা উপযুক্ত যে আশ্রমের বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকেও তাঁর বক্তব্য বোঝা সহজ:

"সে ধর্মের পক্ষে এমন সকল আশ্রমের প্রয়োজন যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যোগ ব্যবধানহীন ও যেখানে তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধ স্বাভাবিক, যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণ বাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছে না, সাধনা যেখানে কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গল কর্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে, কোনো সংকীর্ণ দেশকাল পাত্রের দ্বারা কর্তব্যবুদ্ধিকে খণ্ডিত না করিয়া যেখানে বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ

করিবার অনুশাসন গভীরভাবে বিরাজ করিতেছে, যেখানে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধার চর্চা হইতেছে, জ্ঞানের আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সংকীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মানুষের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে না ও সংযমকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার উল্লাসই সর্বদা প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিষ্ক সভার নীরব মহিমা প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে না এবং প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দসঙ্গীত এক সুরে বাজিয়া উঠিতেছে, যেখানে বালকগণের অধিকার কেবলমাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যে বদ্ধ নহে—তাহারা নানা প্রকার কল্যাণভার লইয়া কর্তৃত্ব-গৌরবের সহিত প্রতিদিনের জীবনচেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে এবং যেখানে ছোটো-বড়ো বালক-বৃদ্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্বজননীর প্রসন্ন হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের এবং চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।"

এই চিন্তা রুশো এবং পরবর্তী যুগের রোমান্টিক কবিদের কারো কারো চিন্তার সঙ্গে একাধারে যুক্ত এবং তদপেক্ষা ব্যাপ্ত। এ চিন্তা বিবেকানন্দ অরবিন্দের থেকে পৃথক। পণ্ডিচেরী-বেলুড়ের ব্যবস্থা দেখলে এবং শ্রীমা বা বিবেকানন্দের শিক্ষা-বিষয়ক পুস্তক পড়লে এ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হবে।

এ যুগের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাচিন্তাবিদ A. N. Whitehead বলেছেন, "The essence of education is that it be religious"। এই religious education বলতে কী বোঝায় তার উত্তর তিনি নিজেই দিচ্ছেন এইভাবে, "A religious education is an education which inculcates duty and reverence. Duty arises from our potential control over the course of events. Where attainable knowledge could have changed the issue, ignorance has the guilt of vice. And the foundation of reverence is this perception, that the present holds within itself the complete sum of existence, backwards and forwards that whole amplitude of time, which is eternity." (*The Aims of Education*, p. 23)

এই religious education-এর সঙ্গে বিবেকানন্দ-অরবিন্দের ধর্মীয় শিক্ষার

সাদৃশ্য নেই। বরং রবীন্দ্রচিন্তার সঙ্গে হয়তো এর সামঞ্জস্য-সাধন সম্ভব। কারণ বিজ্ঞানশিক্ষা মাত্রই duty-কে স্বীকার করে এবং রবীন্দ্রচিন্তায় বিজ্ঞান-শিক্ষার স্থান আছে। আর reverence-এর ভিত্তি বলতে হোয়াইটহেড যা বোঝেন, তাও রবীন্দ্রচিন্তায় নানাভাবে বর্তমান।

ছয়

রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের পরীক্ষা হয়েছে অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে। সে পরীক্ষার সাংগঠনিক ও আর্থিক বনিয়াদ তত সবল ছিল না, একটি ক্ষুদ্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এর মূল পরীক্ষাগার। দেশের ব্যাপক ক্ষেত্রে সে চিন্তার বিচার ও পরীক্ষা করে দেখবার সময় অনেকদিন হল এসে গেছে। কিন্তু তার উদ্যোগ কোথায়? আজকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে যদি তার কিছু রদ-বদল প্রয়োজন হয়, তা করতে কোনো বাধা নেই। সেটা রবীন্দ্রচিন্তারই সজীব বিবর্তন বলে গণ্য করা যেত। কিন্তু রবীন্দ্র-শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের ভাবখানা পণ্ডিত ঠাকুরদার মূর্খ নীতির মতো, যে, পূর্বপুরুষের পুঁথি সিঁদুর মাখিয়ে ফুলবেলপাতায় পুজো করে নিত্য মাথায় ঠেকায়, কিন্তু একবারও পুঁথির মর্ম মাথায় ঢোকাতে চেষ্টা করে না। দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা আজও ইংরেজের দেওয়া ধরটা বয়ে চলেছে। নতুন ব্যবস্থার কথা বিশেষ ভাবা হয় নি। যতটুকুও ভাবা হয়েছে সে ঐ ছাঁচের মধ্যে থেকেই এবং সেখানে রবীন্দ্রচিন্তার প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ আছে। অগত্যা রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শ একমাত্র বিশ্বভারতীর মধ্যেই বন্দী।

কিন্তু তারই বা অবস্থা কি?

আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কথা বাদ দিচ্ছি। দুটি প্রধান সমস্যার কথা এখানে রাখছি।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর বিশ্বভারতীর শিক্ষাজীবনের সজীব প্রাণপ্রবাহ কিছুটা যেন স্তিমিত। ক্রমাগতই একটা যান্ত্রিকতা ও রুটিনবদ্ধতা ছায়া বিস্তার করছে। হোয়াইটহেডের উক্তিটি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে: "In the history of education, the most striking phenomenon is that schools of learning, which at one epoch are alive with a ferment of genious, in a succeeding generation exhibit

merely pedantry and routine. The reason is, that they are overladen with inert ideas. Education with inert ideas is not only useless, it is, above all things, harmful." (ঐ, পৃঃ ২)। অতএব শিক্ষার সবচেয়ে কেন্দ্রীয় সমস্যাই হচ্ছে "the problem of keeping knowledge of alive, of preventing it from becoming inert." (ঐ, পৃঃ ৭)। শিক্ষাকে সফল হতে হলে তাকে সজীব হতেই হবে। "For successful education there must always be a certain freshness in the knowledge dealt with."

আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বের সার্থকতা কোথায়?

জ্ঞান ও জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থকতা, "The justification for a University is that it preserves the connection between knowledge and the zest of life, by uniting the young and the old in the imaginative consideration of learning."

এই সার্থকতার পরিমাণ বিশ্বভারতীতে কমতে শুরু করেছে। এই প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হচ্ছে হয়তো বহু কারণে। কিন্তু তার মধ্যে একটি নিঃসন্দেহে সরকারী শাসননীতি।

বিশ্বভারতী সরকারী হয়ে যাবার সময় শ্রীনেহরু বলেছিলেন যে বিশ্বভারতীর নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতি বজায় রাখা হবে। কতটা তা রাখা হচ্ছিল তা এতদিন তর্কসাপেক্ষ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তর্কের দিন শেষ হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বলেছেন যে বিশ্বভারতীকে আর দশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো হতে হবে, নচেৎ টাকা বন্ধ। অতএব এবার বোধহয় বিশ্বভারতী নিজেকে আরো ছেঁটে-কেটে ভেঙ্গে-দুমড়ে ইংরেজ-সৃষ্ট সেই খাঁচায় ঢুকে যাবে—যে খাঁচাকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে গিয়েছেন, "pseudo-educational establishment"। (শিক্ষাসংস্কার)

হোয়াইটহেড প্রতিটি স্কুলকে আলাদা ইউনিট হিসেবে দেখতে চান, আর ভারতবর্ষে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কেও একটা ইউনিট হিসেবে গড়ে উঠতে দেব না।

বিদ্যালয়, এবং ঐ সূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বকীয়তা সম্পর্কে হোয়াইটহেড যা বলেছেন তা উদ্ধারযোগ্য: "Each school should grant its own leaving certificates, based on its own curriculum. The

standards of these schools should be sampled and corrected. But the first requisite for educational reform is the school as a unit, with its approved curriculum based on its own needs, and evolved by its own staff. If we fail to secure that, we simply fall from one formalism into another, from one dung-hill of inert ideas into another....Each school must have the claim to be considered in relation to its special circumstances. The classifying of schools for some purposes is necessary. But no absolutely rigid curriculum, not modified by its own staff, should be permissible. Exactly the same principles apply, with the proper modifications to universities and the technical colleges.' (ঐ, পৃঃ ২১-২২)

ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার জড়ত্ব দেখে হোয়াইটহেড ক্ষুব্ধচিত্তে বলেছেন, "When one considers in its length and in its breadth the importance of this question of the education of a nation's young, the broken lives, the defeated hopes, the national failures, which result from the frivolous inertia with which it is treated, it is difficult to restrain within oneself a savage rage. In the conditions of modern life the rule is absolute, the race which does not value trained intelligence is doomed. Not all your heroism, not all your social charm, not all your wit, not all your victories on land or at sea, can move back the finger of fate. To day we maintain ourselves. Tomorrow science will have moved forward yet one more step, and there will be no appeal from the judgment which will then be pronounced on the uneducated." (ঐ, পৃঃ ২২-২৩)

ইংলণ্ডের অবস্থা দর্শনেই এত ক্ষোভ ও আশঙ্কা! ভারতের অবস্থা যে নিঃসন্দেহে আরো অনেক মারাত্মক। আমাদের চারিদিকের সেই অন্ধকারে রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি প্রাণের আলো জেলে পথ দেখি-

পারেন। কিন্তু আমরা আলোর দিকে চোখ বুজে থাকব এবং নাম-মাহাত্ম্যের দেশের উপযুক্ত বাসিন্দা হিসেবে শুধু হয়তো রবীন্দ্রনাথের নাম সংকীর্তন করব।

রবীন্দ্রনাথ এক সময় টলস্টয়ের উক্তি উদ্ধার করে বলেছিলেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের অংশগ্রহণ সচেতনভাবে বর্জন করতে হবে (It seems to me that it is now specially important to do what is right quietly and persistently, not only without asking permission from Government but consciously avoiding its participation.—শিক্ষাসংস্কার)। বিশ্বভারতী সৃষ্টির মূলে এ চিন্তাটা রবীন্দ্রনাথের ছিল। তাই আর্থিক দারিদ্র্য সর্বদা বর্তমান থাকলেও তিনি কখনও সরকারের দ্বারস্থ হন নি, কারণ তিনি জানতেন যে সরকার এক হাতে যদি টাকা দেয় অন্য হাতে তবে তাঁর আদর্শকে দলিত করে একটি ছদ্মশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত করে দেবে বিশ্বভারতীর লেবেলের অন্তরালে। এই বিক্রয়-ব্যবস্থা তাঁর পছন্দ হয় নি। তিনি জানতেন, "The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore always oppose true enlightment." (শিক্ষাসংস্কার)। স্বাধীনতার পরও কি সরকার সম্পর্কে এই উক্তি বলবৎ থাকবে ?

আরো ভয় হয় যখন দেখি, বিশ্বভারতী পত্রিকার মতো কাগজেও এই রকম লাইন বেরোয়, "রবীন্দ্র-কল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে সকলের জন্য বললে ভুল বলা হবে।" (বৈশাখ-আষাঢ়, ১৮৮১ শক)।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিক্ষাচিন্তাই এই উক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষী। সুতরাং আলোচনা অপ্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিতা

(১৯৪১—৬১)

মণীন্দ্র রায়

বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের মধ্যে রবীন্দ্রচর্চা অনেকটা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো মনে হলেও ব্যাপারটা অনিবার্য তাতে সন্দেহ নেই। একে তো রবীন্দ্রনাথ এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। তার উপর আমাদের দৈনন্দিন সময়াভাব এবং বিশেষ করে ক্ষমতার অভাবও কম উল্লেখযোগ্য নয়। ফলে অধিকারীভেদে চারিদিকের খণ্ড খণ্ড আলোচনা ছাড়া উপায় নেই। এই সীমাবদ্ধতা আমি মেনে নিয়েছি।

আমার আলোচ্য বিষয় কবিতা। কিন্তু তাও সমগ্রভাবে নয়, কবিতার মূল বক্তব্য এবং প্রবণতাগুলিকেই আমি উপজীব্য করেছি। আসলে এটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনাও নয়, খসড়া মাত্র। বর্তমান শতবার্ষিকীর উৎসবে এদিকে যোগ্যতর ব্যক্তির দৃষ্টি পড়লে খুশি হব।

আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য তাই কতকগুলি প্রশ্ন তুলে ধরা। প্রশ্নগুলি প্রধানত রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিষয়ে নয়। রাবীন্দ্রিক কবিতার মূল বক্তব্যের আলোয় রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর এই (১৯৪১—৬১) কুড়ি বছরে বাংলা কবিতায় কবিগুরুর মন্ত্র কতটা চিত্তোৎকর্ষ ঘটিয়েছে, তারই খবর নেওয়া আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

ব্যাপারটা এমনিতে ধান ভানতে শিবের গীতের মতো শোনালেও এর তাৎপর্য আছে, এবং তা তুচ্ছ নয়।

সাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা বা ঐ জাতের কিছু অনেকের কাছে হয়তো রুচিকর না হতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্রের মতোই, সাহিত্য যে সমাজবাসী মানুষের দ্বারা সামাজিক চিন্তাভাবনার ব্যবহারে 'সামাজিক'-দের জন্যেই রচিত হয়, এ বিষয়ে অনেকেই একমত হবেন। কাজেই সমাজ বদলালে সাহিত্যও যে বদলাবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অবশ্য তার গতি ঢিমে হতে পারে, সামনে না হয়ে পিছনেও হতে পারে।

সাহিত্যিকদের সচেতনতা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদির দ্বারা নির্ণীত হয় সে সব গতিপ্রকৃতি।

সমাজ আমাদের দেশেও বদলে যাচ্ছে। এটা নিছক সময়ের খেলা নয়, আরো কিছু লক্ষণীয় আছে এর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে একচল্লিশে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে উনচল্লিশে। কিন্তু আমাদের দেশে তার ধাক্কা এসে লাগে মোটামুটি চল্লিশোত্তর যুগেই। ভারতের পূর্বসীমান্তের দিকে জাপানের অগ্রগতি, সারা দেশে বিদেশী মিত্র-সৈন্যের অবাধ সঞ্চরণ, কলকাতায় নিষ্প্রদীপ, মূল্যবৃদ্ধি, দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের করালছায়া, বোমাবর্ষণ ইত্যাদির ফলে বাংলাদেশ দু-তিন বছরের মধ্যেই ভয়ানক রকম বিপর্যস্ত হয়ে উঠল। এরই সঙ্গে এল রাজনৈতিক সংঘর্ষ, রাস্তায় আগুন, রক্তপাত, জন্ম-যন্ত্রণা। আর তারপরই জোয়ারের উল্টো টানে দাঙ্গা, তড়িৎগতি স্বাধীনতা-লাভ, দেশবিভাগ। তারপর আবার দাঙ্গা, উদ্বাস্তুর বন্যাস্রোত; সঙ্গে সঙ্গে জমির লড়াই, তেভাগার রক্তপাত; ওদিকে উদ্বাস্তুর বাঁধ-ভাঙা স্রোত কিন্তু তেমনি রইল। পরবর্তী ইতিহাস এখনো টাটকা আছে, মনে করানোর দরকার নেই। কুড়ি বছরের মধ্যেই একটা সমাজের উপর দিয়ে যে ঘটনাস্রোত বয়ে গেছে, তা আগেরকালে একশো বছরেও ঘটত কিনা সন্দেহ। এর ফলে আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সাহিত্যও নিশ্চয় বদলে গেছে, বদলে যাচ্ছে। কবিতার ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তনটা কোন্ দিকে, তাই আমার আলোচ্য বিষয়।

একটি বা দুটি সূত্রের মধ্যে রবীন্দ্রকাব্যের মূল বক্তব্যকে বেঁধে দেওয়া শক্ত ব্যাপার। এ বিষয়ে প্রধান অন্তরায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই! এত কবিতা এবং গান তিনি লিখেছেন যে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু আলোচনাকারী নিজের মতের সপক্ষে অনায়াসে রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতির জোগান পেতে পারেন, এবং কখনো কখনো সে সব মত পরস্পরবিরোধী হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব যেহেতু মূলত অসংহত নয়, সে জন্যে এই মতারণ্যের মধ্যেও পথ বের করা অসম্ভব না হতে পারে।

মোটামুটি, মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং সৌন্দর্যচেতনা এই দুটিকে যদি রবীন্দ্র-কাব্যধারার দুদিকের তীর বলা যায়, তবে বোধহয় তেমন কিছু আপত্তি উঠবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরবিশ্বাসী কবি। কিন্তু তাঁর ভগবদ্‌প্রেমের মধ্যে একটা

বড় ব্যাপার হল, শুধু ভগবানের জন্যে মানুষের আকুতি নয়, মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে ভগবানেরও ব্যাকুলতা। বিশ্বসংসারে মানুষের গুরুত্ব এবং অমূল্যতা রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে এই পরম উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে, সৌন্দর্যচেতনাও রবীন্দ্রনাথের মনে মানুষের রসাস্বাদনের অতুলনীয় ক্ষমতার মধ্যেই সার্থক। 'আমি' নামক কবিতায় এই দুই বোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। সেজন্যে কবিতাটি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া অবশ্য অন্য দিকও আছে। যেমন, 'চৈতালি'র 'কাব্য' নামক কবিতায় (তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ, যত···ইত্যাদি) তিনি বলেছেন, কবির আসল মহিমা এই যে, সংসারের সমস্ত সুখ-দুঃখ আঘাত ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে বাস করে "অপমানভার, অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার, অভাব" ইত্যাদিতে ছিন্নভিন্ন হৃদয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করেও, পাঁকের উর্ধ্বে "আনন্দের সূর্যে"র দিকে "সৌন্দর্যকমল" ফোটাতে পারেন তিনি। অর্থাৎ,

"জীবনমন্থনবিষ নিজে করি' পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান" ॥

শুধু সৌন্দর্যবোধ নয়, রবীন্দ্রনাথ কেন যে এত "আনন্দ গান" গাইবার পক্ষপাতী তারও চাবিকাঠি মিলবে এর মধ্যেই। অন্য একটি কবিতায় "আমারে বলে যে ওরা রোমান্টিক রসতীর্থ পথের পথিক' বলে নিজের রোমান্টিকতার সপক্ষে ঈষৎ সাফাই গাইবার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু পূর্বাপর মনে রাখলে সেটা ঠিক সাফাই না বাঁকাহাসি সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। কারণ তাঁর "রসতীর্থে"র দিকে আগ্রহকে কোনোক্রমেই পলায়নী-প্রবৃত্তি বলা যায় না ; বরং বলা যায়, অপরিসীম করুণা এবং মমতাবোধেরই যোগফল। সংসারে অশেষ দুঃখ-গ্লানি আছে বলেই এই সন্তপ্ত জগতের শিয়রে তিনি যেন নিজের বাগান থেকে তুলে একগুচ্ছ ফুল রেখে যেতে চান, যাতে উত্তপ্ত মানুষের স্নায়ুশিরা কিছুটা শুশ্রূষা পায়, মানুষ আরোগ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারে।

বলাবাহুল্য এ বড় কঠিন ব্রত। আর রবীন্দ্রনাথ, যিনি নিজেকে "গাথো... বলেছেন এবং যিনি এই কঠিন ব্রতে ভীষ্মের মতোই অটল ছিলেন, তিনি যেন শেষজীবনে ইচ্ছামৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শেষ পর্যায়ের কবিতা এবং প্রবন্ধগুলিতে তাঁর এই মূল্যবোধের সংকট ক্রমে কী পরিমাণে তীব্র হয়ে উঠছিল, রবীন্দ্রবিদ্ পাঠক নিশ্চয়ই তার হদিশ রাখেন। পুনরবি

...প্রয়োজন। তবে এর মধ্যেও যা প্রধানত উল্লেখযোগ্য তা এই যে, রবীন্দ্রনাথ স্বধর্মচ্যুত হন নি। তাঁর শেষ কবিতার শেষ পংক্তি কটি হল,

লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার ॥

(তোমার সৃষ্টির পথ)

ব্যাখ্যা যেমনই হোক, এই কবিতার মধ্যে যে একটি ধ্রুব বিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

দুই

একচল্লিশ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকালে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন কারা? জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন এবং নবাগত সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য এই তালিকা বয়স অনুসারে সাজানো, গুরুত্ব অনুসারে নয়। এঁদের কাছাকাছি আরো ছিলেন অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, ...প্রসাদ মিত্র এবং বর্তমান লেখক। আর তার পরেই দেখা দিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেশ গুহ প্রমুখ কবিরা। যাই হোক তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। আসল কথায় আসা যাক।

প্রথম পংক্তিতে ছিলেন যে সব কবি, তাঁদের মধ্যে সুধীন্দ্র দত্ত ...কালের মধ্যেই কাব্যরচনায় বীতস্পৃহ হন। অন্য সকলেই মানবতা-বিরোধী যুদ্ধের বিরুদ্ধে কিংবা যুদ্ধসঞ্জাত দুর্ভিক্ষের প্রতিবাদে কবিতা রচনা

করেছিলেন। এমনকি জীবনানন্দ দাশ বা বুদ্ধদেব বসুও বাদ যান নি। পরবর্তী কবিরাও সেই সুরেই মূলসুর বেঁধেছেন।

কবিদের ভিতর ক্ষমতার তারতম্য ছিল, দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য ছিল যথেষ্ট। কিন্তু মনুষ্যত্বের অবমাননার প্রতিবাদে সকলেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শরিক। এই মনোভাব পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ সাল অর্থাৎ দাঙ্গা এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত একটানাই আত্মপ্রকাশ করছিল। রাজনৈতিক পরাধীনতার জন্যে তখন কবিদের মধ্যে মোটামুটি একটা সাধারণ মিলনক্ষেত্র ছিল বোধ হয়। তবে এর মধ্যেও স্তরভেদ ছিল। যেমন বিষ্ণু দে যে-পরিমাণে মুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন, অমিয় চক্রবর্তী বা জীবনানন্দ দাশ তা হয়তো ছিলেন না। কিন্তু এঁরাও ছিলেন যন্ত্রণাবিদ্ধ। তেমনি ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অজিত দত্ত। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ক্রমে হয়ে উঠল "মায়াবী টেবিলে"র সংকীর্ণ "আলোর বৃত্তে" অন্তর্মুখী এবং কাব্যৈক-ভাবনাময়ী। ওদিকে সুকান্ত রবীন্দ্রনাথকে সোজাসুজি গ্রহণ করেই বিপ্লবী কবিতায় সিদ্ধিলাভ করলেন। কিন্তু সমর সেন ক্রমে কবিতার রাজ্য থেকে বিদায় নিতে লাগলেন।

অবশ্য বক্তব্যের আলোচনাই কবিতার একমাত্র কথা হতে পারে না। কী লিখব এটা যত গুরুত্বপূর্ণ, কেমন করে লিখব, তাও সেই ওজনের আলোচ্য ব্যাপার। রচনার দিক দিয়ে, কাজেই কবিতার মোট রসাস্বাদনের দিক দিয়ে, রবীন্দ্রনাথের থেকে স্বতন্ত্র হলেন জীবনানন্দ দাশ এবং বিষ্ণু দে। এই সময়টাতে এঁরা দুজনেই অজস্র কবিতা লিখেছেন। কিন্তু স্বীকার করতে হবে, উদ্দেশ্যের সততা থাকা সত্ত্বেও জীবনানন্দ দাশ অনেক সময় স্বধর্ম রক্ষা করতে না পেরে কখনো বিশৃঙ্খল কখনো বা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছেন। অথচ গোড়ায় যিনি দুর্বোধ্য বলে 'সুনাম' কিনেছিলেন সেই বিষ্ণু দে দেখা গেল নিজের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেই আত্মপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলেন। এঁদের বিষয়ে পরে আসছি।

এঁরা ছাড়া তৃতীয় যিনি প্রকরণগতভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন অমিয় চক্রবর্তী। তাঁর কবিতাতেও অন্য চেহারা দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের থেকে অন্য রকম। কিন্তু এই পার্থক্যটা মনের উপর স্থায়ী প্রভাব আনতে পারে কিনা সন্দেহ। কারণ বক্তব্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের এত কাছাকাছি যে আধারটা নতুন দেখালেও রসের 'চর্বণা'র সময় কেমন যেন চেনা-চেনা লাগে। তার ফলে তিনি তাঁর কৃতিত্বের পুরো মূল্য পান না।

কিন্তু তবু তিনি উল্লেখযোগ্য। কারণ, রবীন্দ্রনাথকে ভিতরে বাহিরে গ্রহণ করে সিন্ধুতে বারিবিন্দুর মতো মিশে না গিয়ে পুরনো কথা নতুন করে বলাও কম শ্রদ্ধনীয় নয়। তাছাড়া কাব্যপাঠক মাত্রেই জানেন, নতুন করে বলতে পারলে পুরনো কথাও কিছুটা নতুন ব্যঞ্জনা পায়। এ কথা কেবল অমিয় চক্রবর্তী নয়, শুনতে আচমকা লাগলেও বলা দরকার, সুকান্তের ক্ষেত্রেও সত্য, যদিও তাঁর নতুন করে বলাটা একেবারেই প্রকরণগত নয়, আবেগগত।

মোটামুটি বলা যায়, সময়টা ছিল তখন ঘটনার টানাপোড়েনে বিচিত্ররূপী। সে সময়ের কবিতাও তাই আজ মনে হয় বহুবর্ণ এক নক্সী কাঁথা। অপটু হাতের ছাপ যে তাতে কম আছে তা নয়, কিন্তু গোটা ছকের মধ্যে তা মানিয়ে গেছে। ঐ ছকটা আঁকা হয়েছিল স্বাধীনতা-কামনার আবেগে এবং ঐতিহ্যে।

তিন

স্বাধীনতা পাওয়ার পর অবস্থাটা অন্যরকম হতে লাগল।

ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ কবিদেরও অবস্থান পরিবর্তন ঘটেছে। বহুদিন নীরব থাকার পর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আবার কবিতা লিখতে শুরু করলেন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধ তাঁর মধ্যে চিরদিনই প্রবল। তবু আগে তার সঙ্গে উদার-নৈতিক মানবতার যোগ ছিল। (ক্রন্দসী দ্রষ্টব্য।) কিন্তু যুদ্ধ এবং তার আনুষঙ্গিক মূল্যবোধের ইন্দ্রপাত তাঁকে আত্মজিজ্ঞাসায় এমন নিষ্ঠুর করে তুলল যে, তিনি মানুষের ভবিষ্যতের প্রতিই যেন ক্রমে বিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন। অবশ্য এর মধ্যে অসহায়ত্ব এবং অভিমানও ছিল প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু সেটাও মূলত তাঁর স্বসমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা থেকেই উদ্ভূত। জানি, কবির কাছে বাস্তবের হুবহু প্রতিফলন আশা করা অন্যায়। তেমনি অসঙ্গত হবে, রাজনৈতিক টানাপোড়েনের রোজনামচা আশা করা। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ তো সত্যি সত্যি নিস্পৃহ থাকতে পারেন নি। (সংবর্ত দ্রষ্টব্য।) বিশ্ব-রাজনীতি সঙ্গত কারণেই তাঁর কাব্যে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে। বর্জিত হয়েছে শুধু স্বদেশী রাজনীতি, এবং সমাজনীতি। যদিও এই বর্জনও একধরনের নির্বাচন, এবং তা কবিকে উপযুক্ত মহত্ত্ব দেয় না।

সুধীন্দ্রনাথের রচনারীতিতেও এই অনুদার কাঠিন্যের চাপ পড়েছে। তাঁর

শেষ দিকের কবিতা তাই বাগ্ময়, কিন্তু সুষমাবর্জিত। তিনি সামর্থ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কবিতাকে তিনি নিছক যুক্তিরই সেবাদাসী করে ফেলেছেন, হৃদয়স্বসা করতে পারেন নি।

তুলনা অস্বাভাবিক ঠেকলেও এই প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের কবিতাও বিশেষভাবে আলোচ্য। কারণ বিষণ্ণতার অনুভবে তিনি সুধীন্দ্রনাথের অংশীদার, তাঁর কবিতাও জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতার বেদনায় দীর্ঘশ্বাস-মথিত কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে কোনো জ্বালা ছিল না। তাঁর পল্লীকেন্দ্রিক কবিতায় হেমন্তের হলুদ ছিল, বৈশাখের বজ্র অনুপস্থিত। পরবর্তীকালে যুদ্ধ, নিপীড়ন এবং দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত তাঁর নাগরিক জীবনের কবিতাতে যন্ত্রণা অনেক প্রবল হয়ে ওঠে। (সাতটি তারার তিমির দ্রষ্টব্য।) তবে সেইসঙ্গে দেখা দেয় সহানুভূতি এবং মমতাবোধ, যা শেষ জীবনের কবিতায় ক্রমে এক নতুন ভবিষ্যতের শান্তিতেও উত্তীর্ণ হতে চাইছিল।

সুধীন্দ্রনাথ যাত্রা শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে। জীবনানন্দ দাশ আরম্ভ করেন রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে। জীবন-বিচ্ছিন্নতা সুধীন্দ্রনাথকে মানবপ্রেমহীনতা এবং সৌন্দর্যহীনতার মরুভূমিতে নিয়ে গেল। ফলে তিনি হয়ে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রঐতিহ্য-লুপ্ত কবি। অন্যদিকে জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রনাথকে রচনার আঙ্গিকে স্বীকার না করেও জীবনের বেদনার অনুভূতিতে এসে উপস্থিত হলেন রবীন্দ্রনাথেরই ভাবমণ্ডলের কাছাকাছি।

> সেইসব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
> চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় ;
> জয় অস্তসূর্য, জয় অলস অরুণোদয়, জয়।
>
> (সময়ের কাছে)

আগেই বলেছি, প্রাথমিক রবীন্দ্রপ্রভাব বর্জনে বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে আর একজনমাত্র কবি উল্লেখযোগ্য—বিষ্ণু দে। ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং আঙ্গিক-নৈপুণ্য তাঁর রচনায় এমন একটা তীক্ষ্ণতার ঔজ্জ্বল্য এনেছিল যা প্রাক-তিরিশের অতি-সুকুমার এলায়িত বাংলা কবিতার পরিবেশে চমক সৃষ্টি করেছিল। বুদ্ধি আর আঙ্গিক-নৈপুণ্য সুধীন্দ্রনাথের কবিতাতেও ছিল, কিন্তু তবু এঁদের ভিতর পার্থক্য ছিল মনোভাবে। বিষ্ণু দের ছিল উৎস-সন্ধানের আগ্রহ। তাই বুদ্ধিজীবী জীবনের বিচ্ছিন্নতা-বোধকে তিনি সুধীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিগত স্তরে আবদ্ধ না রেখে তিরিশের যুগেই তাঁর

খুঁজতে গেলেন সমাজের মাটিতে। এবং 'সুরেশ-অলকার' 'চোরাবালি' এড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি পড়ল শ্রেণীবিন্যাসের কার্যকারণ সম্বন্ধে।

ফলে 'চল্লিশের যুগে'র আগেই এই 'তিরিশের কবি' পায়ের নিচে দাঁড়াবার জায়গা খুঁজে পেয়েছিলেন। ('পূর্বলেখ' দ্রষ্টব্য।) আর তারই ফলে চল্লিশোত্তর যুগে দেখা দেয় '২২শে জুন' এবং বিশেষ করে 'সাতভাই চম্পা'-র আশ্চর্য কবিতাগুলি। এই শেষোক্ত বইয়ে সংকলিত কবিতায় বিষ্ণু দে রচনারীতিতেও যেমন অনেক স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলেন, তেমনি ফিরে পেলেন আবেগের স্বভূমি। এর পর থেকে 'সন্দীপের চর', 'অন্বিষ্ট', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তাঁর কবিজীবনের বিকাশ অব্যাহত গতিতেই চলেছে। এবং যদিও কখনো কখনো বিষয়ের অতিবিস্তার বা তাঁর আঙ্গিকের ধ্রুপদীরীতি এই পর্যায়ে ঠিক সুষম হয়ে উঠতে পারে নি, তা সত্ত্বেও তিনি এই জীবন-অন্বেষণের একনিষ্ঠতাতেই ক্রমে এখন মানবিক করুণায় অনেক পরিমাণে সার্থক বলে মনে হয়। তাছাড়া নিজের স্বধর্মকে বজায় রেখে রবীন্দ্র-উত্তরাধিকারকে এমনভাবে গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত কেবল বিষ্ণু দের নিজের কবিতার ক্ষেত্রেই নয়, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে, তাও লক্ষ্য করা দরকার।

ছয়

পঞ্চাশোত্তর যুগের নতুন কবিদের আলোচনায় এসে আমরা কিন্তু খেই হারিয়ে ফেলি। সমালোচকদের সাহসের অভাব একটা কারণ, কবিদের আপেক্ষিক অপরিণতি আরেকটা কারণ। কিন্তু সেইখানেই শেষ নয়।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর আমাদের জাতীয় জীবনের সামনে কোনো মূল লক্ষ্য একাগ্র হয়ে ওঠেনি। পরিকল্পনা এবং দেশগঠনের ব্যাপারটা চোখের উপরেই আছে বটে, কিন্তু মিশ্র-অর্থনীতির গোলমেলে বিকাশের অস্বচ্ছতায় পটভূমিটা কিছুতেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে চাইছে না। ইতিমধ্যে পরিকল্পনা এবং বেকারত্ব হাত ধরাধরি করে চলেছে, বরং বেকারত্বের অস্থির পদক্ষেপই যেন দ্রুততর। এ এক আশ্চর্য স্ববিরোধী ব্যাপার।

আমাদের তরুণতর কবিরাও ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এই জটিল পরিস্থিতিরই ফলশ্রুতি। এঁদের ভিতর অনেকের হয়তো একটা জীবন-বিশ্বাস আছে, অনেকের তা নেই, কিন্তু রচনার ক্ষেত্রে অনেককেই তবু দেখি বিহ্বল, অস্পষ্ট,

আঙ্গিকমগ্ন। দক্ষতা এঁদের অনস্বীকার্য, এবং যখন বাস্তব পরিস্থিতির কথা মনে রাখি তখন এঁদের অভিমন্যু-বীরত্বে সমস্ত হৃদয় মমতায়, বেদনার্ত না হয়ে পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে হয় এ ব্যূহ থেকে বেরোবার রাস্তা যেন এঁদের অনায়ত্ত রয়ে গেছে।

কবিরা রাগ করবেন না। বর্তমান লেখক নিজে কবিতা-রচনার প্রয়াস করেন এবং জানেন, তিনিও ঐ একই চক্রের ফাঁদে আবদ্ধ। কাজেই এ মন্তব্যকে নিন্দা না মনে করে আত্মচিন্তার প্রয়াস মনে করলে সুবিচার হবে।

একথা অত্যন্তই সত্য, সমাজে কোনো ব্যাপক পরিবর্তনের ভূমিকা না থাকলে নিছক শিল্প-সাহিত্যে পরিবর্তনটা জোর করে আমদানি করা যায় না। কিন্তু এও সত্য যে, সমাজের অগ্রবর্তী অংশে কোন্ ভাবনা অঙ্কুরিত হচ্ছে তার আবিষ্কার এবং তাকে জাতীয় মানসে রোপন করে ফুল্ল-কুসুমিত করে তোলার দায়িত্ব ও শিল্পী-সাহিত্যিকদেরই।

তরুণ কবিদের মধ্যে কেউই সে দায়িত্ব পালন করছেন না, এ কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। বরং প্রয়াসটা যে অনেকের ক্ষেত্রেই প্রবল এইটেই সত্য-ভাষণ। কিন্তু রচনার মধ্যে সেই প্রয়াসের ছাপটা অনেকখানি একরোখা হয়ে উঠছে, সেইটেই হয়েছে মুস্কিল।

কবিরা অবশ্য বলতে পারেন, তাঁদের পূর্ববর্তী দশকে বেশ জোর গলায় 'সদা সত্য কথা কহিবে' ধরনের যেসব সরলীকৃত সুসমাচার লেখা হয়েছে, তারই প্রতিবাদে তাঁদের এই আঙ্গিক-সচেতনতা। কিন্তু তা করতে গিয়ে তাঁরা আরো পিছু হ'টে তিরিশের যুগের প্রসাধন-সর্বস্বতায় আত্মসমর্পণ করছেন কিনা সেটাও ভেবে দেখা সঙ্গত।

আজ ষাটের যুগে দাঁড়িয়ে আমাদের তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরব্যাপী আধুনিক কবিতার গোটা ঐতিহ্যেরই সম্মুখীন হওয়া দরকার। তালিকা তৈরি করলে অন্তত বিশজন কবির নামোল্লেখ করা যায় যাঁরা শক্তিমান। তাঁদের অবদান ভেবে দেখতে হবে, বাংলা কবিতাকে তাঁরা কীভাবে সার্থকতার পথে আনতে পারেন, এবং নিজেরাও হতে পারেন বিশিষ্ট। একালের আধুনিক কবিতা যে ক্রমে তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে উঠছে সেটা মোটেই সুখের ব্যাপার নয়।

এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথকে। আলোচনার শুরুতে মানবপ্রেম এবং সৌন্দর্যচেতনার বিষয়ে যা বলেছি, তারই পটভূমিতে ভাবতে

হবে, কীভাবে ঐ দ্বৈতাদ্বৈত-বোধকে বর্তমান পটভূমিতে গ্রহণ করা যায়। আমাদের কবিতার মধ্যে মাঝে মাঝে যে ক্ষোভ, অভিমান, একাকীত্ববোধ এবং তুরীয়-ভাবনা আত্মপ্রকাশ করতে চায়, তার কতটুকু রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলে, কতটুকু মেলে না? রবীন্দ্রনাথকে যেখানে আমরা পরিহার করেছি তা কতদূর সুফলদায়ক হয়েছে অথবা হয় নি? এই সব চিন্তা আজ অত্যন্তই জরুরী। আর তারই সঙ্গে যুক্ত হওয়া দরকার এই উপলব্ধি যে, বিশ্বভাবিত রবীন্দ্রনাথের আসল রহস্য রয়েছে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে; শিলাইদহের পদ্মায় এবং শান্তিনিকেতনের মাঠে—কলকাতা শহরে এবং বাংলার গ্রামে। দেশকে এমন করে রক্তের মধ্যে না নিলে তিনি বড় হতে পারতেন না!

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথকে সর্বাঙ্গীণভাবে অনুসরণ করার কথা উঠছে না। আঙ্গিকেও নয়, ভাববস্তুতেও নয়। সময় বড়ই দ্রুত বয়ে চলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মানবপ্রেম ও সৌন্দর্যচেতনার এমন এক চিরন্তনতা আছে, যা মহাকবিরই উপযুক্ত। আমরা যদি সেই আদি স্রোতোধারার সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত রাখতে পারি তবেই বাংলা কবিতা যাবে তার স্বাভাবিক বিকাশের দিকে, অন্যথায় পথভ্রান্তি অনিবার্য।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর বৎসরে তাই তরুণ কবিদের কাছে নিবেদন, তাঁরা তাঁদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করুন। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধার পুতুল পুজোয় নির্বাসিত না করে নিজেদের কবিতার মধ্যে পুনর্বসতি দিন, তাহলে তাঁরা নিজেরাও হয়তো পাবেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পুনর্বসতি। আধুনিক কবিতা 'আধুনিক' নামের মধ্যে আর কতকাল এমন উদ্বাস্তু হয়ে থাকবে!

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

'অণু পরমাণু থেকে আরম্ভ করে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত সর্বত্রই নিরন্তর গতিবেগের মধ্যে ছন্দ রয়েছে। বস্তুত এই ছন্দই রূপ। উপাদানকে ছন্দের মধ্যে তরঙ্গিত করলেই সেই রূপ ধারণ করে। ছন্দের বৈচিত্র্যই রূপের বৈচিত্র্য। বাতাস যখন ছন্দে কাঁপে তখনি সে সুর হয়ে ওঠে। ভাবকে কথাকে ছন্দের মধ্যে জাগিয়ে তুললেই তা কবিতা হয়।... ছন্দোময় চলমানতার মধ্যেই সত্যের আনন্দ রূপ। আর্টে কাব্যে গানে প্রকাশের সেই আনন্দমূর্তি ছন্দের দ্বারা ব্যক্ত হয়।'—রবীন্দ্রনাথ।

কবিতার রূপ হচ্ছে তার ছন্দ। ভাবের প্রকাশ প্রেরণা অনুযায়ী তার রূপের জন্ম, তার ছন্দের স্ফূর্তি। বীজ যেমন নিজেকে প্রকাশ করতে গিয়ে গঠন করে বৃক্ষদেহকে, তেমনি বিমূর্ত ভাবও আত্ম-স্ফূর্তির তাগিদে গঠন করে কাব্যদেহকে। নিরাকার হয়ে ওঠে সাকার। ভালো কবিতামাত্রেই ভাব ও রূপ একই কবি-প্রযত্নের সৃষ্টি। এবং এই দুইয়ের সুন্দর সহযোগ যেখানে, সেখানে কাব্য-সৌন্দর্যেরও অভাব নেই। সুতরাং কবির রূপ-সাধনা হিসেবে ছন্দের তাৎপর্য স্বীকার করে নিতে হবে। দ্বিতীয় কথা, মানব-মনে ভাবের অজস্রতা আছে বলেই কাব্যের ক্ষেত্রে রূপ তথা ছন্দের বৈচিত্র্য। যেমন ভাব তেমন ছন্দ; যেমন ভাবের অনেকতা, তেমনি ছন্দেরও। সব চেয়ে বড়ো কথা, সৃষ্টির সর্বত্র যে নিরন্তর গতিবেগের প্রকাশ, কবির ভাব তা থেকে মুক্ত নয়। কাব্যের জগতে সেই গতি সত্যের স্ফূর্তি ছন্দের চলমানতার মধ্যে। আর সেই কারণেই সত্যের আনন্দরূপকে অভিব্যক্তি দেওয়ার কঠিন-দায়িত্ব বহন কবিতার ছন্দ।

কাব্যে ছন্দের গুরুত্ব সম্বন্ধে এই সাধারণ কথাগুলি রবীন্দ্র-ছন্দ-পাঠের ভূমিকায় স্মরণীয়। কবিগুরুর সজীব ও সুন্দর, গভীর ও গম্ভীর, ব্যাপক ও বিচিত্র অন্তরানুভূতির নানামুখিন প্রকাশে দেখতে পাই কাব্যরূপের কত নিত্য নতুন পরীক্ষা। তিনি আপন ভাবের প্রাণটিকে বহুরূপের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

অথচ মধুসূদন বা প্রমথ চৌধুরী যে অর্থে শিল্প-সচেতন কবি, রবীন্দ্রনাথ সেই অর্থে কোনদিনই শিল্প-সচেতন কবি ছিলেন না। ফর্মটা (form) আলাদা চর্চার বিষয়, একথা তিনি সজ্ঞানে স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। বরং তাঁর প্রাণের আগুন আপন প্রকাশের প্রেরণাতেই নানা রূপের আরতি করে গিয়েছে। আর তারই ফলে তাঁর কবিতায় বহুবিচিত্র ছন্দের চরণধ্বনি বেজে উঠেছে। তাঁর ভাব যখনই রূপের মধ্যে ছাড়া পেতে চেয়েছে তখনই তাঁর শিল্পী-মন খুঁজে পেয়েছে এমন একটা ছন্দ, কবির হৃদয়ের সুরের সঙ্গে যার মিল আছে। ছন্দের জন্য কবিকে আলাদা কোন যত্ন নিতে হয়নি।

যেমন ধরা যাক—

নগরের নটী | চলে অভিসারে | যৌবন মদে | মত্তা
অঙ্গে আঁচল | সুনীল বরণ
রুনু ঝুনু রবে | বাজে আভরণ,
সন্ন্যাসী গায়ে | পড়িতে চরণ | থামিল বাসব | দত্তা।

(অভিসার)

এখানে যৌবনমদে মত্তা নটীর অভিসারের বর্ণনায় ছয় মাত্রার পর্ববিশিষ্ট মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হাস্যলাস্যময়ী এই নব অভিসারিকার চলনে ধীর লয়ের ছন্দ নয়, দ্রুত লয়ের ছন্দও নয়, মধ্যম লয়ের ছন্দ থাকাই স্বাভাবিক। গজগতির মধ্যে এমন একটা দেহভারমন্থরতার আভাস আছে, যার সঙ্গে অভিসারিকাকে জড়াতে মন চায় না। সর্পগতির দ্রুততাও যেন অশোভন, কারণ তাতে কোনো রূপের ছবি ভেসে ওঠার অবকাশ পায় না। সব দিক থেকে বিবেচনা করলে হংসগতিই শোভন-সুসঙ্গস বলে মনে হয়—কারণ তাতে মন্দগতির ধীরতা যেমন নেই, তেমনি দ্রুতগতির ক্ষীপ্রতাও নেই; অথচ ছন্দ আছে, গতিও আছে; সবচেয়ে বড়ো কথা, রূপ ও সৌন্দর্যের একটা স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি আছে। উদ্ধৃত কবিতার এই হংসগতির ছন্দ ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গভীর রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এবং এই ছন্দ-ব্যবহারে কোথাও এতটুকু চেষ্টার চিহ্ন লেগে নেই, যেন বেশ সহজে স্বভাবের তাগিদে কবির অভিসারিকাশ্রিত মন ছন্দটিকে আপন করে নিয়েছে। তাই বলছিলাম, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-সাধনায় বৈচিত্র্য আছে; কিন্তু সেই বৈচিত্র্য চেষ্টাকৃত নয়, অনায়াসার্জিত।

দ্বিতীয়ত ছন্দের মধ্যে গতি-সত্যের আনন্দরূপ যে অভিব্যক্ত হয়, একথা

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-বিচারের কালে আরও বেশি করে মনে পড়ে। কারণ তাঁর কবিস্বভাবের প্রধান ধর্মই হচ্ছে গতিশীলতা। তাই-তাঁর কাব্যপ্রবাহে একটা নিয়ত-পরিবর্তনের অভীপ্সা বড়োই স্পষ্ট—এক ভাবের পর্যায় থেকে অন্য ভাবের পর্যায়ে, এক অনুভূতির স্তর থেকে অন্য অনুভূতির স্তরে উত্তরণের রোমান্টিক কামনায় তিনি সর্বদা মুখর। এই পরিবর্তন-কামনা কবির অফুরন্ত প্রাণময়তার সাক্ষ্য—প্রমিথিয়ুস স্বর্গ থেকে যে আগুন নিয়ে এসেছিলেন, সেই আগুনই বুঝি এই প্রাণময়তার একমাত্র তুলনা। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, রবীন্দ্রনাথের অস্থির প্রাণাগ্নি সৃষ্টিশীল প্রবর্তনায় শুধু বহুপ্রসবিনী হয়ে ওঠেনি, কবিস্বভাবে অনুস্যূত পরিবর্তনধর্ম ও গতিশীলতাকেও প্রমূর্ত করে তুলেছে।

উদাহরণ দেওয়া যাক। রসিক পাঠকমাত্রই জানেন, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' কবি হৃদয়-অরণ্যে বন্দী। একটা বিষাদ, অতৃপ্তি নৈরাশ্যের তার কাব্যগ্রন্থটির মধ্যে "জলের মতো ঘুরে ঘুরে কথা কয়েছে।" কবি বাইরের সংসারের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চেয়েছেন, কিন্তু আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পান নি। এই যে অবরুদ্ধ জীবনের বিষাদ-চেতনা তার ব্যঞ্জনা আছে কবিতাগুলির ছন্দের মধ্যেও। চরণগুলির বুকে কান পাতলে একটা বেদনাভর সূক্ষ্ম শ্রুতি শোনা যায়, ভাষা ও ছন্দের চলন ভারগ্রস্ত চিত্তের মতোই দ্বিধাবিজড়িত। আসল কথা, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' কবির অন্তর্ভাব যেমন বহির্জগতে প্রকাশের পথ খুঁজে পায় নি, তেমনি কবির অন্তরের সুরও কথার মধ্যে চরণ খুঁজে পায় নি।

হৃদয়ের প্রতি শিরা | টানি, টানি, উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে | তৃষ্ণিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই | করিস শোষণ ;
জননীর স্নেহে তোরে | করিব পোষণ।
(দুঃখ-আবাহন)

এখানে শুধু রবীন্দ্রাথের হৃদয়ের শিরা থেকে রক্ত ঝরে পড়ে নি, চরণগুলিও চলতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছে, ক্লান্ত পথিকের মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। অন্যদিকে 'প্রভাত-সঙ্গীতে' দেখতে পাই হৃদয়-অরণ্য থেকে কবির নিষ্ক্রমণ ঘটেছে অপরূপ বিশ্বসংসারের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল, তাহা এক নিমিষে

ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতোই উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।" হৃদয়-অরণ্যের পাষাণ-প্রাচীর বিদীর্ণ করে কবির ভাবের যে দুর্বার প্রকাশ, তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই কবিতাটির ছন্দঃস্পন্দের মধ্যে।

কেনরে বিধাতা | পাষাণ হেন
চারিদিকে তার | বাঁধন কেন ?
ভাঙরে হৃদয় | ভাঙরে বাঁধন,
সাধরে আজিকে | প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে | লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে | আঘাত কর ;
(নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' কবিতাটিতে যেখানে বেদনা-মন্থর হৃদয়বোধের সঙ্গে তাল রেখে দীর্ঘপর্বসমন্বিত অক্ষরবৃত্ত চরণ রচিত হয়েছিল, সেখানে 'প্রভাত-সঙ্গীতের' কবিতাটিতে কবির আনন্দ চেতনার সঙ্গে মিল রেখে হ্রস্বপর্বযুক্ত মাত্রাবৃত্ত চরণ রচিত। ফলে একটা গতি ও দ্রুতি স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়, যা 'দুঃখ-আবাহনে' পাওয়া যায় নি। এইভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' পর থেকে কবিমনের যে মুক্তি ঘটেছে, বিশ্বভুবনের গতি-সত্যের সংস্পর্শে কবির অন্তঃসত্তায় যে চলৎ-শক্তি এসেছে, তার ধ্বনিরূপ হিসেবেই দেখা দিয়েছে তাঁর কবিতার ছন্দ। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে যেমন, তেমনি তাঁর ছন্দকে কখনো খুঁড়িয়ে চলতে হয় নি। পরিবর্তনবাদী ও গতিশীল চিত্তধর্মের আনন্দময় অভিব্যক্তি হিসেবে নিম্নের চরণগুলি অতুলনীয়—

তীরে সঞ্চয় তোর পড়ে থাকে তীরে,
তাকাসনে ফিরে !
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে। (চঞ্চলা)

এখানে ছন্দ-ধ্বনিতে সন্ধ্যাসঙ্গীতের "এক-ই গান, এক-ই গান, এক-ই গানের" সুর নেই, আছে "অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলার" সুর। এতেই প্রমাণিত হয়, কবির "ছন্দোময় চলমানতার" কথা।

তৃতীয়ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লে মনে হয়, তাঁর ছন্দোরীতির ক্রমবিকাশ তাঁর বন্ধনপীড়িত মনের মুক্তি-প্রয়াসের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। স্বীকার করতে হবে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের মূল কথা হচ্ছে, সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি। মানুষমাত্রই কম-বেশি পরিমাণে পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাস, যে বাস্তব পরিবেশে সে বাস করে তার সঙ্গে মনের বিচিত্র-জটিল সম্পর্কের সূত্রে নানা বন্ধনের নাগপাশ গড়ে ওঠে। এবং সেই বন্ধন যেমন অন্তত: কিছুটা সে নিজেই সৃষ্টি করে, তেমনি সেই বন্ধনকে জয় করে সে এগিয়ে যেতে চায়। সুতরাং মানুষের জীবনে বন্ধন ও মুক্তি দুটোই সত্য। রবীন্দ্রনাথ যে বিকাশমুখী ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় বড়ো হয়েছেন, তার অনিবার্য প্রভাবে তাঁর মনের মধ্যেও নানা ধনতান্ত্রিক সংস্কার আসন পেতেছিল। তাছাড়া উনিশ শতকী রেনেসাঁসের কোলে জন্মগ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথের কালের মানুষ সামন্ততন্ত্রের অভিশাপ থেকে একেবারে মুক্ত ছিল না। তাদের শিক্ষায় ত্রুটি, কর্মে সীমাবন্ধন, চিন্তার সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের অসঙ্গতি ছিল বলেই ক্ষেত্রবিশেষে রেনেসাঁসী মুক্তির সাধনায় তাদের ভূমিকাও ছিল আংশিক, কুণ্ঠাপূর্ণ, এমনকি স্ব-বিরোধী। তাই অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, রবীন্দ্রনাথের কবিবুদ্ধির মুক্তি অনায়াসে সুসম্পন্ন হয় নি। মনকে মুক্ত করতে গিয়ে তাঁর নিজের মধ্যেই নিজেকে অসামান্য লড়াই করতে হয়েছে, যুঝতে হয়েছে পারিপার্শ্বিক নানা বন্ধনের সঙ্গে। এক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে তিনি আরেক বন্ধনের মধ্যে গিয়ে পড়েছেন, আবার সেই নতুন বন্ধন থেকে মুক্তি নিয়ে তৃতীয় কোনো বন্ধনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু তাতে সুফল ফলেছে এই যে, তাঁর মনের পরিধি গেছে বেড়ে (স্মরণীয়: আদি ব্রাহ্ম-সমাজের আবহাওয়ায়, হিন্দুমেলার প্রাণময় উচ্চারণ করে, স্বদেশী আন্দোলন ও শিবাজীর উৎসবের নানা পথ বেয়ে তাঁর চিন্তা ও চিত্তের বিবর্তন ঘটেছে, মুক্তি ঘটেছে বিশ্বমানবিকতার উদার ক্ষেত্রে)। আর রবীন্দ্রনাথের এই মানস-বিবর্তনের পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁর ছন্দোরীতিও মুক্তির পথ খুঁজেছে। প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থগুলিতে কবি অর্জন করতে পারেন নি তাঁর নিজের ভাষা ও ছন্দ। আর 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'

তিনি নিজের পথের সন্ধান পেলেও ভাব ও ভাষার মতো ছন্দ "মূর্তি ধরিয়া পরিস্ফুট হইতে পারে নাই"। এই অপরিস্ফুট ছন্দকে তিনি ক্রমশ পরিস্ফুট করলেন, চরণের পঙ্গুত্ব ঘুচিয়ে তাতে আনলেন স্বচ্ছন্দগতি, মুক্তচাল। তার জন্য কত আয়োজনই না তাঁকে করতে হল! প্রাচীন বাঙলা কাব্যের অক্ষরবৃত্তে "অক্ষরের মাপ সমান রেখে ধ্বনির মাপে ইতর বিশেষ করার" চেষ্টার ফলে যে ত্রুটি দেখা দিত তা তিনি দূর করে দিলেন, প্রতিষ্ঠা করলেন দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষর নয়—শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনির সম্মান। দীর্ঘ অক্ষর কোথায় কয় মাত্রা হবে, তা কবির রচনাতেই প্রথম সুস্পষ্ট হল। শুধু কি তাই? মাত্রাবৃত্তে যুক্তব্যঞ্জনের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ করে মাত্রাবৃদ্ধির তত্ত্ব আসলে কবির ছন্দোগত মুক্তিতত্ত্ব, কারণ ধ্বনির মাপের শেষ সীমা পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি বস্তুত: ছন্দের প্রসারণ-শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন—

১। যৌবনমুকুল প্রাণে বিকশিত,
সৌরভ তাহার বাহিরে আসিয়া
রটিতেছে বনে বনে।

২। আমি—ভাঙ্গিব করুণা-ধারা
আমি—ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা

(নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

প্রথম উদ্ধৃতিতে 'যৌবন' ও 'সৌরভ' তিনমাত্রার। যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর 'যৌ' ও 'সৌ' যে দুই মাত্রার হতে পারে, এ-সম্ভাবনার কথা এখনও রবীন্দ্রনাথের মনে আসে নি। দ্বিতীয় উদাহরণে 'ভাঙ্গিব' তিনমাত্রা হিসেব করা হয়েছে, যুক্তবর্ণ 'ঙ্গ'-এর বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ করে ধ্বনির পরিমাণ ও মাত্রার সংখ্যা বৃদ্ধি করার কৌশল এখনও কবির অনায়ত্ত। তবে পরবর্তী কালের একটি কবিতায় দেখুন—

ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে
জলসিঞ্চিত | ক্ষিতি সৌরভ | রভসে
ঘনগৌরবে | নবযৌবনা | বরষা
শ্যাম গম্ভীর | সরসা

(বর্ষামঙ্গল)

এখানে সমস্ত যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক। এবং যুক্ত ব্যঞ্জন 'ঞ্চ' ও 'ম্ভ'-এর উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট। এইভাবে ধ্বনির মাপকে শেষ সীমা পর্যন্ত

বিস্তৃত করার ব্যবস্থায় বাঙলা ছন্দের মুক্তি ঘটেছে আড়ষ্টতা ও অপরিস্ফুটতা থেকে।

অন্যদিকে বাঙলা ছড়ার ছন্দও রবীন্দ্রনাথের হাতে পেয়েছে আভিজাত্য। "এই খাঁটি বাংলা ছন্দটিকে বহুকালের অবজ্ঞা ও তুচ্ছতা থেকে উদ্ধার করে তাকে নিঃসংকোচে সর্বপ্রকার রসসাহিত্যের বাহন হবার উপযুক্ত মর্যাদা ও আভিজাত্য দান করেছেন এবং এটিকে যথোচিতরূপে মার্জিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে তথা বহুশাখা-প্রশাখায় পরিবর্ধিত ও অলঙ্কৃত করে বাংলার ছন্দ-ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তুলেছেন।" 'পলাতকায়' তার প্রমাণ আছে। আসল কথা, ছড়ার ছন্দকে লঘু থেকে গুরু পর্যন্ত সকল ভাবের বাহন করে রবীন্দ্রনাথ তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনির বিস্তার ও সুষম বিন্যাসের দিক দিয়ে যতটা সম্ভব জড়তামুক্ত ও স্বচ্ছন্দ-বিহারী করে গিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, চরণের দৈর্ঘসাম্যের বন্ধন থেকেও তিনি বাঙলা ছন্দকে উদ্ধার করেন। 'পলাতকার' স্বরবৃত্ত চরণে, 'বলাকার' অক্ষরবৃত্ত চরণে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাত্রা-বৃত্তের চরণে মোট মাত্রাসংখ্যার সমান না হলেও ছন্দঃপতন ঘটে নি। অর্থাৎ পর্বের মাপ ঠিক রেখে বিচিত্র চরণসমন্বিত স্তবক রচনার আদর্শ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। 'বলাকায়' চরণের ভেতরে ছেদের অবস্থান-স্থানে অভিনব অন্তানুপ্রাস, একই চরণের বিভিন্ন পংক্তিতে সুন্দর বিন্যাস এবং ছোট-বড়ো পর্বের বহুবিচিত্র সংস্থান ছন্দোগুরুর মৌলিক প্রতিভার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাছাড়া 'বলাকার' ছন্দে প্রচলিত ছন্দ-রূপের যে অনেক বিপর্যয় ঘটেছে ও মুক্তির লক্ষণও অনেক দিক দিয়ে ফুটে উঠেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাই যেমন কাব্যের ভাবের ক্ষেত্রে, তেমনি তার ছন্দের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মুক্তিমন্ত্রের সাধক। তবে, আগেই বলেছি, এক বন্ধন থেকে মুক্তি নিয়ে কবি আরেক বন্ধনের মধ্যে গিয়ে পড়েছেন এবং এইভাবে অধিকতর মুক্তির আশায় বন্ধন থেকে বন্ধনান্তরের ভেতর দিয়ে চলেছে কবির মানস-যাত্রা। একথা যেমন ভাবের দিক থেকে সত্য, তেমনি সত্য ছন্দের দিক থেকে মুক্তি তিনি চেয়েছেন বটে, কিন্তু মুক্তির নামে শেষ পর্যন্ত কোনো নৈরাজ্যে গিয়ে পৌছনো তাঁর কাম্য ছিল না। তাই তাঁর শেষ লেখাতেও দেখতে পাই প্রজ্ঞার নতুন সীমান্ত আর ছন্দের গভীর অন্তর্লীন ধ্বনি—

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ-জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়…ইত্যাদি

আর সে-কারণেই তাঁর তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দেও গূঢ় নিয়মের আভাস আছে। চরণের সঙ্গে চরণের বিচ্ছিন্নতা এবং অন্ত্যানুপ্রাসের অভাব সত্ত্বেও নিচের কবিতায় অক্ষরবৃত্তের ব্যঞ্জনা ধরতে কষ্ট হয় না—

৮+৮ তোমার সৃষ্টির পথ | রেখেছ আকীর্ণ করি
৮+৬ বিচিত্র ছলনা জালে, |
হে ছলনাময়ী
৮+৮+৬ মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ | পেতেছ নিপুণ হাতে |
সরল জীবনে
ইত্যাদি

আসল কথা, রবীন্দ্র-ছন্দ-পাঠ শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়ে দেয় যে, ছন্দোহীন নৈরাজ্য কবির লক্ষ্য ছিল না, তাঁর লক্ষ্য ছিল ছন্দোময় চলমানতার মধ্যে দিয়ে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করে চলা। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে যিনি দেখেছিলেন একটা সুষম ছন্দ ('আত্মপরিচয়' দ্রষ্টব্য), তাঁর কাছে ছন্দ আমরণ সুন্দরের পদধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথের 'তিন সঙ্গী'

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের শেষ তিনটি গল্প নিয়ে 'তিন সঙ্গী' বইখানি সংকলিত। এবং সর্বশেষ গল্প 'ল্যাবরেটরি' বইখানার সব চাইতে বড়ো আকর্ষণ। ১৩৪৭ সালের 'শারদীয়া আনন্দবাজার'-এ গল্পটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন কিছুটা চঞ্চলতার সৃষ্টিও হয়েছিল। সোহিনী চরিত্রের কল্পনার আপাত-দুঃসাহসিকতাই তার কারণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখে বাংলা ছোটগল্পে তখন ভাঁটার টান। মন্বন্তরের আগুন থেকে ক্রোধাহত নতুন লেখকদের তখনো আবির্ভাব হয় নি। কল্লোলীয়েরা শ্রান্ত এবং স্তিমিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ চিন্তা এবং অস্বচ্ছ আঙ্গিকে আচ্ছন্ন। প্রেমেন্দ্র মিত্র নীরব, শৈলজানন্দ চলচ্চিত্রচারী, অচিন্ত্যকুমার সরকারী চাকরি-সূত্রে তখনো উপকরণ সংগ্রহরত, দুর্গত প্রাচীন জগদীশ গুপ্ত নিষ্প্রভ, সুবোধ ঘোষ নেপথ্যে। এই সময়েই 'তিন সঙ্গী'র গল্পত্রয়ীর আবির্ভাব।

স্বভাবতই বাঙালী পাঠক উচ্চকিত হয়ে উঠেছিলেন। রচনার দিক থেকে গল্প ক'টি তীক্ষ্ণ ঝলকিত, আশ্চর্য রকমের আধুনিক। স্ট্রীম-লাইন ভাষা, বাঁকে বাঁকে সূর্যকরোজ্জ্বল উইটের ফেনপুঞ্জ, বহিরঙ্গের কলধ্বনি পরিণামে গভীর-মন্দ্রিত। ছাত্র-জীবনের শেষ পর্যায়ে এই গল্পগুলি পড়ে আমরা সেদিন ভেবেছিলাম আশী বছরের সীমান্তে এসে এমন আধুনিক গল্প একমাত্র রবীন্দ্রনাথই লিখতে পারেন—যিনি চিরকাল আধুনিকতার অধিনায়কত্ব করেছেন।

এতদিন পরে গল্প তিনটি পড়তে গিয়ে সে বিস্ময় আর জাগে না। জাগা স্বাভাবিকও নয়। দীর্ঘ কালের ব্যবধানে এখন রবীন্দ্রনাথের মন ও মননের একটা মোটামুটি বৃত্তরেখা আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। সমকালীন ব্যক্তিত্বের সেই বিপুল প্রভাব আর নেই, এখন মুগ্ধতার আবরণ সরে গিয়ে

মহান্ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ আরো উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত। আজকে তাঁর শিল্প-মানসের পরিণাম সূত্রে 'তিন সঙ্গী'র গল্প তিনটিকে চেনা যায়।

'শেষের কবিতা' লেখবার সময় তার নায়ক অমিত রায়কে উগ্রতম আধুনিকতার প্রতিনিধিরূপে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছিলেন। নিবারণ চক্রবর্তীর দুর্নিবার ভূমিকায় নেমে সে রবি ঠাকুরের দলবলকে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাষার সমস্ত তীক্ষ্ণতা, আধুনিকতার সমস্ত বাতাবরণ ভেঙে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এল লাবণ্য—'সুরদাসের প্রার্থনা' থেকে আরম্ভ করে যার শান্ত-শুচিস্মিত লাবণ্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চেতনা বারেবারে অবগাহন করেছে। শেষের কবিতার শেষ কবিতায় রবীন্দ্রনাথেরই জয় হল, আধুনিক অমিত রায়ের নয়। সুনীতি চাটুজ্যের তত্ত্ব-কণ্টকিত ভাষাতত্ত্বের বই শিলং পাহাড়ের পাইন বনের কোমল ছায়ায়, রূপালী ঝরনার স্রোতে কোথায় ভেসে গেল—তার আর কোনো সন্ধান মিলল না। "হে বন্ধু বিদায়"-এর সুকুমার ভীরু মিনতির সঙ্গে মিশে গেল বাসনা-বিমুক্ত সুরদাসের কণ্ঠস্বর :

"বাসনা-মলিন আঁখি-কলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল চিরদিন রবে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে রহিব জাগিয়া অনন্ত বিভাবরী।"

'তিন সঙ্গী'র উপকরণ এবং আঙ্গিকগত আধুনিকতার অন্তরালেও রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক মানস-প্রবাহ অন্তঃশীলা কিনা, তারই একটু অনুসন্ধান করা যাক। আশা করি, তা থেকে গল্প তিনটির স্বরূপ এবং তাদের বিশিষ্টতাও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এই তিনটি গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সমালোচক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী লক্ষ্য করেছেন যে বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানচিত্ত নায়ক এবং একটি বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডল রচনা করবার সচেতন প্রয়াস এদের মধ্যে রয়েছে আর এদিক থেকে তিনটি গল্পেরই একটা সাধারণ ধর্ম অনুভব করা যায়। এই সঙ্গে একটি জিজ্ঞাসাও জাগে। এ কি শুদ্ধমাত্র উত্তরজীবনে বিজ্ঞানচর্চার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আসক্তিরই প্রতিফলন? অথবা, এর মধ্যে তাঁর একটি ব্যাপকতর বক্তব্যের তির্যক আভাস নিহিত?

শ্রেষ্ঠ জীবনবাদী শিল্পীর মতো রবীন্দ্রনাথ চিরদিন যুগ-সচেতন, আশ্চর্য তাঁর গ্রহণশীলতা, অকুণ্ঠ তাঁর চিত্তৌদার্য। অগ্রণী কালের সঙ্গে তাঁর অদ্বৈধ

পদচারণা। বিশ্বমানবের সামগ্রিক শুভ-পরিণামের প্রতি তাঁর অবিচল প্রত্যয়। ইওরোপের দুরন্ত যান্ত্রিক অভিযানের প্রতি সশ্রদ্ধ বিস্ময় সত্ত্বেও এইখানেই একটি সংশয় তাঁর অটল আশাবাদ এবং যুগ-চেতনাকে বারবার পীড়ন করেছে। আশৈশব ভারতীয় ভাবসাধনার একটি স্থির আদর্শ তাঁর চিত্তক্ষেত্রে ধ্যানস্থ শিবের মতো স্থির-প্রতিষ্ঠিত—শোষণবাদী যান্ত্রিকতার বিকৃতি এবং রূঢ়তা সেই শিল্পবোধের ওপর আঘাত হেনেছে, তাঁর যন্ত্রণা প্রকাশিত হয়েছে 'রক্তকরবী'তে, দেখা দিয়েছে 'মুক্তধারা'য়।

শেলী যান্ত্রিক শোষণবাদের বিপক্ষে রক্তাক্ত মুখে প্রতিবাদ তুলেছেন, অথচ মানুষের বিজ্ঞানদীপ্ত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর আশার অন্ত ছিল না। রবীন্দ্রনাথেরও আন্তরিক বিরূপতা যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে, যন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়। তাছাড়া শেলীর চাইতে আরো বড়ো একটি সমস্যা ছিল রবীন্দ্রনাথের। তা ভারতীয় ভাবসত্যের সঙ্গে ইওরোপীয় বিজ্ঞান-চেষ্টার মিলন ঘটানো, এই দুইয়ের মধ্যে একটা সুষম সামঞ্জস্য গড়ে তোলা। আমার মনে হয়, 'তিন সঙ্গী'র তিনটি গল্পের ওপর এই মানস-সংকটেরও ছায়া পড়েছে।

একটু বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

প্রথম গল্পটির নাম 'রবিবার'। গল্পের সঙ্গে এই নামকরণের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই—মাত্র অভীক যেদিন বিভার হারছড়া নিয়ে ইওরোপে চলে যায়, সেই দিনটি রবিবার। কিন্তু সেটি বুধবার হলেও কোনো ক্ষতি ছিল না—মূল গল্পের সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পাওয়া যাবে না।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের নামকরণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছিলেন, নামের একটা নির্দিষ্ট অর্থবন্ধনে গ্রন্থকে আগে থেকেই বন্দী করতে তাঁর মন সায় দেয় না। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য এই, যে উপন্যাস, নাটক কিংবা কাব্যের যে স্বাভাবিক ব্যঞ্জনাটুকু থাকে, নামের শাসনচিহ্ন তাকে সীমায়িত করে—শিল্পীর কল্পনায় বাধা সৃষ্টি করে। 'রবিবার' নামটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা এই বাধ্যতামূলক দাসত্ব থেকে মুক্তি নিয়েছে। সমস্ত কর্মচেষ্টা, সমস্ত চাঞ্চল্য ব্যতিরিক্ত ছুটির দিনের একটি শান্ত মাধুর্য দিয়ে গল্পটি গড়া। এই নামকরণে গল্পটি ব্যাখ্যাত হয় নি, ব্যঞ্জিত হয়েছে।

একটি মাত্র চরিত্রের ওপর গল্পটি দাঁড়িয়ে—সে নায়িকা বিভার "নাস্তিক ভক্ত অভীক"—যার পিতৃদত্ত নাম "অভয়াচরণ"। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের ছেলে হয়ে সে দুর্দান্ত কালাপাহাড়। "চেহারাটা আশ্চর্য রকমের

ঝিলিক ছাঁদের", "মুষ্টিযোগ অমোঘ", আর্ট স্কুলের বাঁধা পথ ছেড়ে অতি আধুনিক শিল্পরীতিতে বেপরোয়া, সমস্ত সংস্কার-ভাঙা দুরন্ত পৌরুষের আকর্ষণে নিজের চারিদিকে জড়ো করে নিয়েছে শিষ্যামণ্ডলী: "চশমাপরা রূপসীরা তার স্টুডিয়োতে আধুনিক বে-আব্রু রীতিতে যে-সব নগ্ন মনস্তত্ত্বের আলাপ-আলোচনা করতে লাগল, ঘন সিগারেটের ধোঁয়া জমল তার কালিমা আবৃত করে।"

এই একান্ত দুঃসাহসী অভীক, শীলার মতো অনেক মেয়ের হৃৎপিণ্ডে "লাল রঙের আগুন" জ্বালানো যার বিলাস, মনীষার মৃত্যু-বেদনার স্মৃতি জড়ানো ঘড়িটি বেচতে যার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই ("এখন সে তো সুখদুঃখের অতীত") সে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভার অচঞ্চল স্নিগ্ধতার সামনে। বিভাকে পাওয়ায় যত বাধা—তার উন্মাদনা তত বেশি। শেষ পর্যন্ত অঙ্কের অধ্যাপক 'অমরবাবু' সম্পর্কে পুরুষসুলভ অর্ধচেতন ঈর্ষা এবং বিভার কাছে নিজের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করবার দুঃসাধ্য সাধনার তাড়নায় অভীক দেশত্যাগী। মনীষার ঘড়ি সম্পর্কে নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য তার নিজের কাছেই যে কতখানি মিথ্যা সেইটেই প্রমাণ হয়ে গেল, যখন দেখা গেল অভীক আর বিভার প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিরঞ্জিত "চুনির সঙ্গে মুক্তোর মিল করা" হারছড়া বিক্রি করবার বেদনা সে কোনোমতেই সইতে পারল না।

"বী, আমার মধুকরী"—মনের সমস্ত মাধুরী দিয়ে রচিত এই সম্ভাষণের মধ্য দিয়েই রোম্যান্টিক অভীক তার আধুনিকতার সমস্ত আবরণ ফেলে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, যেমন করে অমিত রায় লাবণ্যের কাছে এসে ধরা দিয়েছিল। আসলে যৌবনসুলভ কিছু অত্যুচ্চারিত উগ্রতা ছাড়া অমিতের সঙ্গে অভীকের কোনো পার্থক্য নেই। তার শেষ চিঠির প্রতিশ্রুতি থেকে দেখা যাচ্ছে, উগ্র আধুনিকতার জয়ধ্বজা তুলে সে বিভার কাছে ফিরে আসবে না, আসবে সার্থক শিল্পী হয়ে। শিল্পের সঙ্গে সুন্দরের মিলন রোম্যান্টিক চিন্তায় যেমন অপরিহার্য, তেমনিভাবেই বিভার কাছে এসে অভীক সেদিন সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।

এই গল্পে অভীকের ওপর আধুনিকতার চড়া রঙ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আধুনিকতাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই—সে সত্য এর কোথাও গোপন নেই। সংযত শান্ত সৌন্দর্য এবং অচঞ্চল গভীর প্রেমের মহিমাই এই গল্পের শেষ কথা। রূপ এবং প্রেম সম্পর্কে এই একতম বক্তব্যই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে

সর্বত্র লভ্য। আর আধুনিকতার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয় 'শোধবোধে'র নেলীর চরিত্রে, কেটি মিত্রের "এনামেল করা গালের ওপর" চোখের জল গড়িয়ে পড়ায়, চূড়ান্তভাবে 'প্রহাসিনী'র 'আধুনিকা' কবিতায়:

> "অতএব, মন, তোর কলসী ও দড়ি আন্,
> অতলে মারিস ডুব মিড্-ভিক্টোরিয়ান।
> কোনো ফল ফলিবে না আঁখি জল-সিচনে;
> শুকনো হাসিটা তবে রেখে যাই পিছনে।
> গদ্গদ স্বর কেন বিদায়ের পাঠটায়,
> শেষ বেলা কেটে যাক ঠাট্টায় ঠাট্টায়।"

অতএব অভীকের চরিত্র-রচনার বহিরঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "শেষ বেলার ঠাট্টা"র আবরণ, অন্তরলোকে সুরদাসের প্রার্থনার অশ্রু-আকুতি। আর তার নাস্তিকতা? বারোয়ারীর চাঁদা আদায় কাহিনী এবং সেই টাকার সদ্ব্যবহারের মধ্যেই তার নাস্তিক্যের গূঢ় অর্থটি ধরা পড়েছে। ধর্মচর্চার আচারগত তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে যে সর্বাতিশয়ী হিউম্যানিজ্মের মন্ত্রে 'চতুরঙ্গের' জ্যাঠামশাই উদ্বুদ্ধ, সে সত্য তো রবীন্দ্রনাথেরও নিজস্ব।

তাই রবিবার একান্তই রাবীন্দ্রিক। নতুনত্বটুকু ভাষার তীক্ষ্ণতা আর যুগগত পরিবেশ রচনার মধ্যে।

দ্বিতীয় গল্পটির নাম 'শেষ কথা'—'ছোটগল্প' নাম দিয়ে এর আর একটি সামান্য রূপান্তরিত পাঠও প্রকাশিত হয়েছিল।

এই গল্পের নায়ক নবীনমাধব সেনগুপ্ত প্রাক্তন বিপ্লবী। বিপ্লববাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত বিরূপতা নবীনমাধবের চিন্তাতেই প্রকাশ: "সে যেন আতশবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো, তাতে নিজের পোড়া কপাল পুড়িয়েছি অনেকবার, দাগ পড়েনি ব্রিটিশ রাজরক্তে।" অতএব আমেরিকা-প্রবাসী মোহমুক্ত বিপ্লবী দেশকে গড়বার নতুন পথ খুঁজে পেল, বুঝল বড় হতে গেলে "এ যুগে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে হবে পাল্লা।"

নবীনমাধব ফিরল ভূতত্ত্ববিদ্ হয়ে। সে-ও অভীকের মতোই শক্ত, কঠিন —কাজের মানুষ, বাঙালীসুলভ ললিত-লাবণ্য তার দেহে মনে কোথাও নেই।

দেশের কল্যাণসাধনায় নিজের সমস্ত বাসনা-বেদনাকে বিসর্জন দিয়েছে, বিদেশিনী ক্যাথারিনের প্রেমকেও সে উপেক্ষা করতে পেরেছে।

কিন্তু ছোটনাগপুরের শ্যামল বনভূমিতে একদিন বিজ্ঞান-তপস্বীর ধ্যানভঙ্গ হল। অচিরা দেখা দিল "কুহেলিত শালগাছের ছায়ালোকের বন্ধনে।" আর মনে হল, বাঙালী মেয়ের "শ্যামল দেহের কোমলতায় বনের লতাপাতা আপন ভাষা যোগ করে দিলে।…জানিনে কেন মনে হোলো সেই গানের সহজ রাগিনীতে ওই বাঙালী মেয়েটির রূপের ভূমিকা—মনে রইল ওই মনের বেদনা।"

তারপর অচিরার সঙ্গে পরিচয়—তার দাদু ডক্টর অনিলকুমার সরকারের সান্নিধ্যে আসা। অচিরার নিভৃত বেদনার কেন্দ্রটি যে কোথায় তা-ও জানতে বাকী রইল না। দাদু এবং নাতনীর বানপ্রস্থের নেপথ্যে আই. সি. এস ভবতোষ মজুমদারের হীন ভূমিকাটিও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সবই অনুকূল ছিল। নবীনমাধবের পৌরুষপ্রখর জ্ঞানসাধক সত্তা অচিরাকে আকর্ষণ করেছিল, আরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে শ্যামলরূপের ছন্দমেলানো অচিরা নবীনমাধবের শ্রান্ত নিঃসঙ্গতায় ছায়াশ্রয়ের প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল। তবু নবীনমাধব অচিরাকে পেল না। বাধা এল অচিরার দিক থেকেই।

ভবতোষ তাকে ঠকিয়েছে। তবু তার প্রতি "ভালোবাসার সতীত্ব" থেকে অচিরা বিচ্যুত হতে রাজী নয়। ভবতোষকে সে শ্রদ্ধা করতে পারে না, তার কাজেও সে যেতে চায় না। কিন্তু "সে আর আমার সেই জীবনের প্রথম ভালোবাসা, এক নয়। এখন আমার কাছে সেই ভালোবাসা ইম্পার্সোনাল। কোনো আধারের দরকার নেই।"

প্লেটোর সিম্পোসিয়ামের চরম উদাহরণ এখানেই। এর অবস্থান রোম্যান্টিকতার কুয়াশায় ঢাকা তুঙ্গতম শিখরে। কিন্তু আরো দুটি কথা আছে।

প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি বিরোধী মনোভাব এই গল্পে দেখা দিয়েছে। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতা অনুযায়ী প্রকৃতি এখানে অপাপবিদ্ধ ঐশ্বরিক শুচি-সৌন্দর্যের পরিবাহ নয়। অচিরা এই বনভূমির মধ্যে আদিম অন্ধ শক্তির একটা দুঃসহ আকর্ষণকে উপলব্ধি করেছে, যা মানুষের চিত্তশক্তি-সঞ্জাত আদর্শকে ভেঙে দেয়—যা অচিরার "ভালোবাসার সতীত্ব"কে বিচলিত করে তুলেছিল। তাই আদর্শের সত্যকে রক্ষা করতে গিয়ে নবীনমাধবের

প্রতি তার মনের যে জৈব আদিম আকর্ষণ তাকে কঠিনভাবে প্রতিরোধ করেছে অচিরা।

কিন্তু প্রকৃতি এখানে প্রতীক মাত্র—আসল কথাটা হল প্রাকৃতিক। জৈবতা-সমুদ্ভব যে প্রেম, যার ওপর আরক্তিম লালসার বর্ণরাগ—সে প্রেম যে শেষ পর্যন্ত কল্যাণ আনে না, এ প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সিদ্ধান্তের অঙ্গাঙ্গী। অচিরার ভালোবাসার ইম্পার্সোন্যাল রূপ অদেহী ভবতোষকে কেন্দ্র করে স্তব্ধ হয়ে আছে, আর দেহজ কামনা ছুটে চলেছে নবীনমাধবের দিকে। এই কামনাকে কি কখনো স্বীকার করতে পারেন রবীন্দ্রনাথ—কখনো তাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন? লাবণ্য তার মনকে অমিত আর শোভনলালের জন্যে দ্বিধাবিভক্ত করে নিতে পেরেছে কিন্তু নবীনমাধব তো স্তিমিত শোভনলাল নয়। তার পৌরুষ প্রখর—তার চাওয়ার মধ্যে কোনো ফাঁকিকে সে স্বীকার করতে পারবে না। সেইজন্যই নবীনমাধবকে বঞ্চনা করতে পারে না অচিরা, তার পক্ষে আরো কঠিন জৈব বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করা।

শেষ কথায় আর একটি শেষ কথা আছে। এ যেন 'কচ ও দেবযানী'-কে বিপরীতভাবে উপস্থিত করা—এখানে দেবযানী স্বেচ্ছায় তাপস কচকে মুক্তি দিয়েছে। কুমার-সম্ভবের পূর্বপর্যায়ে শঙ্করের অগ্নিনেত্রের সম্মুখে মদন ভস্ম হয়েছিল, অসীম স্পর্ধায় যোগীর ধ্যান ভঙ্গ করতে চেয়েছিল সে। অচিরাও তার রূপমোহ দিয়ে তপস্যাশ্রিত নবনীমাধবের বিঘ্ন ঘটাতে চায় না—তাই অজ্ঞাতে যে শৃঙ্খল সে গড়ে তুলছিল, সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সে ছিন্ন করে দিয়ে গেছে।

প্রেম দিয়ে যে গল্পের আরম্ভ, আইডিয়া উপস্থিত করে তার সমাপ্তি। ঠিক সমাপ্তি বলব না, কারণ বাস্তবতা ও মনস্তত্ত্বের বিচারে অচিরার ইম্পার্সোনাল ভাবের আধারটি এবং "ভালোবাসার সতীত্ব" কতখানি টেঁকে বলা শক্ত। এ আইডিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সুপরিচিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি সমাধানমাত্র। গল্প গিয়ে এখানে বক্তৃতায় শেষ হয়েছে। 'তিন সঙ্গী'র দলে 'শেষ কথা'ই দুর্বলতম এবং সবচাইতে অনাধুনিক।

'তিন সঙ্গী'র শেষতম, দীর্ঘতম এবং সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর গল্প হল 'ল্যাবরেটরি'। প্রসঙ্গত, এটি তাঁর শেষ গল্পরূপেও প্রচারিত।

এই গল্প লিখে রবীন্দ্রনাথ দেশের কাছ থেকে কী প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা

করেছিলেন, তা অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের কাছে তাঁর উক্তিতেই প্রকাশ:

"আর সকলে কি বলছে? একেবারে ছি ছি কাণ্ড তো? নিন্দায় আর মুখ দেখানো যাবে না। আশি বছর বয়সে রবি ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়েছে—সোহিনীর মতে। এমন একটা মেয়ের সম্বন্ধে এমন করে লিখেছে।"

রবীন্দ্রনাথ আরো অনুমান করেছিলেন, তাঁর এই গল্পটি সকলে বুঝবে না, এর অন্তরালনিহিত তাৎপর্যটি অনুধাবন করা অসতর্ক পাঠকের পক্ষে সম্ভবও হবে না। সোহিনীর চরিত্র-রহস্যের গভীরতাও তাদের কাছে অপরিচিত থেকে যাবে। এই আশঙ্কা আংশিকভাবে হয়তো সত্য, কিন্তু বাংলা দেশের পাঠক 'ল্যাবরেটরি' গল্পটির ক্ষেত্রে অতখানি বেরসিক মনের পরিচয় দেয় নি, এ কথাটি নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিক এবং সর্ববিধ সংস্কারমুক্ত নন্দকিশোরের ব্যক্তিত্বের ছায়া সমস্ত গল্পটির ওপর দিয়ে পূর্বাপর বিকীর্ণ হয়ে আছে, যদিও গল্পের সূচনাতেই তাঁর কায়িক মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর জীবনসঙ্গিনী (স্ত্রী বলা সম্ভব কি না জানি না) সোহিনী এই গল্পের অধিনায়িকা। নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরির যোগ্য অধিকারীর জন্য সোহিনীর সন্ধান এবং পরিণামে তার সকরুণ ব্যর্থতাই গল্পের বক্তব্য।

'তিন সঙ্গী'র প্রথম গল্প দুটি প্রেমকেন্দ্রিক—'ল্যাবরেটরি' আইডিয়া এবং প্রতীক প্রধান। 'রবিবার' বা 'শেষ কথা'র নামকরণ বিশেষভাবে কোনো অর্থবহ নয়, কিন্তু ল্যাবরেটরির ক্ষেত্রে ঠিক উলটো—নামের মধ্যে গল্পটির বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে।

কিসের ল্যাবরেটরি? মনে হয় ফিজিক্সের। কিন্তু কী আসে যায় তাতে? আসলে এই ল্যাবরেটরিতে সোহিনী পৌরুষের পরীক্ষা দিতে বসেছে। কে আছে এমন দৃঢ়চেতা পুরুষ যে বজ্রদৃঢ় মন নিয়ে এই ল্যাবরেটরিতে কাজের সাধনায় বসতে পারে—এমন নির্মোহ জিতেন্দ্রিয় কে আছে যে উগ্র মদের মতো নীলার বিষাক্ত যৌবনের প্রলোভন এড়িয়ে তপস্যায় মগ্ন হয়ে যেতে পারে? সোহিনীর পরীক্ষার ফল 'নেগেটিভ'—ডক্টর রেবতী ভট্টাচার্যের পরাভব সোহিনীর করুণতম বেদনায় রঞ্জিত।

সোহিনী পাঞ্জাবের মেয়ে—কোনো সুরুচিময় ভদ্র পরিবেশ থেকে তার

আবির্ভাব হয় নি। নন্দকিশোরের সঙ্গে তার মিলন শয়তানের সঙ্গে শয়তানীর আত্মিক ঐক্য। নৈতিক চরিত্রের বিচারে সে নিরঙ্কুশ—নন্দকিশোরের মেয়ে বলে পরিচিতা নীলা আসলে যে কার সন্তান, তা সোহিনী নিজেও জানে না। তবুও আমৃত্যু সোহিনী নন্দকিশোরের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় নি, তার কারণ সোহিনীর শক্তি—তার "ক্যারেকটরের তেজ।" সেই জন্যেই মৃত্যুকালে নন্দকিশোর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আর ল্যাবরেটরির ভার তারই ওপরে সঁপে দিয়ে গেছেন, তিনি জানেন, সোহিনীই এর সত্যিকারের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে।

সুতরাং শুরু হয়েছে সোহিনীর উপযুক্ত উত্তরসাধকের সন্ধান—তার সঙ্গী আছেন অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরী—যিনি পরিণত বয়েস, প্রখর বুদ্ধি এবং নির্মোহ প্রজ্ঞার অধিকারী। সোহিনীর তাঁর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা। এই অধ্যাপক চৌধুরীই রেবতী ভট্টাচার্যের সন্ধান দিয়েছেন। অসীম সম্ভাবনা আছে রেবতীর মধ্যে, অসামান্য মেধাবী পুরুষ সে। কিন্তু তার ভাগ্যাকাশ জুড়ে আছেন একটি "স্ত্রী রাহু"—তিনি তার পিসীমা। এই পিসীমাগ্রস্ত রেবতীকে উদ্ধার করে বসাতে হবে সার্থকতার কর্মযজ্ঞে।

এক নারীর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ থেকে উদ্ধার করার জন্য আর এক নারীকে ব্যবহার করল সোহিনী—সে নীলা, তারই গর্ভজাত কন্যা। উগ্র রূপ, অর্থের লোভ আর সোহিনীর কামনার সমস্ত কলুষ নিয়ে গড়া এই নীলা—রেবতীকে টেনে আনবার জন্য মেয়ের সম্মোহনী মাদকতাকে ব্যবহার করল সোহিনী। রেবতী এল। তখন নীলা চাইল মোহের জালে রেবতীকে জড়িয়ে তাকে দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে, সোহিনী চাইল তাকে নন্দকিশোরের সাধনার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে। মা আর মেয়ের এই নাটকীয় নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত কারো জিত হল না: হঠাৎ একটা ছায়া পড়ল দেওয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "রেবি, চলে আয়।"

সুড় সুড় করে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।

পিসিমাই ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন রেবতীকে। একটা চরম ট্র্যাজেডির মধ্যে গল্প শেষ হল।

সোহিনীর নভেনশন ভাঙা চরিত্রকল্পনায়, নীলার লালসার নির্লজ্জতায়

কিংবা অতি আধুনিকদের বোহেমিয়ান উদ্দামতায় আপাত দৃষ্টিতে 'ল্যাবরেটরি' চমকপ্রদ। কিন্তু বক্তব্যের প্রয়োজনে চরিত্রগুলি যেখানে প্রতীকের মধ্যে প্রসারিত—সেখানে তাদের বাইরের পরিচয় 'ল্যাবরেটরি'র মূল উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করে না। স্বামীর সাধনাকে সম্পূর্ণ করবার জন্য ব্রতচারিণীর মতো ঋত্বিক সন্ধানের যে দায়িত্ব সোহিনী নিয়েছে, তাতে তার ব্যক্তিজীবনের সতীত্ব অসতীত্বের সমস্ত প্রসঙ্গই অবান্তর হয়ে গেছে। নীলার চরিত্রকে এতটা উদগ্র এবং জান্তব করে তোলা হয়েছে শুধু রেবতীর চরিত্রশক্তিকে যাচাই করে নেওয়ার জন্যেই—পৌরাণিক গল্পের ঋষির তপস্যাকে যেমন অপ্সরীর ছলনা দিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া হত। কিন্তু সমস্ত ঋষিই যেমন জিতেন্দ্রিয়তার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি, তেমনি রেবতীর ক্ষেত্রেও সোহিনীর পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে।

নীলার রূপ বর্ণনা থেকে আরম্ভ করে "জাপানী-ক্লাবের" নারী-হরণের রিহার্সাল পর্যন্ত যে উগ্র আধুনিকতার অঙ্গসজ্জা এই গল্পে আছে, 'ল্যাবরেটরি'র ক্লাসিক নীতিমূলকতার তা প্রেক্ষাপটমাত্র। এর জ্ঞানজিজ্ঞাসার উজ্জ্বল সত্যটিকে ফুটিয়ে তুলতে এরা কনট্রাস্টের ভূমিকা নিয়েছে। আসলে এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি পিউরিটান। পাপের রঙ গভীর কালো হলে পুণ্যের শুভ্রতা যেমন বেশি প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, 'ল্যাবরেটরি'র ধ্রুপদী বক্তব্যটিও তেমনি করে এর আপাত-অসংযমের ওপরে প্রজ্বলিত।

প্রাচীন ভারতীয় সাধনার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই এই গল্পের মর্মবাণী। যেমন অতীতের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়, তেমনি এ যুগের বস্তু-জিজ্ঞাসায়ও সাধকের একই পদ্ধতি—একই পরীক্ষা। সংযতেন্দ্রিয়, অটলচিত্ত, প্রলোভনবিজয়ী। সে প্রয়োজন ভারতীয় শুকদেবের, ইওরোপীয় আইনস্টাইনের। অপ্সরার রূপে ভারতের সাধক আত্মবিস্মৃত হন না—বিদেশী সরকারের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার ঘুষের বিনিময়েও কি তাদের কাছে নিজের নতুন আবিষ্কার বিক্রী করে দিতে পারেন কোনো সুবুদ্ধি, দেশপ্রেমিক বৈজ্ঞানিক ?

তাহলে 'ল্যাবরেটরি' গল্পেও 'স্বদেশ' এবং 'শান্তিনিকেতনের' রবীন্দ্রনাথকেই পাওয়া গেল। এখানে যদি রবীন্দ্রতর কিছু পাওয়া যায়, তাহলে রাবীন্দ্রিকতাই তারও ভিত্তি।

সূচনাতে বলেছিলাম, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটা ভাবগত সামঞ্জস্য রচনা করাই রবীন্দ্রনাথের আমৃত্যু কামনা ছিল। 'তিন সঙ্গী'র তিনটি গল্পেও তার তির্যক রূপায়ণ দেখতে পাচ্ছি। ইওরোপীয় বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রতি পক্ষপাত প্রতিটি গল্পেই পরিস্ফুট, কিন্তু শান্তি আর সংযমের মধ্যে তার চরম পরিণতি—তা-ও এই তিনটি গল্পেরই শেষ কথা। রবীন্দ্রনাথ ইওরোপে দেখেছেন শক্তি, ভারতবর্ষে পেয়েছেন সুষমা। অভীকের শক্তি তাই বিভার সুষমার মধ্যে এসে পূর্ণতা পেয়েছে, বৈজ্ঞানিক নবীনমাধব ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী তপস্বী কচের মতো দেবযানীর প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ করেছে আর সোহিনীর যজ্ঞবেদী এখনো প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে—ইওরোপীয় বিজ্ঞানের শক্তিতে মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে ভারতীয় কঠিন সংযমে তাতে অগ্নিচয়ন করবে—এমন ঋত্বিক আজো পাওয়া যায় নি।

রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

একথা সুবিদিত যে, রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন। প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, উপন্যাসে, নাটকে ও কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রায় সারা জীবন ধরেই স্বাজাত্যবোধ ও জাতিপ্রেমের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে গেছেন। পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের কি রকম সম্পর্ক হওয়া উচিত এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর মতামত তাঁর স্বাজাত্যবোধ-বিরোধী লেখাগুলির ভিতর দিয়ে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি এই শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, জাতীয়তাবাদ পশ্চিমের বণিক সভ্যতার বা পুঁজিবাদী সভ্যতারই অমানবিক, হিংস্র ও সাম্রাজ্যবাদী রূপ; অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই নামান্তর মাত্র। জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের প্রাবল্যের ফলেই পৃথিবীতে এত যুদ্ধ, এত হানাহানি কাটাকাটি, এক জাতিকে নিঃস্ব করে অপর জাতির ধনবৃদ্ধির এত পৈশাচিক প্রচেষ্টা। জাতীয়তাবাদ শুধু যে মানবধর্মবিরোধী, অনৈতিক ও অযৌক্তিক তাই নয়, মানবসমাজবিকাশের ধারাকে বাধা দিয়ে তা ইতিহাসের বিপক্ষাচরণ করছে। তাই রবীন্দ্রনাথ ভারতকে ও এশিয়ার অন্যান্য দেশকে জাতীয়তাবাদের পথ পরিহার করতে বলেছিলেন।

এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে পৃথিবীময় উপনিবেশ নিয়ে হিংস্র কাড়াকাড়ির পর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী যুগ আরম্ভ হল তখন রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় পৃথিবীর একমাত্র কবি যিনি এই যুগের তাৎপর্যকে কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শ অবলম্বন করেই পুঁজিবাদী সভ্যতা যুদ্ধের ও একচ্ছত্র সাম্রাজ্যবিস্তারের পথ অবলম্বন করছে। তাঁর নৈবেদ্যের কবিতা বিশ্ববিখ্যাত। তবু পুনর্বার তার অমর ছত্রগুলিকে স্মরণ করা যেতে পারে:

"শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল ; হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী।…
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত ; লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম ; …
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একথাও বলেছিলেন, এই যে পুঁজিবাদী জাতিগুলি প্রত্যেকেই ভাবছে, সে অন্য সকল জাতিকে পদানত করে একা বিশ্বজয়ী হবে, তাদের এই আশা একটা মিথ্যা মরীচিকা। আত্মহত্যার পথেই চলেছে তারা :

"একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।
… … …
ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।"

আজ আমেরিকার বিশ্বজয়ী হওয়ার উচ্চাশা কি রকম ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে তা দেখে কবিগুরুর ভবিষ্যদ্বাণীকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। এই স্মরণ করছি যে তিনি ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

"উচ্চশির উর্ধ্বে তুলি গাহিয়ো বন্দন,
'এসো শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা,
নিশাচর পিশাচের রক্তদীপশিখা
করিয়া লজ্জিত' "।

অনেক সময়ে বলা হয় যে, পুঁজিবাদী সভ্যতাই তো একথা বলেছে যে চাই গণতন্ত্র এবং চাই প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। জাতীয়তাবাদের মধ্যে এই দুই ভাবধারা মিলে এক হয়ে গেছে। সুতরাং জাতীয়তাবাদ খুব একটা প্রগতিশীল ভাবধারা, এমন কি প্রায় একটা স্বর্গী

ভাবধারা! আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত লোকই রবীন্দ্রনাথের সময়ে এইরকমটা ভাবতেন এবং এখনও হয়ত তাই ভাবেন। সেকালের শিক্ষিত লোকেরা রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদবিরোধী মনোভাবকে ভালোভাবে নেন নি। কিন্তু আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, জাতীয়তাবাদকে রবীন্দ্রনাথই ঠিকমতো বুঝেছিলেন।

পুঁজিবাদী সভ্যতার যুগেই শ্রমবিভাগের প্রসারের ফলে এবং যাতায়াত-ব্যবস্থার ও যোগাযোগব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী ও একভাষাভাষী মানুষদের পরস্পরের সহিত জীবনে জীবন-যোগ নিবিড়তর হতে হতে তাদের মনে এই চৈতন্যের উদয় হল যে তারা একটি বিশিষ্ট জাতি, স্বাধীনভাবে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার তাদের আছে। অন্যদিকে আমরা দেখি যে, অবিকল এই পুঁজিবাদী সভ্যতার আমলেই শ্রমবিভাগের প্রসার, বিজ্ঞানের ও টেকনলজির উন্নতি, যাতায়াত ও যোগাযোগের ক্রমবর্ধমান সুবিধা পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরই জীবনে জীবন যোগ করে তাদেরকে পরস্পরের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও আন্তর্জাতিক ঐক্য উভয়েরই ভিত গেড়েছে পুঁজিবাদী সভ্যতা। এই দুই বিপরীত জিনিস এক হয়ে মিলতে পারে যে নতুন আন্তর্জাতিক সভ্যতার মধ্যে তা সৃষ্টি করা পুঁজিবাদের সাধ্য নয়।

এই দুই বিপরীত জিনিসের বিরোধটা বেড়েই চলেছে পুঁজিবাদের আমলে। তার কারণ এই যে, পুঁজিবাদী শ্রেণীই পুঁজিবাদী সভ্যতার নায়ক। মুনফার প্রেরণায় পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করা, পরস্পরকে গ্রাস করা এবং একচ্ছত্র আধিপত্যের জন্য যুদ্ধ করাই এই শ্রেণীর ধর্ম। জাতির অভ্যন্তরেও যেমন পুঁজিবাদীরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনই তারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং দুর্বল জাতি দেখলেই তাকে গ্রাস করার চেষ্টা করে। আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে তাই পুঁজিবাদী সভ্যতার অহিনকুল সম্পর্ক। জাতীয়তাবাদ পুঁজিবাদী শ্রেণীরই ভাবাদর্শ। যে পুঁজিবাদী সভ্যতার অঙ্কে জাতীয়তাবাদের জন্ম তার সঙ্গে সম্পর্কহীন একটা অবচ্ছিন্ন (abstract) জাতীয়তাবাদ কারো কারো মনে থাকতে পারে কিন্তু এসব হল লেনিন যাকে বলেছেন পেটি-বুর্জোয়া ভাববিলাস। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এত ধার্মিক লোক হওয়া সত্ত্বেও বহু স্বকল্পিত রিয়ালিস্টদের চেয়ে অনেক বেশি

রিয়ালিস্ট ছিলেন। তিনি জাতীয়তাবাদকে সোজাসুজি পুঁজিবাদী ভাবাদর্শ রূপেই দেখেছিলেন।

পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদকে ইংরেজিতে বলা হয় ন্যাশনালিজম। বাংলায় আমরা তাকে বলি জাতীয়তাবাদ বা স্বাজাত্যবোধ। স্বাজাত্যবোধই বোধ হয় ন্যাশনালিজম জিনিসটার উপযুক্ত নাম। স্বাজাত্যবোধ অর্থাৎ নিজের জাতটাই পৃথিবীর অন্য সব জাতের চেয়ে আলাদা, বড় ও ভালো, অন্য জাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, তাদের দাবিয়ে রেখে এবং তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে নিজের জাতকে ধনে মানে ক্ষমতায় শীর্ষস্থানীয় করতে হবে এবং জাতির সঙ্গে জাতির পাশবিক কাড়াকাড়ির লড়াইয়ে নিজের জাতকে জয়ী করার উদ্দেশ্যে স্বজাতির ও অপরজাতির মধ্যে মানসিক বেড়া তুলতে হবে ও দেশের প্রতিটি ব্যক্তির মনকে অপর জাতির প্রতি ঘৃণার দ্বারা ও স্বজাতি সম্বন্ধে মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখতে হবে। এ নিয়েও কবিতা লেখা হয়েছে :

> "কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
> শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি।"

তাই যখন বলা হয় যে, জাতীয়তাবাদ প্রত্যেক জাতির স্বা[illegible] নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে মানে তখন বড়ই বিস্ময় জাগে। কথাটা একেবারে অসত্য। বড় জোর ইওরোপের শ্বেতকায় জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে, এইরকম একটা অনিচ্ছুক ও অনেকখানি ভণ্ড স্বীকারোক্তি পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের কাছ থেকে আদায় করা গেল এবং তাও আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মহাপ্রলয়ের পরে। কিন্তু এশিয়ার ও আফ্রিকার পীতকায় ও কৃষ্ণকায় জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে, এমনতর কথা পশ্চিমী জাতীয়তাবাদ কোনো দিন বলে নি ও আজো বলে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লিবারালিজমের দিকে যতটুকু বা ঝোঁক পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদের [illegible] গোড়ার দিকে দেখা যেত, তাও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে একেবারেই কেটে যেতে থাকে। পুঁজিবাদী মনোপলির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাটসিনির লিবারাল জাতীয়তাবাদের জায়গায় জুড়ে বসতে থাকে মাইকেল সীলি, গামপ্লাউইজ, রাৎসেনহোফার ও ট্রাইটস্কের জাতীয়তাবাদ। [illegible] দিতে থাকে আর্যামি, বংশরক্তামি, চামড়ার রংয়ের বড়াই, বিশেষ বিশেষ ভাষার ও হরফের বড়াই, বিশেষ বিশেষ ঢংয়ের জুতোর ও টুপির বড়াই প্রভৃতি

[illegible]মিতে ভরা, মূঢ়, হিংস্র ও সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদ যার পরিণতি [illegible] শ্রেণীর মিলিটারিজমে, ফাশিজমে ও হিটলারবাদে।[1]

রবীন্দ্রনাথ যদিও কথায় ভুলিয়ে পুঁজিবাদীদের সৎপথে আনার চেষ্টা সারা জীবন ধরেই করেছিলেন বটে, কিন্তু নিজে তিনি পুঁজিবাদীদের ও তাঁদের কবিদলের কথায় ভুলতেন না। তিনি সোজাসুজি পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের অমানবিক, উৎপীড়ক, শোষক, হিংস্র ও সাম্রাজ্যবাদী রূপটিকেই তুলে ধরে জাতীয়তাবাদকে আক্রমণ করেছিলেন। পশ্চিমী জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তাঁর ইংরেজি বক্তৃতা ও বিভিন্ন লেখা পড়তে পড়তে জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যেমন মানবতাবাদী তেমনই স্বচ্ছ ও বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়ে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠতে হয়। ন্যাশনালিজম সম্বন্ধে ইংরেজি বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বললেন, রাজনীতি ও বাণিজ্য, এই দুইয়ের একটা সংঘ, তারই অপর নাম নেশন। ক্ষমতার এমন নিশ্ছিদ্র সংগঠন পৃথিবীতে আর কখনও তৈরি হয় নি এবং সেইজন্য খুব কম অপরাধই আছে যা এ করতে না পারে, এমন কোনো মিথ্যা কথা নেই যা এ বলতে না পারে। যখন কোনো একটা দেশের লোকসমূহ নিজেদেরকে জাতি নামক একটা বিরাট সংঘে পরিণত করে, তখন এই সংঘের মধ্যে ব্যক্তিমানবের আর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না, সে একটা অশরীরী ছায়ামাত্র হয়ে পড়ে। এই যে জাতি নামক একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ, তার শাসনটা কি জিনিস তা ভারতে আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। এটা [illegible] জাতির উপর জাতি নামক একটা কলের বিধিবদ্ধ ও যান্ত্রিক শাসন।[2]

১। পুঁজিবাদী সভ্যতা যে ইম্পিরিয়ালিজমের যুগে পূর্বেকার লিবারালিজমের বুলি সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে, একথা রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বুঝেছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সফলতার সদুপায়' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "অধীন দেশকে দুর্বল করা, তাহাকে অনৈক্যের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, দেশের কোনো স্থানে শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া, সমস্ত শক্তিকে নিজের শাসনাধীনে নির্জীব করিয়া রাখা—এ বিশেষভাবে কোন্ সময়কার রাষ্ট্রনীতি, যে-সময়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি, কীট্‌স, টেনিসন, ব্রাউনিং অন্তর্হিত এবং কিপলিং হইয়াছেন কবি ;... যে সময় পীড়িতের জন্য, দুর্বলের জন্য, দুর্ভাগ্যের জন্য দেশের করুণা উচ্ছ্বসিত হয় না, ক্ষুধিত ইম্পিরিয়ালিজম স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে ; যে-সময়ে বীর্যের স্থান বাণিজ্য অধিকার করিয়াছে এবং ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাদেশিকতা—ইহা সেই সময়কার রাষ্ট্রনীতি।"

২। এই কলটাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "untouched by hand"। অর্থাৎ এই কলটায় [illegible] মানুষকে দেখা যেত না, দেখা যেত ভারতশোষণের দ্বারা পুঁজি সঞ্চয়ের জন্য চালিত [illegible] পুঁজিপতিদের দূর থেকে কলকাঠি-টেপা একটা অমানুষিক সিস্টেম, যার অমোঘ বিধান কোনোরূপ মানবিক আবেদনের দ্বারা নড়চড় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। 'দিল্লীর দরবার',

এর কাছে ভারতবাসীরা মানুষ নয়, তাদের অস্তিত্বের একমাত্র অর্থ এই যে, তাদের উৎপাদনক্ষমতাকে অবনত রেখে এবং তাদের উৎপন্ন সম্পদকে ঘাস কেটে নিয়মিতভাবে ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে ব্রিটিশ জাতির ধনমান বর্ধিত হবে।

পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক নির্গলিতার্থটা যে স্বজাতির দ্বারা অপর জাতির অর্থনৈতিক শোষণ, একথা রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ জাতি কর্তৃক ভারতশোষণ প্রসঙ্গে বহুবার বলেছেন। অপর জাতির সমৃদ্ধি, এমন কি তার অস্তিত্বই যে স্বজাতির পক্ষে একটা ভয়ঙ্কর বিপদের সংবাদ, পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদের এই ষোলআনা মানবতাবিরোধী ও মানবসভ্যতাবিরোধী দিকটার নিন্দা রবীন্দ্রনাথ বারংবার করেছেন। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে ইংরেজি বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"এই যে দেখছি নেশ্যন ও তার ক্ষমতার ও সম্পদের রাজকীয় ঠাট, তার পতাকা ও তার ভণ্ড ধর্মসঙ্গীত, গির্জায় গির্জায় তার ঈশ্বরদ্রোহী ভজনা, তার দেশপ্রেমের বড়াইয়ের শূন্যগর্ভ সাহিত্যিক বজ্রনির্ঘোষ, এসব এই সত্যটিকে গোপন করতে অক্ষম যে, জাতিই হচ্ছে জাতির পক্ষে চরম অশুভ, জাতির বিরুদ্ধে জাতির সর্বদাই দেখি সাজ সাজ রব এবং পৃথিবীতে নতুন এক সহযাত্রী যাত্রীর আবির্ভাব হলেই দেখি জাতির মনে একটা নতুন সর্বনাশের আশঙ্কা ও আতঙ্ক। জাতির একমাত্র ইচ্ছা হল বাকী জগতের দুর্বলতাকে আহার্য হিসাবে ভোগ করা, ঠিক যেমন এক ধরনের কীট অন্য প্রাণীর পঙ্গু দেহের মধ্যে জন্মলাভ করে এবং হতভাগ্য প্রাণীগুলিকে ঠিক ততটাই বাঁচিয়ে রাখে, কীটটির চর্বণসুখের ও পুষ্টির জন্য যতটা প্রয়োজন হয়।" (লেখকের অনুবাদ)

রবীন্দ্রনাথ বললেন, জাতীয়তাবাদ অশুভের একটা নিষ্ঠুর মহামারী। জাতির অস্তিত্ব শুরু হওয়া অবধি এই ভূতের ভয়েই সমস্ত পৃথিবী থরোথরো করে কাঁপছে। যেখানেই পৃথিবীর কোনো অন্ধকার কোণ দেখা যাচ্ছে, সেখানেই সন্দেহ করার কারণ আছে যে, জাতির গোপন হিংসাতন্ত্র তলে তলে কাজ করছে এবং মানুষ এর সেই পিঠের দিকটা সম্বন্ধে সর্বদা

'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা' প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন যে, মুঘল শাসন ভারতবাসীদের মানুষ হিসাবে দেখত, মুঘল আমলে ভারতের কোনো জাতীয় শোষণ ছিল না, বরং মুঘল বাদশাহেরা ভারতের উৎপাদনক্ষমতাকে তখনকার কালের সর্ববিধ উপায়ে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টাই করতেন।

আতঙ্কে বাস করছে, যে দিকটায় এর কোনো চোখ নেই। সামান্য একটু পায়ের আওয়াজ বা কাছেপিঠে সামান্য একটু নড়াচড়ার আওয়াজ পাওয়া গেলেই সেখানে আতঙ্কের শিহরণ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই আতঙ্ক থেকেই জন্মায় মানুষের স্বভাবে যা কিছু নীচ ও ক্ষুদ্র।

পশ্চিমকে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ বললেন, আপনারা কি ভেবেছেন, এই যে দেশের পর দেশে সমস্ত মানুষকে পরজাতিপীড়ন ও পরজাতিশোষণের দ্বারা আত্মস্বার্থসাধনের জন্য আপনারা পুরোপুরি সংঘবদ্ধ করে তুলেছেন এবং বলছেন যে এতেই মানুষের মঙ্গল, তার জন্য আপনাদের কোনোদিন জবাবদিহি করতে হবে না? আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, এই যে জাতি নামক একটা মহা সর্বনাশ পৃথিবীর নগ্ন দেহের গভীরতম প্রদেশে বিষদাঁত ঢুকিয়ে দিয়ে তার থেকে পৃথিবীর মুক্তি পাওয়ার সব পথ বন্ধ করে রাখতে চাইছে, এর চেয়ে বড় সর্বনাশ পৃথিবীর ইতিহাসের সব চেয়ে অন্ধকার যুগেও আর কখনও ঘটেছিল কি?

পরন্তু, পরজাতিশোষক ও পরজাতিপীড়ক পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদ যে মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ, একথার বারংবার পুনরুক্তিতে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ ছিল অক্লান্ত। জীবনের ষাট বৎসরেরও অধিক কাল রবীন্দ্রনাথ চীনের লোকেদের কামান দেগে আফিম গেলানো, কঙ্গোতে বেলজিয়ানদের অকথ্য অত্যাচার, ইংরেজের দ্বারা ভারতের দরিদ্রীকরণ, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি কর্তৃক পারস্যের শ্বাসরোধকরণ, "নরবলির কাপালিক" মুসোলিনি ও হিটলারের ফাশিস্ত নৃশংসতা, সভ্য য়ুরোপের সর্দার-পড়ো জাপান কর্তৃক চীনকে খুবলে খুবলে খাওয়া, স্প্যানিশ সাধারণতন্ত্রের উপরে ফাশিস্ত আক্রমণ প্রভৃতি যাবতীয় সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটানা অভিযান চালিয়েছিলেন।

পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদ মানবসভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে পৃথিবীকে কি রকম যুদ্ধের ও আত্মধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

"The Nation has thriven long upon mutilated humanity. Men, the fairest creations of God, came out of the National manufactory in huge numbers as war-making and money-

making puppets, ludicrously vain of their pitiful perfection of mechanism. Human society grew more and more into a marionette show of politicians, soldiers, manufacturers and bureaucrats, pulled by wire arrangements of wonderful efficiency." (ন্যাশনালিজম, পৃঃ ৪৪)

এই যে Reason-এর সঙ্গে মানবসভ্যতার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে জাতীয়তাবাদ যুদ্ধের উন্মাদালয়ে মানবজাতিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তার কারণ যে পুঁজিবাদের প্রকৃতির মধ্যেই আছে, তা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। নিজের দেশের শ্রমিকদের ও অপর দেশের মানুষদের অদৃশ্য ও অপরিমিত শোষণের দ্বারা অবিরাম গতিতে পুঁজিসঞ্চয়ই যে পুঁজিবাদের একমাত্র লক্ষ্য তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় ভাষায় বহু উপলক্ষ্যে বলেছিলেন। পুঁজিবাদী সভ্যতাকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন "পেটুক" সভ্যতা, "মানুষখাদক" সভ্যতা। তার ক্ষুধার অন্ত নেই। শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "…একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষের যে-সভ্যতার রূপ আমাদের সামনে বর্তমান সে-সভ্যতা মানুষখাদক। তার একদল victim চাইই যারা তার খাদ্য, যারা তার বাহন। তার ঐশ্বর্য, তার আরাম, এমন কি তার কালচার উপরে মাথা তোলে নিম্নতলস্থ মানুষের পিঠের ওপরে চড়ে।"

পুঁজিবাদী সভ্যতা আজো সদম্ভে এই গর্ব করে বেড়াচ্ছে যে, সে পৃথিবীতে এক "স্বাধীন মানবসমাজ" গড়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই দম্ভোক্তির দ্বারা একটুও ভোলেননি। বরং তিনি মার্কসীয় আচার্যেরা যে কথা বলেছিলেন, অর্থাৎ পুঁজিবাদ এক প্রকার অদৃশ্য দাসত্বপ্রথা, অবিকল সেই কথাই বলেছিলেন। ন্যাশনালিজম নামক ইংরেজি গ্রন্থে তিনি পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী সভ্যতা সম্বন্ধে বলেছিলেন:

"We have seen that with all its vaunted love of humanity it has proved itself the greatest menace to Man, far worse than the sudden outbursts of nomadic barbarism from which men suffered in the early ages of history. We have seen that, in spite of its boasted love of freedom, it has produced worse forms of slavery than were current in earlier societies—

slavery whose chains are unbreakable, either because they are unseen, or because they assume the names and appearances of freedom." (পৃঃ ৫৬)

এই দাসত্ব প্রথারই অভিব্যক্তি জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিখ্যাত আক্রমণটা তাই উপনিবেশবাদের ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ, তা পুঁজিবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে আক্রমণ অর্থাৎ তা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই আক্রমণ। এই কথাটাই আজ আমাদের বোঝা দরকার। ভারতকে ও এশিয়াকে যখন তিনি জাতীয়তাবাদের পথ পরিহার করতে বলতেন তখন তাঁর মনের ভিতর এই জলন্ত বিশ্বাসই দেখি যে, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি সকল দিক থেকে একটা বিরাট বিশ্বজীবনের মধ্যে ও একটা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সভ্যতার মধ্যে প্রতিটি জাতির মানুষের জীবনকে মানবধর্মের ভিত্তিতে অপর সকল জাতির মানুষের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার ডাক আজ পৃথিবীতে এসেছে। তাই পুঁজিবাদী সভ্যতার ও পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদের পথ মাড়িয়ে এশিয়ার দেশ স্বাধীন হয় রবীন্দ্রনাথ তা মনেপ্রাণে চান নি। তাতে তিনি পৃথিবীর কোনো মঙ্গল দেখতে পান নি। এশিয়ার স্বাধীনতার অন্য পথ আছে, সে পথ হল আন্তর্জাতিকতা, শান্তি ও প্রগতির প্রলেটারীয় পথ, প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিকতার ও প্রলেটারীয় সভ্যতার পথ।[৩] রবীন্দ্রনাথ প্রলেটারীয় পথের নাম অবশ্যই করেন নি এবং তিনি এশিয়াকে ও পৃথিবীকে প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিকতার ও প্রলেটারীয় সভ্যতার পথ অবলম্বন করতে উপদেশ দিচ্ছেন একথা তাঁর জীবিতকালে কেউ তাঁকে বললে তিনি নিজে হয়ত তা মানতেন না তা স্বীকার করি।[৪] কিন্তু মানবধর্মের ভিত্তিতে সভ্যতা গড়ার যে পথ তিনি পৃথিবীকে অবলম্বন করতে বলেছিলেন, সেই পথই পৃথিবীর

৩। যে পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদ ইওরোপের মাটিতে জন্মে পৃথিবীকে মহাশ্মশানে পরিণত করতে চেয়েছিল, সেই জাতীয়তাবাদই এশিয়ার মাটিতে শিকড় গাড়লে মানবতাবাদী হয়ে উঠবে, সর্দার পানিক্কর প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ যখন এই কথা বলেন, তখন খুব বিস্মিত হই। জাপানে অন্তত তা হয়নি। আমাদের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী যে পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিকতার আদর্শের কাছে নতিস্বীকার করবেন, সেই পরিমাণেই তাঁরা নতুন সভ্যতাসৃষ্টিতে সাহায্য করতে ও দেশের আভ্যন্তরীণ ঐক্য সাধিত করতে পারবেন।

৪। কিন্তু তাই বা কেন মানি! আমাদের জাতীয়তাবাদী মহল এই গল্প চালু করেছে যে, রবীন্দ্রনাথ শুধু রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার সুখ্যাতি করেছিলেন এবং তাও আবার কাটাকাটি হয়ে

প্রলেটারিয়াট শ্রেণী অবলম্বন করেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিকতার একটা নিগূঢ় আত্মীয়তা ও সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই।

ওই যে 'মুক্তধারা'র অভিজিৎ নিজের জাতির লুব্ধ ও সংকীর্ণ অর্থ নৈতিক স্বার্থকে উপেক্ষা করে যন্ত্ররাজ বিভূতির তৈরি বাঁধ ভেঙে দিয়ে শিবতরাইয়ের লোকেদের বাঁচার জন্য জীবন বলি দিলে, ওটা কি পুঁজিবাদের ও পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী? পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদের সমস্ত ব্যাধি ও ক্ষতকেই রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা' নাটকে নির্মম ভাবে ফুটিয়ে তুলিয়েছিলেন। হোক না অভিজিৎ রাজপুত্র, উপর-থেকে-বিপ্লব-ওয়ালা, অহিংসাবাদী, আরো কত কী! তাতে কি আসে যায়। বড় কথাটা এই যে, রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা' নাটকে বিশ্বমানবের বিচারালয়ে পুঁজিবাদী সভ্যতার ও উপনিবেশবাদী স্বাজাত্যবোধের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিলেন। পৃথিবীর প্রলেটারিয়াট শ্রেণীই আজ একথা বলছে যে, এক জাতির অবনতি কখনই অন্য জাতির উন্নতির শর্ত নয়, বরং এক জাতির উন্নতিই অন্য জাতির উন্নতির শর্ত, তাই যত তাড়াতাড়ি অবনত জাতিগুলি উন্নত জাতিগুলির সমকক্ষ হবে ততই সকল জাতিরই উন্নতি ও মঙ্গল। রবীন্দ্রনাথও এই শিক্ষা দিয়েছিলেন।

পৃথিবীর প্রলেটারিয়াট শ্রেণীই আজ এই কথা বলছে যে, অপর দেশকে ও অপর দেশের মানুষকে ভাল না বাসলে নিজের দেশকে ও নিজের দেশের মানুষকেও ভালবাসা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহাগ্রন্থ 'গোরা' উপন্যাসে সেই

গেল রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রাশিয়ার নায়কত্বের নিন্দার দ্বারা। কিন্তু শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"সভ্যতার এই ভিত্তিবদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ার গিয়ে।...নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানুষের নবযুগের রূপ ওই তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি।...সর্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন এ মনে আপনি আসে যে, নব্য রাশিয়া মানব সভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তুলবার সাধনা করছে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক। দুর্ধর্ষপ্রতাপ জরাসন্ধের কারাগার থেকে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বহুকালের বহু বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন তেমনি ধনমদমত্ত সভ্যতার বিরাট কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ অসংখ্য বন্দী যেন একদা মুক্তি পায়।"

দেখা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ এই সুস্পষ্ট প্রার্থনা করছেন, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ মুনাফাখোরী ও লুব্ধ পুঁজিবাদী সভ্যতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হোক। এশিয়ার দেশগুলি স্বাধীন হয়ে ও অ-পুঁজিবাদী সমাজবিকাশের পথ ধরে শান্তি, আন্তর্জাতিকতা ও মানবধর্মের আদর্শকে সফল করুক, এটাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন।

শিক্ষাই দিয়েছিলেন। গোরা যেই জানতে পারল যে ভারত তার দেশ নয়, তখনই গোরা ভারতকে ভালবাসতে পারল এবং শুধু ভারত নামক একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থকে নয়, ভারতের মানুষকে। যতদিন গোরা বলছিল, আমার দেশ ভারত, অতএব তার সমস্ত মন্দও ভাল, তার সমস্ত মিথ্যা কুসংস্কার, আচার-বিচার ও ভেদবুদ্ধিকে আঁকড়ে থেকেই নিজের মুক্তি ঘটবে, ততদিন গোরা দেশকে, দেশের মানুষকে, সুচরিতাকে ও নিজেকেও ভালবাসতে পারছিল না। সুচরিতার প্রেমের কাছ থেকে ও নিজের মানবতার কাছ থেকেও গোরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু যেই তার জাতীয় অহংজ্ঞান দূর হল তখনই গোরা জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসার কাছে ও সুচরিতার প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রকৃত মুক্তিলাভ করল। 'গোরা'য় রবীন্দ্রনাথ যে মানবধর্মের শিক্ষা দিয়েছেন তার মধ্যে পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদের ছিটেফোঁটাও নেই।

সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদ যে ইতিহাসে বাতিল হয়ে গেছে, তা যে আজকের দিনে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষের সহিত মানুষের নৈকট্যের ও অর্থ নৈতিক জীবনৈক্যের ফলে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সেগুলির সমাধান করতে অক্ষম, সেকথা রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলে গেছেন। তিনি বলতেন, ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে, ছোট ছোট জাতির মধ্যে মানুষ সহযোগিতার দ্বারা মানবসমাজ গড়বে, তার সঙ্গে একাত্ম হবে এবং এই সকল খণ্ড খণ্ড মানবসমাজ পরস্পরের সহিত নিরন্তর প্রতিযোগিতায় ও যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, এই পুরাতন ব্যবস্থা পৃথিবীতে আর চলতে পারে না। মানবধর্মের দুর্বার আহ্বান মানুষকে কেবলই নিয়ে চলেছে ক্ষুদ্রতর গণ্ডীর মধ্যে মানুষের সহিত মানুষের মিলন থেকে বৃহত্তর আয়তনে মানুষের সহিত মানুষের মিলনের দিকে। অবশেষে বিশ্বব্যাপী মানবসমাজের সত্তার সঙ্গে ব্যক্তিমানবের সত্তার সাযুজ্যের ভিতর দিয়েই মানবধর্মের শেষ জয় এবং মানবের চরম মুক্তি। সেই যুগের আগমনী রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই শুনতে পেয়েছিলেন। ব্যক্তিমানুষের ও ক্ষুদ্রমানুষের বৃহৎ মানুষ হওয়ার যে স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, তাই সার্থক হতে চলেছে সমাজতন্ত্রের মধ্যে।

'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"এই যুগে বিশ্ব-ইতিহাসের রঙ্গভূমির পর্দা উঠে গেছে। এতকাল যেন আড়ালে আড়ালে রিহার্স্যাল চলছিল, টুকরো টুকরো ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন

কামরায়। প্রত্যেক দেশের চারিদিকে বেড়া ছিল। বাহির থেকে আনাগোনা করবার পথ একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু বিভাগের মধ্যে মানবসংসারের যে চেহারা দেখেছি আজ তা দেখি নে। সেদিন দেখা যাচ্ছিল এক একটি গাছ, আজ দেখছি অরণ্য।”

আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের প্রসারের ফলে এবং বিজ্ঞানের ও টেকনলজির উন্নতির ফলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ঘরকন্না যে এক হয়ে গেছে, তার কি সুন্দর ছবিই উপরের ছত্রগুলিতে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন।[৫] এই ধরণের কথা কখনও বিজ্ঞানের গদ্যে এবং কখনও বা কাব্যের ও নাটকের চিত্রময় ও প্রতীকময় ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরেই বলেছিলেন। তাই এযুগে জাতির প্রতি জাতির ও মানুষের প্রতি মানুষের শোষণের ও ঘৃণার ভিত্তিতে যে জাতীয়তাবাদী সভ্যতা পুঁজিবাদ গড়েছে, তা শুধু নীতিগত মানবধর্মের দিক থেকেই নয়, ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানগত মানবধর্মের দিক থেকেও তা অচল। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের বাণী। এ যুগে মানবধর্ম যে নতুন সভ্যতার আহ্বান জানিয়েছে, তার ছবিই রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি বললেন, “রাশিয়ায় না এলে এজন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।” লিখলেন, “আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটি দেশের মানুষ স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত

৫। পুঁজিবাদী সভ্যতা বিভিন্ন জাতির যুগপৎ মিলনের ও বিরোধের যে বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করেছে, রবীন্দ্রনাথ সেই অবস্থাটির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন: “বিভিন্ন জাতি একত্র হয়েছে, কিন্তু এক হতে পারছে না।... বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে, ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ, কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল; অমনি মানুষের সত্যের সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক শক্তি যাদের একত্র করেছে তাদের এক করবে কে?” (শিক্ষার মিলন)।

পুঁজিবাদ তার অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করতে চায় ইম্পিরিয়ালিজমের দ্বারা কিন্তু তার ফলে বিভিন্ন জাতির দ্বন্দ্ব ও অনৈক্য এবং মানবজাতির আন্তর্জাতিক জীবনের অরাজকতা বেড়ে চলে। প্রলেটারিয়াট শ্রেণী বলে যে, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ইম্পিরিয়ালিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিলবার জন্যই জাতিস্বাতন্ত্র্যের সাধনা, আলাদা হয়ে থাকবার জন্য নয়। পরাধীন জাতিগুলির এই দ্বৈত সাধনার প্রলেটারীয় নীতিটাকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে ব্যক্ত করেছেন: “একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পিরিয়ালিজম হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি, গিলে খাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে।...যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে। আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতিবিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।” (শিক্ষার মিলন)।

মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে।” সোভিয়েত ইউনিয়নে পিছিয়ে-পড়া জাতিগুলির শিক্ষার ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অল্প কয়েক বৎসরে যে বিপুল চেষ্টা ও বিপুল সাফল্য রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, তা-ই তাঁকে বিশেষ করে মুগ্ধ করেছিল। নিজের জীবনে রবীন্দ্রনাথ দুই ছবি দেখেছিলেন; এক হল ভারতে ও অন্যান্য উপনিবেশে পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদ যে মরুভূমি সৃষ্টি করেছিল তার ছবি; এবং দ্বিতীয়টি হল সোভিয়েত দেশে প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিকতা যে মানবিক গৃহস্থালী সৃষ্টি করেছিল তার ছবি। ধার্মিক রবীন্দ্রনাথ ও মানব-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় ছবিটিকেই তাঁর মহৎ ও মুক্ত চিত্তের সমস্ত মহিমা দিয়ে আশীর্বাদ করে গেছেন।

এই যে পুরাতন সভ্যতার ক্রোড়ে লালিত হয়ে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথের অন্তরের সম্মতি ও চিত্তদাক্ষিণ্য নতুন প্রলেটারীয় সভ্যতার দিকে চলে গেল, এটা এযুগের একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই ধরণের ঘটনা এই নতুন সভ্যতার জয়েরই মহৎ সাক্ষ্য। এইজন্যই আজ পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের পবিত্র নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছে। মনে পড়ছে লক্ষ্মীর লঙ্কাপুরী ছেড়ে যাওয়ার কথা। বাস্তবিকই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অসাধারণ পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে ও লালিত হয়ে ওই যে বালক রবীন্দ্রনাথ একদিন শুভ প্রভাতে এযুগের মানবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, যিনি পরে বলেছেন যে, তিনি একঘরে মানুষের স্বাধীনতার সৌভাগ্যটিকে পেয়েছিলেন, তিনি সত্যই ছিলেন একজন হেরেটিক।[৬] তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, “সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া, দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।” এ তো সেই বিশ্ব-প্রলেটারিয়াটেরই বাণী যে ঘোষণা করেছিল, শ্রমিকদের কোনো দেশ নেই কেননা পৃথিবীর সকল দেশই শ্রমিকদের দেশ। এই বাণী ঘোষণা করেই পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণী দেশপ্রেমকে মানবপ্রেমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে প্রকৃত

৬। The Religion of an Artist নামক ইংরাজি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজের বাল্যজীবন প্রসঙ্গে বলেছেন: “We had the freedom of the outcast”। এই একঘরে লোকের মুক্ত-চিন্তার ফলেই রবীন্দ্রনাথ আবাল্য মৃত্যু পর্যন্ত নিজের পরিবেশ, শ্রেণী ও জাতীয় বন্ধনীকে অতিক্রম করে ও নিজের বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে গিয়েও অসীম সাহসের সহিত সত্যকে সন্ধান ও স্বীকার করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবন একটা নিরবিচ্ছিন্ন আত্মজিজ্ঞাসা। কত পুরাতন মত যে তিনি বদলেছিলেন তার সংখ্যা নেই।

দেশপ্রেমের সৌধ রচনা করে দিল। প্রলেটারিয়াটের সেই বাণীই হেরেটিক রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। অত্যন্ত বালক বয়সেই রবীন্দ্রনাথ কবি কাহিনীতে সেই নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে "নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা, নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার-ব্যাভার!"

আজ রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর পুণ্য উপলক্ষে সত্যের ও মানবধর্মের উপাসক সেই একঘরে হেরেটিক রবীন্দ্রনাথকেই স্মরণ করি। তাঁর এক দেবতা ছিল, সে হল মানবব্রহ্ম, নরদেবতা। চতুর মুসোলিনি [৭] রাজসম্মান দেখিয়ে তাঁকে ভোলাতে পারে নি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দেওয়া নাইট উপাধি তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, স্বদেশের জাতীয়তাবাদীদের ভ্রূকুটি ও নিন্দা তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি ও সত্যের পথ থেকে টলাতে পারে নি। তাঁর সেই অমর উক্তি আজ মনে পড়ছে :

"কেউ বা আমাকে উপহাস করে, কেউ বা আমার উপর রাগ করে, তাদের নিজের পথেই আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কোথা থেকে জানি নে আমি এসেছি এই পৃথিবীর তীর্থে, আমার পথ আমার তীর্থদেবতার বেদীর কাছে। মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব, আমার জীবনদেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েছেন। যখন আমি সেই দেবতার নির্মাল্য ললাটে পরে যাই তখন সব জাতের লোকই আমাকে ডেকে আসন দেয়, আমার কথা মন দিয়ে শোনে। যখন ভারতবর্ষীয়ের মুখোষ পরে দাঁড়াই তখন বাধা বিস্তর। যখন আমাকে এরা মানুষরূপে দেখে তখনই এরা আমাকে ভারতবর্ষীয় রূপেই শ্রদ্ধা করে ; ··· আমার স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে আমার চলবার পথ ভুল বোঝার দ্বারা বন্ধুর হয়ে ওঠে। আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে ; অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।" (রাশিয়ার চিঠি, পৃঃ ৬২-৬৩)

এই সত্যের সাধনায় দৃঢ় ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদকে বর্জন করে তাঁর নিজের মতো ভাষায় প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিকার

৭। মুসোলিনির ব্যক্তিত্ব ও ইতালীয় ফাশিজম সম্বন্ধে সাময়িক ভাবে রবীন্দ্রনাথের মোহ জন্মেছিল কিন্তু রোমাঁ রোলাঁর সহিত কথাবার্তার পর অতি শীঘ্রই সেই মোহ কেটে যায় এবং রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে তীব্রভাবে মুসোলিনির নিন্দা করেন। যতদূর জানি, ভারতে এক 'হিন্দু' সংবাদপত্র ছাড়া অন্য কোনো সংবাদপত্রই রবীন্দ্রনাথের মুসোলিনিবিরোধী বিবৃতি প্রকাশ করে নি।

বাণীই প্রচার করে গিয়েছিলেন। তাঁর জন্য দেশের ও বিদেশের জাতীয়তাবাদীদের কাছে তাঁকে অনেক মানসিক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। আজ সমগ্র জাতিব্যাপী রবীন্দ্রপূজায় ফুল দিতে চলেছি, এ এক মহা আনন্দের ও মহা সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু সকলেই যে একই রবীন্দ্রনাথের পূজা করছেন তা নয়। আজ বিশেষ করে সেই রবীন্দ্রনাথের পূজা করি যিনি শোষিত ও নিপীড়িত মানব-মানবীর মধ্যে তাঁর দেবতাকে দেখতে পেয়েছিলেন, সাধারণ মানুষের আনন্দময়, শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যে যিনি মানব জীবনের শেষ ও শ্রেষ্ঠ অর্থের সন্ধান পেয়েছিলেন, যিনি এক পৃথিবী, এক মানুষ ও এক মানব-ধর্মের সাধনায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন, শ্বাপদধর্মী সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতাকে যিনি কোনোদিন ক্ষমা করেন নি, যিনি এই তথাকথিত সভ্যতার বিরুদ্ধে পৃথিবীর যে সকল বৈপ্লবিক শক্তি সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের অবশ্যম্ভাবী জয়ের উপর সহজ ও অচঞ্চল বিশ্বাস জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রেখেছিলেন, মানবজাতির ইতিহাসে অতি-বড় দুর্যোগের রাত্রিতে যাঁর কণ্ঠে আমরা এই অভয়বাণীই শুনতে পেয়েছিলাম :

"নরলোকে বাজে জয় ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।"

বিশ্ববিপ্লবের চারণ কবি সেই রবীন্দ্রনাথকেই আজ বিশেষভাবে স্মরণ করি।



"দেখেছি সকলের চেয়ে গুরুতর অভাব আরোগ্যের,
আধমরা মানুষই নিয়ে দেশে কোনো বড় কাজের পত্তন
সম্ভব নয়, তারা কাজে ফাঁকি দেয় প্রাণের দায়ে, আর সেই
কারণেই প্রাণের দায় দুরূহ হ'য়ে ওঠে।
আমরা অনেক সময় দোষ দেই বাহ্য কারণকে — কিন্তু
রোগজীর্ণতা পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জার মধ্যে বাস
ক'রে গুরুতর কর্তব্যের ভারকে ভগ্ন উদ্যমের ফাটল দিয়ে
পথে পথে সে ছড়িয়ে দিতে থাকে, লক্ষ্যস্থানে অল্পই পৌঁছায়—"

—রবীন্দ্রনাথ

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

পরিচয়

জ্যৈষ্ঠ । ১৩৬৮

সম্পাদক
গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়